মুফতি উবাইদুর রহমান

মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ক

সীমারেখা ও বিধিবিধান

অনুবাদ ও সংযোজন
আব্দুল্লাহ বিন বশির

লেখক পরিচিতি

মুফতি উবাইদুর রহমান হাফিজাহুল্লাহ পাকিস্তানের বরেণ্য ও যুগসচেতন আলেমদের একজন। পাকিস্তানের অন্যতম নির্ভরযোগ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান জামিয়া হক্কানিয়াতে মেশকাত জামাত পর্যন্ত অধ্যায়ণ করে বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব মুফতি তাকী উসমানী দা.বা.-এর সোহবতের উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে দারুল উলুম করাচিতে আগমণ করেন। এবং সেখানে দাওরা পড়েন। অতপর ২০১৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বছর দারুল উলুম করাচিতেই আত-তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা বিভাগে অধ্যয়ন করেন। পূর্বে জামিয়া হক্কানিয়া থেকে পাঠ গ্রহণের সুবাদে সেখানকার ওস্তাদবৃন্দের সাথেও তাঁর রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। বিশেষ করে মাওলানা সামিউল হক রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে খুব পছন্দ করতেন এবং অনেক মুহাব্বত করতেন।

শিক্ষাজীবন শেষ করার পর তিনি পাঠদানের পাশাপাশি লেখালেখি ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যান নিরলসভাবে। তার রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা বেশ দীর্ঘ। 'উসুলুত তাকফির', 'উসুলুত তাদলিল', 'আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার', 'দ্বীন ওয়া মাজহাব', 'তাসাওউফ ওয়া সুলুক' তাঁর অনন্য কিছু গ্রন্থ। এ ছাড়াও সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তার রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাকিস্তানের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ইসলামি পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রতিনিয়তই প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রতিথযশা এই আলেমে দীন কেবল ইলম ও গবেষণার মাঝেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। আধ্যাত্মিক অঙ্গনেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উম্মাহর রাহবার হিসেবে। মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবি রাহিমাহুল্লাহর খলিফায়ে মুজায মুফতি মুখতার উদ্দিন শাহ সাহেবের কাছে তিনি বাইয়াতের অনুমতি লাভ করেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর তাঁর ছায়াকে দীর্ঘায়িত করুন। আমিন।

মুফতি উবাইদুর রহমান

মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক

সীমারেখা ও বিধিবিধান

অনুবাদ ও সংযোজন

আবদুল্লাহ বিন বশির

শিক্ষক, মাদরাসাতু আলী রা.

পাঠানটুলি, নারায়ণগঞ্জ

সম্পাদনা

আবু উসামা জাফর

শিক্ষক, মদীনাতুল উলুম মাদরাসা

জিগাতলা, সাহাপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা

বই : মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক
লেখক : মুফতি উবাইদুর রহমান
অনুবাদ ও
সংযোজন : আবদুল্লাহ্ বিন বশির
বানান ও সজ্জা : সাহিত্যসারথি
প্রচ্ছদ : আহমাদ বোরহান
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৪
প্রকাশনা : ৫৪
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
যোগাযোগ : দোকান ন. ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ
০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার

মূল্য : ২২৭৳

Muslim-Omuslim Somporko
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657, 01303-855 225

উৎসর্গ

হজরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব

আল্লাহর কাছে হাজারো শুকরিয়া, তিনি আমাকে আপনার যুগে এই মুসলিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করার তাওফিক দিয়েছেন।

আল্লাহ্ আপনাকে সকল অকল্যাণ থেকে হেফাজত করুন এবং আপনার ছায়াকে পুরো মুসলিমবঙ্গের ওপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়ত করুন। আমিন।

সূচি

লেখকের কথা

বর্তমান যুগে মুসলমান-অমুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্কের পার্থক্যরেখা মুছে যাচ্ছে। একই দেশ ও সমাজে একসাথে বসবাসের সুবাদে অতীতের তুলনায় বর্তমানে পারস্পরিক যোগাযোগ ও লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা বেশি দেখা দিচ্ছে। তাই এই বিষয়টি বর্তমান জামানার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তি থেকে সামাজিক জীবনের প্রতিটি কদমে এর প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হচ্ছি। এসব কারণে জরুরি হয়ে পড়েছে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন দিক এবং তার শরয়ি বিধিবিধান ও মাসআলাগুলোকে ইলমি-আমলি দিক থেকে স্পষ্ট করা।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান মনোভাব খুবই দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক। উম্মাহর অধিকাংশ মানুষ ইলমি দিক থেকে এ মাসআলাকে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেনি, তেমনই প্রায়োগিক জীবনেও তার কোনো স্থান দেয়নি। কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বর্ণনার বিপরীতে বহু মানুষ হীনম্মন্যতার জলাবদ্ধতায় আটকা পড়েছে যে, তাদের নিকট 'মুসলিম-কাফের পারস্পরিক সম্পর্ক'-সংক্রান্ত বিধিবিধান আলোচনা-পর্যালোচনা করা, তা নিয়ে গবেষণা করা ও মুসলিমদের সামনে এই সংক্রান্ত ইসলামের বিধান স্পষ্ট করা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে উম্মাহর একটি ক্ষুদ্র অংশের নিকট যদিও ইসলামি ফিকহের এই অধ্যায়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কিন্তু কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণে এ ক্ষেত্রে বহু লোকের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির ঘটনা সামনে এসেছে। তাই এই বিষয়টির আসল গুরুত্ব এবং এর শরয়ি সীমা ও বিধিনিষেধগুলো স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছিল, সে লক্ষ্যেই কয়েক পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি লেখা।

এই বিষয়ে কাজ করার সময় এক দুঃখজনক বাস্তবতা বারবার সামনে উঠে এসেছে, এই বিষয়ের কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে বহু লেখকের পদস্খলন ঘটেছে। তার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, চিন্তার দীনতা, আশপাশের সমাজ ও পরিবেশের অন্ধ অনুসরণ। এটি এমন এক বিষয় যা নেক নিয়ত ও পূর্ণ ইখলাস থাকা সত্ত্বেও যেকোনো ব্যক্তিকে মূল বাস্তবতা ও হাকিকত থেকে ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। যে জাতি যুদ্ধের মধ্যে ভঙ্গুর ও পরাজিত হয়, তার যে শুধু শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিপর্যস্ত ও ভঙ্গুর হয় তা নয়। বরং তাদের দিল-দেমাগ, চিন্তাফিকির, তাহজিব-তামাদ্দুন ও রীতিনীতি, সংস্কৃতি এবং চরিত্রেরও জলাঞ্জলি দিতে হয়। তখন হীনম্মন্যতা ও পরাজিত মানসিকতা তাদের জাপটে ধরে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোলামির জিঞ্জির গলাবদ্ধ করে তারা জীবনযাপন করে। যা পদে পদে তাদেরকে মাথা নত করার এবং নত করে রাখার জন্য বাধ্য করে। তারপর তারা বিজয়ী দলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও সাহসী পদক্ষেপ নিতে অক্ষম হয়ে যায়। এমন জাতি যদি কখনো গোপনে কিছু শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয় করতেও পারে

তাহলেও এর পুরোটাই নিজেদের প্রতিরোধ করতেই ব্যয় হয়ে যায়। তাদের সকল যোগ্যতা নিমেষেই এতে খরচ হয়ে যায়। পরে তাদের কাছে এতটুকু পাথেয় ও সঞ্চয় থাকে না যাকে পুঁজি করে তারা পরবর্তী পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে। মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে ইতিহাসের এমনই ক্রান্তিলগ্ন পার করছে।

গ্রন্থটি লেখার প্রাক্কালে ইচ্ছে ছিল, কাফেরদের হুকুকও (অধিকার) এখানে বিস্তারিত ও স্বতন্ত্রভাবে অন্তর্ভুক্ত করব। কিন্তু পরে ভাবলাম, স্বতন্ত্রভাবে লিখতে গেলে আলোচনা বেশি দীর্ঘ হয়ে যাবে, তাই আপাতত এই উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করলাম। কারণ লেখার বর্তমান বিন্যাস থেকেই তাদের হুকুকের দিকটিও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটি মূলত একটি ভূমিকা ও চারটি অধ্যায়ে গঠিত। লেখার সময় যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে যেন শরিয়তের মূল বিধানটি সাবলীলভাবে উল্লেখ করা হয় এবং কোনো মাসআলা অস্পষ্টভাবে বা জজবার সাথে লেখা না হয়। কিছু বন্ধুর কাছে গ্রন্থটি পাঠিয়ে এই নিবেদন করা হয়েছে, তারা যেন সমালোচনার দৃষ্টিতে গ্রন্থটি পড়ে এবং কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে সেগুলো চিহ্নিত করে দেয়। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুক। তারা গভীরভাবে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে বিভিন্ন স্থানে নোট দিয়েছেন। তারপরও পাঠকের নিকট আবদার রইল, গ্রন্থটি যেন গভীর ও বিচক্ষণতার সাথে অধ্যয়ন করেন এবং কোনোপ্রকার ভুল থাকলে সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবেন। এর ফলে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করবেন। এ ছাড়া লেখায় কোনো ভুল থাকলে বা আরও সংশোধন এবং সংযোজনের প্রয়োজন অনুভব করলে অবশ্যই জানাবেন, পরবর্তী সংস্করণে সেটি বিবেচনা করা হবে।

বান্দা উবায়দুর রহমান

দারুল ইফতা, দারুল উলূম রহমানিয়া, মারদান

৮ শাওয়াল ১৪৪০ হি.[১]

---

১. মূল বইটির দুটি মুদ্রণ বের হয়েছে। দুটিতে লেখক গুরুত্বপূর্ণ দুটি ভূমিকা লেখেন। আমরা এখানে মূল বইয়ের দুই ভূমিকাকে একসাথে করে দিয়েছি। কারণ উভয়ের মধ্যে কিছু কথার পুনরুক্তি ছিল, আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথাও ছিল। তাই এটাই মুনাসিব মনে হয়েছে যে, উভয় ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো একসাথে করে দিই।—আব্দুল্লাহ

ভূমিকা

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মুসলিম কাফেরের সম্পর্কের গুরুত্ব বিশ্লেষণ

কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য বর্ণনায় ইহুদি-খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সকল কাফেরের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো,

এক.

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

মুমিনরা যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধু না বানায়। যে-কেউ এ কাজ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই; তবে তোমরা যখন ওদের থেকে কিছুটা আত্মরক্ষা করতে চাও (তখনকার কথা ভিন্ন)। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করছেন এবং আল্লাহ্‌রই কাছে (তোমাদের) ফিরে যেতে হবে।[২]

মুসলমানদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করার একটি সুরত হলো, মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করে কাফেরদেরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করা। দ্বিতীয় সুরত হলো, মুসলমানের সাথে সাথে কাফেরকেও বন্ধু বানানো। উভয় ধরনের বন্ধুত্বই শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।[৩]

---

২. সুরা আলে ইমরান : ২৮

৩. লেখক এখানে যতগুলো আয়াত পেশ করবেন, তাতে লেখকের মূল উদ্দেশ্য হলো 'কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব'-এর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি তুলে ধরা। ولاية বা تولي-এর অন্য যে অর্থগুলো আছে তা ইনকার করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। এই সংক্রান্ত আয়াতগুলো অধ্যয়নকালে ইমাম মাতুরিদি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩৩৩ হি.)-এর মূলনীতিটি মনে রাখলে আয়াতের মর্ম বোঝা সহজ হবে। তিনি লেখেন,

ثم الولاية التي نهانا عنها تخرج على وجوه أحدها : المودة والمحبة، أي : لا تودوهم ولا تحبوهم. والثاني : ألا نتخذهم موضع سرنا وبطانتنا؛ كقوله : (لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً. . .) الآية. والثالث : ولاية الطاعة لهم، أي : لا تطيعوهم؛ كقوله : (إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ) الآية، وقوله : (إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ)، نهانا أن نحبهم ونودهم، ونهانا -أيضًا- أن نتخذهم موضع سرنا، ونفشي إليهم سرائرنا، ونهانا أن نطيعهم فيما يدعوننا إليه ويسرون - والله أعلم - للخلاف الذي بيننا وبينهم في الدِّين.

আল্লাহ তাআলা আয়াতে কাফেরদের ওলি বানাতে যে নিষেধ করেছেন তার কয়েকটি দিক হতে পারে। ১. ভালোবাসা ও হৃদ্যতা রাখা। ২. অন্তরঙ্গ ও ও গনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা। ৩. তাদের আনুগত্য

আয়াতের মধ্যে পাশাপাশি মুমিন ও কাফের শব্দ উল্লেখ করার দ্বারা এটিও স্পষ্ট যে, আয়াতে উল্লেখিত হুকুমের মূল ভিত্তি হলো ঈমান ও কুফরের মাঝে বিদ্যমান সংঘাত ও পরস্পরের বিপরীত অবস্থান। কারণ ঈমান-কুফর কখনো এক সাথে হতে পারে না। সুতরাং মুসলিম-কাফেরের মাঝে কীভাবে বন্ধুত্ব হতে পারে?

দুই.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ۝٥١

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু বানিয়ো না। ওরা পরস্পর একে অন্যের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে-কেউ ওদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে ওদেরই মধ্যে (গণ্য) হবে। নিশ্চয় আল্লাহ জালেমদের হেদায়েত দান করেন না।[৪]

এ জাতীয় যেসব আয়াতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি কেবল এই দুই শ্রেণির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যেহেতু নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ কুফর, তাই সর্বপ্রকার কাফেরের সাথে মিত্রতা ও বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রেও সমান নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। তা ছাড়া অন্যান্য আয়াতে ব্যাপকভাবে সকল কাফেরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন.

تَرَىٰ كَثِيرٗا مِّنۡهُمۡ يَتَوَلَّوۡنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ لَبِئۡسَ مَا قَدَّمَتۡ لَهُمۡ أَنفُسُهُمۡ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَفِي ٱلۡعَذَابِ هُمۡ خَـٰلِدُونَ ۝٨٠ وَلَوۡ كَانُواْ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمۡ أَوۡلِيَآءَ وَلَـٰكِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُمۡ فَـٰسِقُونَ ۝٨١

তাদের অনেককে তুমি কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। নিঃসন্দেহে তারা নিজেদের জন্য যা অগ্রে পাঠিয়েছে তা নিকৃষ্ট। (আর তা হলো,) আল্লাহ তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তারা চিরকাল শাস্তির মাঝে অবস্থান করবে। তারা যদি আল্লাহ, নবী এবং তার ওপর নাজিলকৃত কিতাবের ওপর ঈমান আনত, তাহলে তাদেরকে (কাফেরদেরকে) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করত না। কিন্তু, (বাস্তবতা হলো) তাদের অনেকেই অবাধ্য।[৫]

প্রথম আয়াত দ্বারা এটি স্পষ্ট যে, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি

করার মাধ্যমে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা বা তাদেরকে অভিভাবক বানানো। আল্লাহ তাআলা এই তিনটি বিষয় থেকেই আমাদের নিষেধ করেছেন। কেননা তাদের ও আমাদের মাঝে ধর্মীয় যে পার্থক্য রয়েছে তার কারণে। তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ : ৫/৩২২ (আব্দুল্লাহ)

৪. সুরা মায়িদা : ৫১

৫. সুরা মায়িদা : ৮১

ও জাহান্নামের আজাবের কারণ। এবং এও জানা গেল যে, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি কেবলই শেষ নবী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের জন্যই নয়, বরং পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যও ছিল। যেমন বনি ইসরাইল। আর অন্যান্য আসমানি বিধানের মতো আল্লাহর এই বিধানটিও তারা অমান্য করেছে। যার কারণে তারা আল্লাহর আজাবের পাত্র হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে 'শর্ত' ও 'জাযা'[৬]-এর ব্যবহার থেকে স্পষ্ট যে, ঈমান ও কুফরের মাঝে বন্ধুত্ব সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি বিষয়। যা কখনোই একত্র হতে পারে না। সুতরাং, কোনো পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতে পারে না। কারও ক্ষেত্রে এমনটি দেখা গেলে বুঝে নিতে হবে যে, এটি তার ঈমানের দুর্বলতার নিদর্শন।

চার.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদের বন্ধু বানিয়ো না যদি তারা ঈমানের মোকাবেলায় কুফরকে পছন্দ করে। আর তোমাদের মধ্যে যারা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাই অপরাধী।[৭]

ভাই এবং বাবা অত্যন্ত নিকটাত্মীয়। যদি এমন নিকটাত্মীয়ও কুফরে লিপ্ত থাকে, তাহলে উক্ত আয়াতে তাদের সাথে মিত্রতা ও বন্ধুত্ব করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের সাথে বন্ধুত্বকারীদেরকে জালেম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে কাফের আত্মীয়ের সাথে বন্ধুত্ব থেকে বেঁচে থাকতে নিছক পরামর্শ দেওয়া হয়নি বা তাকে শুধুই অনুত্তম আখ্যা দেওয়া হয়নি, বরং এমন কাজকে রীতিমতো নাজায়েয ও জুলুম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

পাঁচ.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَـٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ

৬. শর্ত ও জাযা হলো আরবি ব্যাকরণের দুটি বিশেষ পরিভাষা। এ জাতীয় বাক্যে প্রথমে শর্ত আসে এবং এরপরে জাযা আসে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, প্রথমটি হলে পরেরটি হবে, আর প্রথমটি না হলে পরেরটি হবে না। অর্থাৎ প্রথম কাজটি পরের কাজের জন্য শর্ত। এখানেও ঠিক এই বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে। তারা যদি ঈমান আনত, তাহলে কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাত না। সুতরাং, ঈমান থাকলে কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো সম্ভব নয়। তবে বন্ধু বানানোর কোন স্তর কুফর এবং কোন স্তর হারাম সেটা ভিন্ন ব্যাপার। তবে এটা সর্বাবস্থাতেই ঈমানের তাকাজার বিপরীত। (সম্পাদক)

৭. সুরা তাওবা : ২৩

وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু বানিয়ো না যে, ওদের নিকট বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাবে, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে ওরা তা অস্বীকার করেছে। ওরা রাসুলকে ও তোমাদের শুধু এ কারণে বহিষ্কার করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই বের হয়ে থাকো, (তবে ওদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ কীভাবে?) তোমরা গোপনে ওদের নিকট বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ আমি বেশ জানি—তোমরা যা গোপন করো ও যা প্রকাশ করো। আর তোমাদের মধ্যে যে এ কাজ করে, সে সরল পথ হারিয়ে ফেলেছে।[৮]

বোঝা গেল কাফের ও মুসলমানের মাঝে ঈমান-কুফরের মতো সংঘর্ষ থাকার পর তাদের মাঝে বাস্তবিক বন্ধুত্ব থাকা সম্ভব নয়। এও বোঝা গেল যে, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাদেরকে ভালোবাসা ও মিত্রতার সম্পর্ক রাখা অথবা মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় তাদের কাছে ফাঁস করে দেওয়া সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণ।

ছয়.

قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ.

নিশ্চয় তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যখন তারা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য প্রকাশ্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।[৯]

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে ঈমান-কুফর ও মুমিন-কাফেরের মাঝে দ্বন্দ্ব একটি সুস্পষ্ট বিষয়। আর এর নেপথ্যে ভৌগোলিক বা দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ নয়, বরং ঈমান-কুফরের মর্মই স্বয়ং এমন যে, এ দুটির মাঝে কোনো ধরনের সামঞ্জস্য সম্ভব নয়। এটিও প্রতীয়মান হলো, এই উত্তপ্ত সংঘাত ও বিদ্বেষ বন্ধ হওয়ার একমাত্র পথ কুফর ছেড়ে ঈমানের পথে ফিরে আসা। এবং তাদের সাথে এই শত্রুতা আর বিদ্বেষ

---

৮. সুরা মুমতাহিনা : ১

৯. সুরা মুমতাহিনা : ৪

ব্যক্তির কারণে নয়, বরং তার মাঝে নিহিত 'কুফর'-এর খারাপ বৈশিষ্ট্যের কারণে। তাই যখনই ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্য তার থেকে শেষ হয়ে যাবে, বিদ্বেষ আর শত্রুতার হুকুম বাকি থাকবে না।

সাত.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُواْ مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

হে ঈমানদারগণ! এমন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত। ওরা আখেরাত থেকে তেমনটাই নিরাশ হয়ে গেছে যেমনটা কবরবাসী কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।[১০]

আয়াতের মূল মর্ম হলো কাফেরের সাথে মিত্রতা করা নিষিদ্ধ। তবে আল্লাহ তাআলার ক্রোধের উল্লেখ থাকার কারণে যে বিষয়টি অতিরিক্ত বুঝে আসে, তা হলো, কাফেরদের সাথে মিত্রতা করা আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁর ক্রোধে পর্যবসিত হওয়ার কারণ। আর বন্ধুত্বের বাস্তবিক দাবি হলো, বন্ধুর শত্রুর সাথে শত্রুতা রাখা। কাফেররা যেহেতু কুফরের কারণে আল্লাহর ক্রোধের অধিকারী হয়ে গেছে, এখন তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা রাখা বড় বিপজ্জনক এবং আল্লাহর মুহাব্বত থেকে বের হয়ে নিজের ওপরে তাঁর ক্রোধকে ডেকে আনার নামান্তর।

আট.

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

আপনি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে এমন পাবেন না যে, তারা ওইসব লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত, হোক না ওরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী। ওই সকল লোকের অন্তরেই আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং নিজের রুহ (তথা অদৃশ্য ফয়েজ) দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। ওরাই আল্লাহর দল। শুনে রাখো! আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।[১১]

---

১০. সুরা মুমতাহিনা : ১৩

১১. সুরা মুজাদালা : ২২

এই আয়াতে আরও ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসীরা কিছুতেই কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না। কারণ এ দুটির মাঝে দূরত্ব এত বেশি যে, কিছুতেই এ দুটি এক হতে পারে না। সুতরাং ঈমানের দাবি হলো, কাফেররা যেহেতু নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর দুশমন, তাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখা। চাই কাফের তার যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুফাসসির আল্লামা বাগাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৫১০ হি.) বলেন,

> أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكافرين وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفر، وإن كان من عشيرته.
>
> আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে সংবাদ দিচ্ছেন যে, মুমিনদের ঈমান কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়। আর যে মুমিন হবে সে কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পারে না, তার নিকটাত্মীয় হলেও।[১২]

এই সংক্রান্ত কিছু হাদিস

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা ও কাজে উক্ত বিষয়ে পরিষ্কার বিবরণ দিয়ে গেছেন। এমনকি একাধিক বর্ণনায় মুসলমানদেরকে আগে বেড়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানকে সালাম দিতে বারণ করেছেন। আর যদি কখনো চলার সময় রাস্তায় কোনো মুসলমান কাফেরের মুখোমুখি হয়, তখন যেন সে রাস্তার প্রশস্ত দিকে চলাচল করে, যাতে স্বাভাবিকভাবেই কাফের সংকীর্ণতায় ভোগে। সহিহ মুসলিমে এসেছে,

> عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. (صحيح مسلم برقم :٧٦١٢، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام)
>
> হজরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আগে বেড়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানকে সালাম দেবে না। যখন রাস্তায় তাদের কারও সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন তাকে রাস্তার সংকীর্ণ দিকে দিয়ে চলতে বাধ্য করো।[১৩]

সালাম মূলত শ্রদ্ধা-ভক্তি ও কল্যাণ কামনা জ্ঞাপক বক্তব্য। যার কারণে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এমনইভাবে রাস্তায় জায়গা দেওয়া সম্মানের বিষয় যা করতে বারণ করা হয়েছে।

কাফের-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করার ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। আর সতর্ক করেছেন, এত নিকটে যেন বাস না করে, যাতে পরস্পরের বাড়ির আলো অন্যের দৃষ্টিতে পড়ে। এভাবে বলার কারণ হলো, আরবরা

---

১২. তাফসিরে বাগাবি : ৫/৫০

১৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস ২১৬৭

রাতে বাড়ির আঙিনায় আগুন প্রজ্বলিত করে রাখত। যেন রাতে কোনো মেহমান বা মুসাফিরের প্রয়োজন হলে কাজে লাগাতে পারে। সুনানে তিরমিজিতে রয়েছে,

> عن جرير بن عبد الله «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم» فاعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا : يا رسول الله، ولم؟ قال : لا تراءى ناراهما. (جامع الترمذي برقم : ٤٠٦١، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، ت بشار)

> হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাসআম গোত্রের নিকট একটি যুদ্ধের জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন।... এবং বলেন, আমি ওই সকল মুসলিমের থেকে দায় মুক্ত যারা মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেন? উত্তরে বললেন, যাতে একে অপরের আগুন দেখতে না পারে।[১৪]

আরবদের সেই রীতি অনুসারে এই হাদিসের মর্ম হলো, মুসলমানরা যেন কাফেরদের আবাস থেকে এই পরিমাণ দূরে থাকে যেন উভয় আবাসের মাঝে কোনো বিশেষ সম্পর্ক না থাকে। কাফেরদের সাথে বসবাসের নিন্দায় এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন, তাদের সাথে যে বসবাস করবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে। সামুরা ইবনে জুনদুব রা.

---

১৪. জামে তিরমিজি, হাদিস ১৬০৫, ১৬০৪; সুনানে আবি দাউদ, হাদিস ২৬৪৫

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩২১ হি.) বলেন,

> أنه لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين فيكون معهم بقدر ما يرى كل واحد منهم نار صاحبه، وكان الكسائي يقول: العرب تقول : داري تنظر إلى دار فلان، ودورنا تناظر.
>
> কোনো মুসলমানের জন্য কাফেরদের ভূখণ্ডের এত নিকটে বসবাস করা জায়েয নেই, যাতে একজনের বাড়ির আগুন অপরজন দেখতে পারে। শরহু মুশকিলিল আসার, ৮/২৭৬

ইমাম খাত্তাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩৮৮ হি.) 'মায়ালিমুস সুনান' (২/২৭২) গ্রন্থে বলেন,

> في معناه ثلاثة وجوه، قيل : معناه لا يستوي حكمهما، وقيل : معناه أن الله فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم، حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يرى نارهم، ويرون ناره إذا أوقدت، وقيل : معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله.
>
> হাদিসের তিনটি অর্থ হতে পারে। ১. হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলিম আর মুশরিক সমকক্ষ হতে পারে না। ২. আল্লাহ তাআলা দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরকে পৃথক করে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো মুসলমানের জন্য কাফেরদের সাথে একত্রে এমনভাবে বসবাস করা জায়েজ নেই যে, তারা যখন চুলায় আগুন জ্বালাবে তখন মুসলিম তা দেখতে পাবে, আবার মুসলিম আগুন জ্বালালে তারা তা দেখতে পাবে। ৩. মুসলমানরা যেন কাফেরের বেশভূষা ও জীবনপদ্ধতির সাদৃশ্য অবলম্বন না করে। দেখুন, বাজলুল মাজহুদ, খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রহ., ৯/২৪০ (অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসের বিধান সামনে বিস্তারিত আসছে, পৃ. ১০২) (আব্দুল্লাহ)

বর্ণনা করেন,

وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. (جامع الترمذي برقم : ٥٠٦١، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، ت بشار)

মুশরিকদের সাথে বসবাস করো না। এবং তাদের সাথে ওঠাবসা করো না। যে তাদের সাথে বসবাস করে এবং তাদের সাথে ওঠাবসা করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।[১৫]

এ সকল হাদিস দ্বারা স্পষ্ট যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব, ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বর্ণনা ও ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত

বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট যে ঈমানের দৃঢ় শিকল হলো আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহ তাআলার জন্য বিদ্বেষ পোষণ করা। এটি এমন এক কাজ যা না হলে আমল ও ইবাদতের পূর্ণ স্বাদ অনুভব হবে না। কোনো মুসলমানের ঈমান কেবল তখনই পূর্ণতা পায় যখন তার শত্রুতা-মিত্রতা কেবল আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধের অনুগামী হয়। আল্লাহর জন্যই কারও সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা আবার আল্লাহর জন্যই কারও থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা হবে।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে,

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أحب لله و أبغض لله و أعطى لله و منع لله فقد استكمل الإيمان. سنن أبي داوٗد برقم : ٩٧٦٤، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ রাখে, আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্যই তা থেকে বিরত থাকে, তার ঈমানের পূর্ণতা লাভ হয়েছে।[১৬]

মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবাতে আছে,

عن مجاهد قال : أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه.

মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঈমানের মজবুত হাতল হলো

১৫. জামে তিরমিজি, হাদিস ১৬০৫

১৬. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৪৬৮১

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ রাখা।[১৭]

কাফেরদের সাথে মিত্রতায় বড় ধরনের ফিতনার আশঙ্কা

ইমাম ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ সুরা আনফালের এক আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মুসলমানরা পরস্পর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে যেন সীমা রক্ষা করে চলে। কোনো মুসলমান অপর মুসলমান ভাই ব্যতীত কোনো কাফেরকে যেন বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। কারণ এটি বড় ঝুঁকিপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ إِلَّا تَفۡعَلُوهُ تَكُن فِتۡنَةٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَفَسَادٞ كَبِيرٞ ٧٣
>
> আর যারা কাফের তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না করো, তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় ঘটবে।[১৮]

আল্লামা ইবনে কাসির এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

> ومعنى قوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل.
>
> যদি তোমরা মুশরিকদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন না করো এবং মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করো, তাহলে মানুষের মাঝে ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। আর তা হলো, পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যাওয়া এবং মুমিন-কাফের একীভূত হয়ে যাওয়া। যার কারণে মানুষের মাঝে সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।[১৯]

---

১৭. মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা, ৬/১৭০

এই বক্তব্যটি সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবু শাইবা ও ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ তাদের সনদে বারা ইবনে আজেব থেকে রেওয়ায়েত করেন,

أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله (المصنف برقم: ٩٥٠١٣، مسند أحمد برقم: ٤٢٥٨١)

ঈমানের মজবুত হাতল হলো আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা।

শায়েখ আওয়ামা দা. বা. এই হাদিসের ব্যাপারে লেখেন,

فالحديث صحيح بهذه الشواهد.

হাদিসটি সহিহ।

মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা, ১৫/৬২০ (আব্দুল্লাহ)

১৮. সুরা আনফাল : ৭৩

১৯. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আনফাল : ৪/৯৮

জালেম ও কাফেরকে ঘৃণা করা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদার অংশ

ইমাম তাহাবি রহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আহলুস সুন্নাহর আকিদাসমূহ একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় একত্র করেছেন। সেখানে মুমিনের প্রতি বন্ধুত্ব আর কাফেরের সাথে শত্রুতার আকিদাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইমাম তাহাবি বলেন,

ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.

> আমরা ন্যায়নিষ্ঠ ও ইনসাফকারীদের ভালোবাসি আর অপরাধী ও খেয়ানতকারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি।[২০]

বলাবাহুল্য, অপরাধ, জুলুম ও খেয়ানতের বড় একটি বহিঃপ্রকাশই হলো কুফরি গ্রহণ করা। আমাদের সালাফদের আকিদার কিতাবসমূহে এই মাসআলাটির অন্তর্ভুক্তি দ্বারা বিষয়টি তাদের নিকটও কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার কিছুটা আঁচ করা যায়।

অত্যাচারী ও পাপিষ্ঠকে ভালোবাসা কবিরা গোনাহ

অত্যাচারী ও ফাসেক ব্যক্তির সাথে ভালোবাসা ও মুহাব্বত রাখাকে উলামায়ে কেরাম কবিরা গোনাহের তালিকাভুক্ত করেছেন। কবিরা গোনাহসংক্রান্ত গ্রন্থাদির মধ্যে বিস্তর ও বিশদ আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থ হলো আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি (মৃত্যু : ৯৭৪ হি.) রচিত 'আয-যাওয়াজের আন-ইকতিরাফিল কবায়ের' নামক গ্রন্থটি। লেখক উক্ত গ্রন্থে মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় ৪৬৭টি কবিরা গোনাহের উল্লেখ করেছেন। সে তালিকার ৫৪ ও ৫৫ নম্বরে জালেম ও ফাসেকের (প্রকাশ্যে গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির) সাথে বন্ধুত্ব রাখা ও সৎ লোকদের সাথে বিদ্বেষ রাখার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

الكبيرة الرابعة والخامسة والخمسون : محبة الظلمة أو الفسقة بأي نوع كان فسقهم، وبغض الصالحين.

> একটি কবিরা হলো, অত্যাচারী ও যেকোনো ধরনের পাপিষ্ঠের প্রতি ভালোবাসা রাখা আর নেককার ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা।[২১]

বিস্তারিত জানতে বইটি অবশ্যপাঠ্য। ইবনে হাজার হাইতামির পর আল্লামা বিরকিবি আল-হানাফি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৯৮১ হি.) এ বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণসহ 'আত-তারিকাতুল মুহাম্মাদিয়া' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেখেনে 'অন্তর'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট গোনাহের আলোচনায় ৪১ নম্বরে তিনি উল্লেখ করেন,

---

২০. আকিদাতুত তাহাবি, পৃ. ৮০

২১. আয-যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, ১/১৮৩

(حب الفسقة والركون إلى الظلمة) (قال الله تعالى {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} [هود : ۳۱۱] أخرج الإمام أبو داود عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقولوا للمنافق : سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، وضده البغض في الله تعالى لكل عاص لعصيانه، لا سيما المبتدعين و الظلمة لكون معصيتهم متعدية، فلا بد من إظهار البغض لهم، إن لم يخف بخلاف غيرهما من العصاة.

'ফাসেকদের ভালোবাসা ও জালেমদের পক্ষ নেওয়া'। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা জালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না'। ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন, তোমরা মুনাফিককে নেতা বলো না। কেননা সে যদি নেতা হয়, তাহলে তো তোমরা তোমাদের রবকে ক্রোধান্বিত করলে। এর বিপরীত হলো আল্লাহর জন্য কোনো গোনাহগারকে তার গোনাহের কারণে ঘৃণা করা। বিশেষত বিদআতি ও জালেম লোকদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। কেননা তাদের গোনাহ অন্যকে আক্রান্ত করে। তাই আবশ্যক হলো তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, যদি কোনো ভয়ের আশঙ্কা না থাকে।[২২]

পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট যে, যে-সকল পাপিষ্ঠের পাপকর্ম সংক্রামক, তাদের প্রতি কেবল আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করাই যথেষ্ট নয়। বরং প্রয়োজনের সময় (হেকমত ও মাসলাহাত বিবেচনায় রেখে) সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করাও জরুরি। তবে কখনো ধর্মীয় কোনো স্বার্থে তা প্রকাশ না করারও অনুমতি রয়েছে। 'মুদারাত'-সংক্রান্ত আলোচনায় আরও বিস্তারিত আসবে ইনশাআল্লাহ।

কাফেরের সাথে সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তার শরয়ি বিধান

কাফেরদের সাথে ভালোবাসা ও মুহাব্বতের সম্পর্ক রাখার বিধিবিধানসংক্রান্ত আলোচনার বিভিন্ন শৈলী রয়েছে। কোনো বক্তব্যে সরাসরি নিষেধাজ্ঞাসূচক শব্দ রয়েছে। কোথাও নিন্দা করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে যারা কাফেরদেরকে ভালোবাসে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। উসুলে ফিকহের দৃষ্টিতে সবগুলোই নিষেধাজ্ঞাসূচক শৈলী। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো কাজ থেকে বারণ করা। এ জাতীয় সব বক্তব্যকে সামনে রেখে উলামায়ে কেরাম কাফেরের সাথে ভালোবাসা ও মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপনকে নাজায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। আর নিজেরাও এর ওপর পূর্ণ আমল করেছেন। সাথে, কারও থেকে এই বিষয়ে ত্রুটি হলে তাদেরকে সতর্ক ও সংশোধন করেছেন। তারা তাদের রচনায় এই সংক্রান্ত বিধিবিধানকে ইলমি ও ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। যার কারণে সামগ্রিকভাবে এই মাসআলায় উলামায়ে কেরাম সকলেই একমত।

---

২২. আত-তারিকাতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ, পৃ. ৩১৮, আল-মাকতাবাতুল হাক্কানিয়্যাহ, পেশাওয়ার

তবে কাফেরের সাথে সবধরনের লেনদেন ও সম্পর্ক নিষিদ্ধ নয়। এমনইভাবে সবধরনের সম্পর্ক বৈধও নয়। বরং সম্পর্কের বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতি রয়েছে। কিছু আছে বৈধ সম্পর্ক আর কিছু আছে অবৈধ। আবার অবৈধ সম্পর্কেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কিছু কিছু স্পষ্ট কুফরের কারণ আর কিছু তো অবৈধ বটে, কিন্তু তার ভিত্তিতে কাউকে কাফের আখ্যা দেওয়া যায় না। এমনইভাবে বৈধ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শর্ত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে।

এখন কোন ধরনের সম্পর্কের কী হুকুম? আলোচনার সহজবোধ্যতা ও সরল উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে কাফেরদের সাথে সম্পর্ককে নিম্নোক্ত তিন ভাগে বিভক্ত করছি,

১. ধর্মীয় সম্পর্ক।

২. সামজিক সম্পর্ক।

২. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

প্রথম অধ্যায়

ধর্মীয় সম্পর্কের সীমারেখা

- ধর্মীয় ও আন্তরিক সম্পর্ক
- ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্ম মতবাত
- কাফেরদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
- অমুসলিমদের 'ভাই' বলে সম্বোধন করা
- কাফেরদের প্রতি মুহাব্বত রাখা
- ঘৃণা কাফেরের প্রতি না কুফরের প্রতি
- অমুসলিমদের জবাইকৃত পশু খাওয়ার বিধান
- আহলে কিতাব দ্বারা কারা উদ্দেশ্য
- মুসলিম ভূখণ্ডে অমুসলিমদের নিজ ধর্মের প্রচার-প্রসার
- মুসলিম ভূখণ্ডে অমুসলিমদের ধর্মীয় প্রার্থনালয় তৈরি করা
- কাফেরদের মসজিদে প্রবেশের বিধান

কাফের সম্পর্কে ধারণা বিশ্বাস কেমন হবে

ইসলামের সূর্য উদিত হয়ে আলো ছড়ানোর সাথে সাথে পূর্বাপর সকল ধর্মমত নিষ্প্রভ, অকার্যকর ও রহিত হয়ে গেছে। সেগুলো অনুসরণের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্বের সকল আসমানি ধর্ম নির্দিষ্ট সময় ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তি কেবল ইসলামের মাঝেই নিহিত। মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণকারীরাই কেবল সফলতার চূড়ায় পৌঁছবে। এর থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা হবে চরম ব্যর্থ। জাহান্নামের অতল গহ্বরই হবে তাদের শেষ ঠিকানা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ.

আর যে-কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ থেকে তা মোটেই গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা বাগাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৫১০ হি.) হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেছেন,

لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي.(شرح السنة كتاب العلم، باب حديث أهل العلم.)

আমি তো তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ শুভ্রতা (শরিয়ত) নিয়ে এসেছি। যদি মুসা আ. জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার আনুগত্য ছাড়া তার আর কিছুই করার সুযোগ ছিল না।[২৪]

কাফেররা সত্য দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত—এই বিশ্বাস লালন করা প্রতিটি মুমিনের জন্য আবশ্যক। কাফের অবস্থায় মৃত্যু হলে জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা। তারা পূর্বের রহিত কোনো ধর্ম বা মতবাদ পালনে যতই নিষ্ঠাবান হোক, পরস্পরে যতই মার্জিত আচরণের অধিকারী হোক না কেন, ঈমানের নুর ও ইসলামের দীপ্তি ব্যতীত বাহ্যিক সব ভালো গুণ পরকালে তাদের কোনো কাজে আসবে না। জাহান্নামের লাঞ্ছনাদায়ক আজাব থেকে তারা বিন্দু পরিমাণও রেহাই পাবে না। ইমাম আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৫০ হি.) কাফেরদের ব্যাপারে একজন মুসলিমের আকিদা-বিশ্বাস কী হবে সে ব্যাপারে স্বীয় শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন,

قلت : إن قال قائل لا أعرف الكافر كافرا، قال : هو مثله، قلت : فإن قال لا أدري أين مصير الكافر، قال : هو جاحد لكتاب الله تعالى وهو كافر. (الفقه

২৩. সুরা আলে ইমরান : ৮৫

২৪. শারহুস সুন্নাহ, বাগাবি, ১/২৭০। আরও দেখুন, মুসনাদে আহমাদ, ১৫১৫৬; শুআবুল ঈমান, ১৭৪

الأبسط ص ٣١١، بَاب فِي الْبَغْي وَالْخُرُوج على الإِمَام)

ছাত্র : যদি কেউ বলে, আমি কাফেরকে কাফের মনে করি না।

ইমাম : তাহলে সে লোকও কাফেরদের হুকুমেই হবে।

ছাত্র : যদি সে বলে, কাফেরের শেষ ঠিকানা—জান্নাত না জাহান্নাম—কোথায় হবে আমি জানি না।

ইমাম : তাহলে সে আল্লাহর কিতাব প্রত্যাখ্যানকারী, তাই সে কাফের।[২৫]

আল্লামা কাজি বায়াদিয়্যি আল-হানাফি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১০৯৮ হি.)[২৬] উপরিউক্ত বক্তব্যের সাথে নিম্নোক্ত বক্তব্যটিও যুক্ত করেছেন,

من لم ينزل الكفار منزلهم من النار فهو مثلهم.

যে মুসলমান 'কাফেরদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম' এই আকিদা পোষণ করে না, সেও কাফের বলে বিবেচিত হবে।[২৭]

ইন্টারফেইথ ধর্মীয় ঐক্যের দর্শন

কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত যে, ইসলামের সূর্য উদিত হওয়ার পর ইসলাম ভিন্ন কোনো ধর্ম ও মতাদর্শকে সত্য মনে করা এবং তার অনুসরণ করা সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা ও হারাম। তাছাড়া পরকালে মুক্তির জন্য নিছক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যথেষ্ট নয়, বরং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর সর্বশেষ নবীরূপে বিশ্বাস করা এবং তাঁর আনীত ধর্মকে সত্যায়ন করা আবশ্যক। আর ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার পর ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তা গ্রহণ না করলে তারা কাফের, তাদের শেষ পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। পূর্বের ধর্মমত যত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করুক না কেন, তার কোনো মূল্য নেই।

প্রথম ১৮ শতকে ইহুদি ষড়যন্ত্রে 'ধর্মীয় ঐক্যের' দর্শন সৃষ্টি হয়। যার মূল ইশতেহার ছিল, ইসলাম-ইহুদি-খ্রিষ্ট ইত্যাদি সকল ধর্মই সত্য ও অনুসরণযোগ্য। অতএব, নির্দিষ্ট কোনো ধর্মে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। সমগ্র মানবতার অধিকার আছে, তারা যে ধর্ম খুশি তা গ্রহণ করতে পারবে। কেউ যদি নিজের ধর্মকেই পরম সত্য ভাবে, তাহলে সে সাম্প্রদায়িক, সেকেলে, নির্দিষ্ট গণ্ডিবদ্ধ, সংকীর্ণমনা ইত্যাদি। মুসলিম সমাজে জামালুদ্দিন আফগানি (ও তার ছাত্র মুহাম্মাদ আবদুহু—অনুবাদক)-

২৫. আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ১১৩

২৬. কাজি বায়াযিয়্যি রহিমাহুল্লাহ উসমানি খেলাফতের একজন বিচারপতি ছিলেন। ১০৭৭ হিজরিতে প্রথম তিনি হালবের বিচারপতি নিযুক্ত হন। জীবদ্দশায় উসমানি বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারপতির কাজ করেছেন। তবে সামরিক বিচারপতি হিসাবেই বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। দেখুন, খুলাসাতুল আসার ফি আইয়ানিল করনিল হাদি আশার, ১/১৮১ (আব্দুল্লাহ)

২৭. আল-উসুলুল মুনিফা, পৃ. ১০৯, দারুস সালেহ, প্রকাশকাল : ১৪৪১ হি.

সহ কিছু ব্যক্তি প্রথম থেকেই এই দর্শন প্রচার-প্রসারে এবং বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার কাজে নিয়োজিত ছিল।

বাস্তব কথা হলো, সকল ধর্মের প্রতি ন্যায্যতা ও সমতার খোলসে ধর্মীয় ঐক্যের নামে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ও চরম অজ্ঞতাপূর্ণ একটি দর্শন আবিষ্কৃত হয় তখন। আর ইহুদি জাতি, যারা এই দর্শনের জন্মদাতা এবং বিশ্ববাসীকে তা গিলানোর কাজে নিয়োজিত, কিছুতেই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ন্যায় ও ইনসাফের জন্য তা তৈরি করেনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘৃণা, হিংসা, মন্দ চরিত্র চর্চায় মজে থাকা এই অভিশপ্ত জাতির কাছে এমন ভালো কিছু কীভাবে আশা করা যায়?! বরং এটা ছিল ইতিহাসের খাতায় লিপিবদ্ধ বেদনাবিধূর ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার জন্য নিকৃষ্ট ইহুদি জাতির আরেকটি নতুন কূটকৌশলমাত্র। এরাই হজরত ঈসা আ.কে আরশে উত্তোলনের পর তার আসমানি ধর্ম ও শিক্ষাদীক্ষাকে বিকৃত করে তা শেষ করে দেওয়ার জন্য সেন্ট পল নামক এক ব্যক্তিকে হজরত ঈসার 'শিষ্য' হিসাবে উপস্থাপন করে। এই পল তখন খ্রিষ্টধর্মের নাম ব্যবহার করে নতুন এক ধর্ম সৃষ্টি করে। সুযোগসন্ধানী এই ইহুদিজাতিই ইসলামের উত্থানের পর হজরত উসমান রা.-এর শাসনামলে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার মুসলমান হওয়ার গল্প সাজায়। তাকে ব্যবহার করে ইসলামধর্মকে মিটিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করে। এই এক ফিতনার কারণে সেই সময় থেকে আজ অবধি লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয়ে কুফর ও গোমরাহির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করছে।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ইসলামধর্মের আবির্ভাব এবং এর দাওয়াত পৌঁছার পরও অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদকে সত্য মনে করা কিংবা পরকালের মুক্তির জন্য ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মমত অনুসরণকে সঠিক মনে করা কুফর যা পরিহার করা ফরজ। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ড. বকর বিন আবদুল্লাহ আবু জায়েদ কর্তৃক রচিত 'আল-ইবতাল লি-নাজারিয়াতিল খালত বাইনা-দ্বীনিল ইসলাম ওয়া গাইরিহি' গ্রন্থটি।[২৮]

কাফেরদের উৎসবে অংশগ্রহণ করা

প্রতিটি জাতি ও ধর্মের বিভিন্ন উৎসব ও বিচিত্র সংস্কৃতি রয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ও সমাবেশের আয়োজন করে থাকে। এগুলোর কিছু তো এমন যা কেবল পার্থিব বিষয়াদিসংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। আর বেশিরভাগই প্রত্যেকের স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাসের শিকড় থেকে উৎসারিত হয়।

কাফেরদের যে-সকল উৎসব ধর্মীয় ভিত্তিতে পালিত হয়, কোনো মুসলমানের

২৮. বাংলায় এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ১. 'ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতা; দুটো জীবনব্যবস্থার সংঘাত' বইয়ের 'ইন্টারফেইথ রিলিজিয়ন : পুরান কুফর নতুন বোতলে' প্রবন্ধটি, প্রকাশনা : চেতনা প্রকাশন; ২. ইন্টারফেইথ, মুহিউদ্দিন মাযহারী, প্রকাশনা : দারুল ইলম

জন্য সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা কোনোভাবেই জায়েজ নয়, বরং এটা মারাত্মক গোনাহের কাজ। কারণ ঈদ-উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রত্যেক ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক হয়ে থাকে। আর মুসলমানের জন্য কাফেরদের প্রতীক, শ্লোগান ইত্যাদী ধারণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম। হাদিস শরিফে এসেছে,

من تشبه بقوم فهو منهم.

(مصنف عبد الرزاق ٢٦٤/١٠، باب حلق القفا والزهد، ط التأصيل الثانية)

যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।[২৯]

ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كثر سواد قوم، فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به. انتهى. [إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ٥٣١/٤، باب فيمن دعي إلى وليمة فجاء ليدخل فسمع لهوا فرجع. نصب الراية ٦٤٣/٤، كتاب الجنايات، باب ما يوجب القصاص]

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কোনো সম্প্রদায়ের দল ভারী করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যে কোনো সম্প্রদায়ের কাজে সন্তুষ্ট থাকবে, সে ওই কাজের অংশগ্রহণকারী গণ্য হবে।[৩০]

আর যদি নিছক বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে মেলামেশা ও ওঠাবসা করা উদ্দেশ্য না হয়, বরং—

এক. অন্তর দিয়ে তাদেরকে ও তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ভালো মনে করে।

দুই. ধারাবাহিক কোনো কুফরি-শিরকি কাজে লিপ্ত থাকে।

তিন. কুফরি আচার-অনুষ্ঠানকে জায়েজ ও বৈধ বলে জ্ঞান করে।

চার. কুফর ও কাফেরদের বিষয়ে প্রদত্ত শরিয়তের জোরালো ও সুনির্দিষ্ট বিধানকে মানবতা ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী বিবেচনা করে।

তাহলে এসব শুধু গোনাহই নয়, বরং কুফর আবশ্যক করে। যার ফলে ব্যক্তির ঈমান ও ইসলাম কিছুই টিকে না। 'আল-বাহরুর রায়েক' প্রণেতা আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরি তো 'কুফরের কারণসমূহ'-এর আলোচনায় একথা পর্যন্ত লিখেছেন,

ويكفر بخروجه إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم وبشرائه يوم نيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما للنيروز لا للأكل

---

২৯. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ১০/৪৬২

৩০. মুসনাদে আবু ইয়ালার সূত্রে ইমাম বুসিরি ও যাইলায়ি রহিমাহুল্লাহ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। দেখুন, ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ, ৪/১৩৫ ও নসবুর রয়াহ, ৪/৩৪৬

والشرب وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك اليوم. (البحر الرائق ٩٢١/٥، كتاب السير، باب أحكام المرتدين)

অগ্নিপূজকদের নাইরোজ[৩১] উৎসবে বের হওয়া, সেদিনের কাজকর্মে তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করা, পানাহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত শুধুই নাইরোজকে সম্মান করার জন্য সেদিন কিছু ক্রয় করা যা অন্যদিন ক্রয় করা হয় না, এই দিনের মহত্ত্ব বজায় রাখার জন্য কোনোকিছু কাফেরদের উপহার দেওয়া, চাই তা একটি ডিমই হোক, এসব কাজের কারণে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়।[৩২]

'জামিয়ুল ফুসুলাইন'-এ (২/১৭৪) আছে,

اجتمع المجوس يوم النيروز فقال مسلم : خوب رسم نهاده اند، أو قال : نيك اثر نهاده، خيف عليه الكفر. (جامع الفصولين ٤٧١/٢، الفصل الثامن والثلاثون)

নাইরোজের দিনে অগ্নিপূজকদের জমায়েতকে যদি কোনো মুসলিম 'খুব ভালো অনুষ্ঠান এটি', অথবা 'এটি ভালো প্রভাব ফেলল' ইত্যাদি বলে, তাহলে তার কাফের হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[৩৩]

'মাজমাউল আনহুর'-এ রয়েছে,

ويكفر بخروجه إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم وبشرائه يوم نيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما للنيروز لا للأكل والشرب وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك اليوم ولا يكفر بإجابة دعوة مجوس وحلق رأس ولده.

ويكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لتخليص الأسير أو لضرورة دفع الحر والبرد عند البعض وقيل إن قصد به التشبيه يكفر وكذا شد الزنار في وسطه. (مجمع الأنهر ٨٥٦/١، كتاب السير باب

---

৩১. আরবিতে 'নাইরোজ' শব্দটির মূল হলো ফারসি 'নওরোজ'। অর্থাৎ, নববর্ষ। পারস্যের পাশাপাশি মিশরের লোকেরাও এই দিবস পালন করত। হাফেজ যাহাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৪৮ হি.) লেখেন,

فأما النيروز، فإن أهل مصر يبالغون في عمله، ويحتفلون به، وهو أول يوم من سنة القبط، ويتخذون ذالك اليوم عيدا...، وهو أول فصل الخريف.

নওরোজ হলো কিবতি বর্ষের প্রথম দিন। এই দিন মিশরীয়রা বাড়াবাড়ি রকমের আমল করে। সবাই উৎসবের জন্য সমবেত হয়। এটি কিবতিদের বাৎসরিক প্রথম দিবস। এই দিবসটিকে তারা ঈদ বা উৎসবের দিন হিসাবে গ্রহণ করে। বসন্তের প্রথম দিনকে বলা হয় নওরোজ। তাশাব্বুহুল খাসিস বি-আহলিল খামিস ফি রদ্দিত তাশাব্বুহি বিল মুশরিকিন, পৃ. ৪৯ (আব্দুল্লাহ)

৩২. আল-বাহরুর রায়েক, ৫/১৩৩

৩৩. জামিউল ফুসুলাইন, ২/১৮৪

المرتد، ألفاظ الكفر أنواع)

> অগ্নিপূজকদের সাথে নাইরোজের উৎসবে বের হওয়া, এবং সেদিনের কাজকর্মে তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ, পানাহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত, নাইরোজকে সম্মান করার উদ্দেশ্যে সেদিন কিছু ক্রয় করা। এ ছাড়াও এই দিনের মহত্ত্ব বজায় রাখার জন্য কাফেরদের কিছু উপহার দেওয়া, চাই তা একটি ডিমই হোক। এসব কাজের কারণে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। তবে কোনো অগ্নিপূজকের দাওয়াত গ্রহণ করলে বা তার সন্তানের মাথা মুণ্ডালে কাফের হয় না। সঠিক মত অনুসারে অগ্নিপূজকের টুপি পরলে কাফের হয়ে যায়, তবে যদি বন্দিমুক্তির উদ্দেশ্যে বা ঠান্ডা-গরম থেকে বাঁচার প্রয়োজনে পড়ে, তবে ভিন্ন কথা। একদল আলেম বলেছেন, তবে যে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার জন্য টুপি পড়ে থাকে, সে কাফের হয়ে যাবে। একই নিয়ম কোমরে বেল্ট পরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[৩৪]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত 'ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম' গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। কাফেরদের সাথে আচার-আচরণে এ জাতীয় যে ভুলভ্রান্তি হয় তা নিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। তিনি সেখানে অনেক মাসআলা সম্পর্কে বিস্তর কথা বলেছেন। আহলে ইলমদের অবশ্যই তা অধ্যয়নে রাখা উচিত।[৩৫]

ক্রিসমাসে (বড়দিনে) অংশগ্রহণ

বর্তমানে যাদের খ্রিষ্টান বলা হয় তারা ক্রিসমাসের নামে ২৫ ডিসেম্বরে যিশুর জন্মদিবস পালন করে। যা তাদের একটি ধর্মীয় উৎসব। তাদের এ দাবি ঐতিহাসিক, যৌক্তিক ও ধর্মীয় দিক থেকে কতটুকু সঠিক সেটা ভিন্ন বিষয়। যার উদঘাটনে আলেমগণ অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু এটা তাদের ধর্মীয় উৎসব, তাই এতে যোগদান করা, আনন্দ প্রকাশ করা, মুবারকবাদ দেওয়া, অথবা এর নামে চলমান কোনো কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা এবং তাদের সাথে কেক কাটা—এ সবই শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ এবং গুরুতর অপরাধ। এসবে পূর্ণ সতর্ক না থাকলে ব্যক্তির কাফের হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কাও রয়েছে। শহিদ আল্লামা ইবনুন নাহহাস দিমাশকি (মৃত্যু : ৮১৪ হি.) অত্যন্ত দুঃখের সাথে লিখেছেন,

---

৩৪. মাজমাউল আনহুর, ১/৬৯৮

৩৫. অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বর্তমানে একটি মহামারি রূপ ধারণ করেছে। তার থেকে আরও ভয়ংকর যে বিষয়টি মুসলিমদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা হলো, কিছু 'আলেমে সু'-এর বিভ্রান্তি! তারা প্রচার করছে কাফেরদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানানো বা সামাজিক প্রথা হিসাবে এ সকল দিনে হাদিয়া আদান-প্রদান নাজায়েয বা হারাম নয়, বরং উত্তম কাজ! আল্লাহ এ সকল আলেমের ভ্রান্তি থেকে উম্মতকে হেফাজত করুক। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় বিস্তারিত একটি প্রবন্ধ বইয়ের শেষে যুক্ত করা হয়েছে। দেখুন, পরিশিষ্ট এক, পৃ. ১৫৯। (আব্দুল্লাহ)

واعلم أن أقبح البدع وأشنعها موافقة المسلمين للنصارى في أعيادهم بالتشبه بهم في مأكلهم وأفعالهم والهدية إليهم وقبول ما يهدونه من مأكلهم في أعيادهم. وقد عانى هذه البدعة أهل بلاد مصر، وفي ذلك من الوهن في الدين وتكثير سواد النصارى والتشبه بهم ما لا يخفى.

সবচেয়ে খারাপ এবং নিকৃষ্ট বিদআত হলো, মুসলমানদের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টানদের ঈদ-উৎসবের সময় তাদের সামঞ্জস্য গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ঈদ উৎসবের সাথে একাত্মতা পোষণ করা। যেমন, তাদের মত খাবার খাওয়া, কাজকর্ম করা, তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠানো এবং তারা যে খাবার উপহার পাঠায় তা গ্রহণ করা ইত্যাদি। মিশরের জনগণ এই মারাত্মক বিদআতে নিমজ্জিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এর মাধ্যমে ইসলামধর্মকে দুর্বল হিসাবে প্রদর্শন করা, খ্রিষ্টানদের দল ভারী করা এবং তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা, এই তিনটি গুরুতর অপরাধ বিদ্যমান।[৩৬]

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখলদারি ও আধিপত্যের কারণে মুসলমানদের জন্য একটি বড় ট্র্যাজেডি হলো, মুসলিম দেশ ও মুসলিম সমাজেও বড়দিনের নামে বিভিন্ন সমাবেশ ও উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে অংশগ্রহণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই মুসলমান! বড় পরিতাপের বিষয় হলো একেই সহনশীলতা ও উদারতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। দুঃখজনক হলো, পত্রিকার রিপোর্টে দেখা গেছে, সম্প্রতি দেশের অনেক কর্ণধার বড়দিনের এই উদযাপনে অত্যন্ত গর্বভরে অংশ নিয়েছে। তার থেকেও বিপজ্জনক বিষয় হলো, যারা এ মারাত্মক অন্যায় থেকে বারণ করেন, তাদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি, নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেওয়া হয়। যা কখনো বেশ কয়েকটি ধর্মীয় অকাট্য বিধানের পরিপন্থী হয় এবং ধর্মকে অপমান, উপহাস ও অবমাননার দিকে নিয়ে যায়, যার কারণে ব্যক্তি কাফেরে পর্যবসিত হয়।

কাফেরকে ভাই বলার বিধান

যদি কোনো কাফের বংশ ও আত্মীয়তার দিক থেকে ভাই হয়, তাহলে তাকে এই অর্থে ভাই বলতে কোনো সমস্যা নেই। একইভাবে, মানবজাতির অংশ হওয়ার কারণে বা একই জাতি ও স্বদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কাউকে ভাই বলা যেতে পারে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লামা আইনি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৮৫৫ হি.) বলেন,

قوله : (المسلم أخو المسلم)، يعني أخوه في الإسلام، وكل شيئين يكون بينهما اتفاق تطلق عليهما اسم الأخوة. (عمدة القاري كتاب في اللقطة، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه)

---

৩৬. তামবিহুল গাফেলিন আন আমালিল জাহেলিন, ইবনুন নাহহাস, ৫০০

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই', এই হাদিসের মর্ম হলো ইসলামে তারা পরস্পর ভাই। প্রত্যেক ওই বস্তু যা পরস্পরের মাঝে ঐক্য হয় তাতে ভ্রাতৃত্বের প্রয়োগ করা যাবে।[৩৭]

তবে ইসলামের শিক্ষা হলো, ভাতৃত্ব বন্ধনের মূলভিত্তি ধর্মের ওপরই হওয়া কাম্য। সুরা হুজুরাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

মুমিনরা পরস্পর ভাই। সুতরাং আপনি তাদের মাঝে সংশোধন করে দিন।[৩৮]

রাসুলের অনেক হাদিসেও এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটাই এমন আদর্শ ভ্রাতৃত্ব যাতে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব বাধ সাধতে পারে না; পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই একজন মুসলমান বাস করুক, সে সকল মুসলমানেরই ভাই। পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মুসলমান ভাই ভাই; চাই রং, জাতি, চেহারা এবং ভাষা যতই আলাদা হোক না কেন। অতএব আত্মিক সম্পর্ক, অন্তরের মুহাব্বত ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে কোনো কাফের মুসলমানের ভাই হতে পারে না। আর যেহেতু এই ধরনের সম্পর্ক কাফেরদের সাথে রাখা জায়েয নেই, তাই এগুলোর ভিত্তিতে কাউকে ভাই ডাকাও শরিয়তে নিষিদ্ধ।[৩৯]

কাফেরদের প্রতি ভালোবাসার প্রকার ও বিধান

কাফেরদের সাথে আন্তরিক ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা হারাম। আর যদি এই ভালোবাসার ভিত্তি হয় তাদের ভ্রান্ত ধর্ম ও বিশ্বাসকে ভালো জ্ঞান করা, তবে তা স্পষ্ট কুফর। যদি তা ধর্মবিশ্বাসের কারণে না হয়, বরং পার্থিব কোনো কল্যাণ লাভ বা সৎ গুণগরিমার কারণে হয়, তাহলে সেটি কুফরি নয় বটে, তবে শরিয়তে তা নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ।

হজরত মাওলানা মুফতি কিফায়াতুল্লাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ একটি প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব লালন করা এবং মুসলমানদের বাদ দিয়ে কাফেরদের সাথে মেলামেশার প্রতি মুহাব্বত রাখা নাজায়েজ ও হারাম।[৪০]

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা : একটি ভুল বোঝাবুঝি

একটি ধারণা অনেকের মাঝে কাজ করে, কাফেরের সাথে সম্পর্ক নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তার কুফরি বিশ্বাসকে সমর্থন করার সাথে শর্তযুক্ত। অর্থাৎ কেউ যদি কুফরি

---

৩৭. উমদাতুল কারি, ১২/২৮৯

৩৮. সুরা হুজুরাত : ১০

৩৯. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম হজরত মাদানি এবং ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম যাকারিয়া, ৮/২১২

৪০. কিফায়াতুল মুফতি, ১৩/১৩৮

বিশ্বাসকে সমর্থন না করে, তাহলে কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করতে কোনো বাধা নেই। আসলে বিষয়টি এমন নয়। বরং স্বাভাবিকভাবেই কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব রাখা অবৈধ। তবে এতটুকু প্রার্থক্য রয়েছে যে, তার কুফরি আকিদা-বিশ্বাসের কারণে মুহাব্বত রাখা কেবল অবৈধ বা গোনাহই নয়, বরং সুস্পষ্ট কুফর। আর পার্থিব বিষয়াদিতে বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া কাফেরদের সাথে মিত্রতা করা কুফরি নয় বটে, তবে তাও নিষিদ্ধ। আর কুফর ও কুফরির কারণ, অনুষঙ্গ ও উপসর্গ ইত্যাদির প্রতি মুহাব্বত নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় হওয়া তো আকল, নৈতিক বিচারবোধ ও শরিয়তের দৃষ্টিতে একদমই স্পষ্ট। তাই সে সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর ও জোরালো আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নেই। বাকি নিছক পার্থিব বিষয়ে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাখ্যা, অজুহাত অনুপ্রবেশ করার ছিদ্র ছিল, তাই এই সম্পর্ক নিয়ে জোরালো আলোচনার প্রয়োজন। আর কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামিতে এই অংশ নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এর একটি বড় কারণ এটিও যে, যদিও ভালোবাসার উৎস ধর্মীয় কোনো বিষয় নাও হয়, বরং পার্থিব উদ্দেশ্যেই হয়, তবুও এই সম্পর্ক ও বন্ধুত্বই ক্রমান্বয়ে কুফর, কুফরের আচার-অনুষ্ঠান, কুফরি ধারণা-বিশ্বাস ও অভ্যাসের প্রতি ব্যক্তিকে কোমল ও নমনীয় বানিয়ে ফেলে। দেখা যায়, ব্যক্তি কার্যত কোনো কুফরি করার পদক্ষেপ না নিলেও কুফর ও তার পাপাচারের প্রতি ব্যক্তির ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অনুশোচনাবোধ একেবারেই দুর্বল হয়ে যায়। কারণ কোনো জিনিসের প্রতি ভালোবাসা একজন মানুষকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে, যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

এ কারণেই ফকিহগণ কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসার সকল দিককে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন, যদিও সে সম্পর্ক কুফরের প্রতি সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে না হয়।

ইমাম জাসসাস (মৃত্যু : ৩৭০ হি.) এ বিষয়ক বেশ কিছু আয়াত ও হাদিস একত্র করার পর বলেছেন,

> فنهى بعد النهي عن مجالستهم وملاطفتهم عن النظر إلى أموالهم، وأحوالهم في الدنيا... فهذه الآي والآثار دالة على أنه ينبغي أن يعامل الكفار بالغلظة والجفوة دون الملاطفة والملاينة، ما لم تكن حال يخاف فيها على تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه أو ضررا كبيرا يلحقه في نفسه، فإنه إذا خاف ذلك جاز له إظهار الملاطفة والموالاة من غير صحة اعتقاد.
>
> কাফেরদের সাথে ওঠাবসা ও নমনীয় আচরণ করতে বারণ করার সাথে সাথে তাদের ধনসম্পদ ও দুনিয়াবি প্রাচুর্যের দিকে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে। এই আয়াতসমূহ ও হাদিসগুলো নির্দেশ করে যে, কাফেরদের সাথে কঠোরতা ও অবজ্ঞার আচরণ করা উচিত, কোমল ও নমনীয় হওয়া যাবে

না। তবে যদি তার জীবন ধ্বংস, বা কোনো অঙ্গহানি ঘটার আশঙ্কা থাকে, অথবা বাস্তবই কোনো বড়ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। এ জাতীয় আশঙ্কা থাকলে বাহ্যিকভাবে কাফেরের সাথে নম্রতা ও মিত্রতার আচরণ করা যাবে। তবে অন্তরের বিশ্বাস ঠিক থাকতে হবে।[৪১]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৬০৬ হি.) লিখেছেন,

والقسم الثالث : وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين، هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة، والمظاهرة، والنصرة إما بسبب القرابة، أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال : ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. (التفسير الكبير٢٩١/٨، سورة آل عمران (٣) : آية ٨٢)

তৃতীয় প্রকার : এটি প্রথম দুপ্রকারের মধ্যবর্তী একটি প্রকার। অর্থাৎ কাফেরদের সাথে মিত্রতার আরেকটি প্রকার হলো তাদের ধর্ম ভ্রান্ত এটা বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কোনো নিকটাত্মীয় সম্পর্কের কারণে বা ভালোবাসা-মহব্বতের কারণে তাদের দিকে ঝুঁকে যাওয়া, সাহায্য করা এবং তাদের সমর্থন করা। এ প্রকারটি কুফরি না হলেও তা নিষিদ্ধ। এমন মিত্রতা ব্যক্তিকে কাফেরদের রীতিনীতি ও ধর্মের প্রতি অভিভূত ও দুর্বল করে তুলবে। যা তাকে (একসময়) ইসলামের সীমানা থেকে বের করে দেবে। তাই তো আল্লাহ্ তাআলা এ জাতীয় কাজের প্রতি ভয় প্রদর্শন করে বলেছেন, যে এমন করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।[৪২]

এই বক্তব্যে স্পষ্টই রয়েছে, কাফেরদের ধর্মের প্রতি কোনো মুহাব্বত না থাকলেও তাদের সাথে আন্তরিকতা রাখা জায়েয নেই।

আল্লামা আবুস সাউদ রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৯৮২ হি.) লেখেন,

{لَّا يَتَّخِذِ المؤمنون الكافرين أَوْلِيَاء} نُهوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية ونحوهما من أسباب المصادقة والمعاشرة كما في قوله سبحانه {يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء} وقوله تعالى {لَا تَتَّخِذُواْ اليهود والنصارى أَوْلِيَاء} حتى لا يكونَ حبهم ولا بغضهم إلا لله تعالى أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية.

'মুমিনরা যেন কাফেরদের বন্ধু না বানায়', এই আয়াতে কাফেরদের সাথে

---

৪১. আহকামুল কুরআন, জাসসাস, ২/২৮৯

৪২. আত-তাফসিরুল কাবির, ৮/১৯২

আত্মীয়তার সম্পর্ক বা জাহেলি বন্ধুত্ব ইত্যাদি সামাজিক কোনো কারণে মিত্রতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪৩]

পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে এখানে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কেবল ধর্মীয় বিষয়াদির বিবেচনায় কাফেরদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও বন্ধুত্ব করা নিষিদ্ধ বিষয়টি এমন নয়, বরং আত্মীয়তা ও নিছক সোহর্দ-সম্প্রীতি ইত্যাদির ভিত্তিতেও তাদের সাথে মিত্রতা রাখা অবৈধ। 'তাফসিরে মাজহারি'-তে এসেছে,

نهوا عن موالاتهم بقرابة أو صداقة ونحو ذلك أو عن الاستعانة بهم فى الغزو وسائر الأمور الدينية من دون المؤمنين. فيه اشارة إلى أن ولايتهم لا يجتمع ولاية المؤمنين لأجل منافاة بين ولاية المتعادين، ففى ولاية الكفار قبح بالذات وقبح بالعرض بالحرمان عن ولاية المؤمنين... (التفسير المظهري ٢/٢٣، مكتبة الرشيدية الباكستان)

কাফেরদের সাথে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও অন্য কোনো কারণে মিত্রতা করা; যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্যান্য ধর্মীয় কাজে মুসলমানদের পরিবর্তে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ। এ থেকে এও বোঝা যায়, কাফেরের সাথে মিত্রতা আর মুমিনদের সাথে মিত্রতা একত্র হয় না। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব তো সত্তাগতভাবেই খারাপ, সাথে আরেকটি অনিষ্ট হলো এতে মুসলিমদের বন্ধুত্ব থেকে ব্যক্তি বঞ্চিত হয়।...[৪৪]

ঘৃণা কাফেরের প্রতি, না কুফরের প্রতি

কাফেরদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখার যে বিধান এখানে বলা হয়েছে, এর ওপর একটি আপত্তি এই উত্থাপিত হয়, 'ঘৃণা ও বিদ্বেষ কাফেরের প্রতি নয়, বরং কুফরের প্রতি। কারণ কাফেররাও তো মানুষ। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা না রাখাই উচিত। ঘৃণা তো হবে তার কর্মের প্রতি।'

এই আপত্তিটি কখনো বিভিন্ন ধর্মীয় ঢঙে উল্লেখ করা হয়, আবার কখনো এমন নিষ্পাপ ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয় যে, সাধারণ মুসলমান ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো না জানা থাকার কারণে এতে বেশ পেরেশান হয় এবং ধোঁকায়ও পতিত হয়ে যায়।

বাস্তবতা হলো, এই আপত্তিটির কয়েকটি দিক হতে পারে—

ক. ওপরের কথা দ্বারা যদি উদ্দেশ্য এটা হয় যে, কোনো মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের মূল ভিত্তি কারও ব্যক্তিত্ব বা সত্তা নয়, বরং ব্যক্তির ঘৃণিত ও নিন্দিত চিন্তা ও কর্মই হলো তাকে ঘৃণা করার মূল ভিত্তি, যেগুলো সে স্বেচ্ছায় করেছে। এই হিসাবে উপরিউক্ত কথাটি ভুল নয়। বরং ইসলামের মূলনীতির সাথেও এটা সামঞ্জস্যশীল।

---

৪৩. তাফসিরে আবিস সাউদ, ২/২৩

৪৪. তাফসিরে মাজহারি, ২/৩২

কেননা ইসলাম সকল মানুষকেই 'আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং তার প্রচার ও প্রসার করে। জাতপাতের কোনো ধারণা ইসলামে নেই। ইসলাম কোনো বংশ বা দলকে সম্মান ও অসম্মানের মাপকাঠি নির্ধারণ করেনি। কুফর ও জুলুমের মতো ঘৃণিত অপরাধ করে কোনো ব্যক্তি নিজের অযোগ্যতার পরিচয় দিলে তার এই পদক্ষেপ নিন্দা ও ঘৃণার যোগ্য হবে, কিন্তু যখনই সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে সংশোধন করে নেবে, তখনই সে পূর্বের ইজ্জত ও সম্মান ফিরে পাবে। কিন্তু কোনো কাফেরের ব্যক্তিত্বকেই যদি ঘৃণার মাপকাঠি বানিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে সে ইসলাম কবুল করার পরও ঘৃণিতই থেকে যেত, কিন্তু বিষয়টা বাস্তবে তেমন নয়।

খ. আর এই বাহ্যত নিষ্পাপ স্লোগানের উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, আমাদের ঘৃণা শুধু 'কুফর' গুণটির সাথে। কিন্তু এই গুণের ধারক কাফেরের সাথে আমাদের কোনো ঘৃণা নেই, বরং তার এই গুণকে ঘৃণা করে তাকে ভালোবাসাই উচিত, তাহলে এটা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভুল ও একটি অবাস্তব দাবি। এটা শুধু মানুষের কল্পনাতেই সম্ভব, বাস্তব জীবনে এটার প্রয়োগ অসম্ভব। কেননা 'ব্যক্তি' ও 'তার অর্জিত গুণ' এ দুটিকে পৃথক করার কোনো মাপকাঠি তৈরি কি আদৌ সম্ভব? এটার কল্পনাও কি কেউ করতে পারবে? কেননা ব্যক্তিই তো ঘৃণিত 'গুণটি' নিজের মাঝে ধারণ করে, সেই 'গুণের' কারণে শাস্তি ব্যক্তিকেই পেতে হয়, ব্যক্তির সে 'গুণ'-কে শাস্তি দেওয়া হয় না। এই দাবি ও চিন্তাও কি আদৌ সম্ভব, চুরিকে শাস্তি দেওয়া হোক, চোরকে নয়!

কাফেরদেরকে সম্মান প্রদর্শন করার বিধান

ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হলো শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করা। কারও প্রতি ভালোবাসা যখন হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে যায়, তখন তার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বাড়তে থাকে, যে ভক্তি-শ্রদ্ধার উৎস হলো ভালোবাসা ও অগাধ আস্থা। পাশাপাশি ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে ভালোবাসায় আরও শক্তি সঞ্চারিত হয়। আর এক-দুজনের মাঝে এ জাতীয় শ্রদ্ধা-ভক্তির সম্পর্ক দেখে অন্য মুসলমানরাও কাফেরদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। যার কারণে ইসলামের দৃষ্টিতে কাফেরকে সম্মান প্রদর্শন করাও মৌলিকভাবে নাজায়েজ।

আল্লামা ইবনে নুজাইম রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন,

ولا يبدأ الذمي بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب على وعليك، وتكره مصافحته، ويحرم تعظيمه.(الأشباه والنظائر ص ٢٨٠، الفن الثالث، أحكام الذمي)

জিম্মিকে[৪৫] আগে সালাম দেবে না এবং সে সালাম দিলে উত্তরের ক্ষেত্রে

৪৫. ইসলামি ভূখণ্ডের স্বাভাবিক আইনকানুন মেনে নিয়ে ও জিজিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যে কাফের দারুল ইসলামে বাস করে। (আব্দুল্লাহ)

শুধু ‘ওয়া আলাইকা’ (অর্থাৎ, তোমার প্রতিও অনুরূপ) এতটুকুর বেশি বলবে না। তবে জরুরত হলে আগে সালাম দিতে পারবে। তার সাথে মুসাফাহা করা মাকরুহ। আর তাকে শ্রদ্ধা জানানো হারাম।[৪৬]

আল্লামা হামাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১০৯৮ হি.) ‘কাফেরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হারাম’-এর টীকায় উল্লেখ করেছেন,

قوله : ويحرم تعظيمه قال في الذخيرة : ولو قام المسلم له إن كان تعظيما له أو لغنائه كره، وإن كان لطمعه في الإسلام فلا بأس به، وجزم الطرسوسي بأنه إن قام تعظيما لذاته وما هو عليه كفر (انتهى) . ولا بأس هنا في كلامه للإباحة لا لما تركه أولى. (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ١٠٤/٣، باب أحكام الذمي)

কোনো মুসলমানের জন্য কাফেরের প্রতি শ্রদ্ধাবশত বা তার সম্পদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দাঁড়ানো মাকরুহ। তবে যদি কাফেরের ইসলাম গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হয়ে দাঁড়ায়, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তারসুসি রহিমাহুল্লাহ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, যদি কাফেরের ব্যক্তিগত কুফরি অবস্থানের কারণে দাঁড়ায়, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর ‘তবে যদি কাফেরের ইসলাম গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হয়ে দাঁড়ায়, তাতে কোনো সমস্যা নেই’ কথা দ্বারা দাঁড়ানো সাধারণভাবেই বৈধ এটা বোঝানো হয়েছে। ‘না দাঁড়ানো উত্তম’ এই অর্থে নয়।[৪৭]

বলাবাহুল্য, ইসলামের দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন বৈধ, এটা সৌজন্য (মুদারত) প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

কাফেরের গুণকীর্তন করা

শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশের একটি পদ্ধতি হলো প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা। সুতরাং পূর্বে শ্রদ্ধা করার ক্ষেত্রে যে ধরনের বিধান বলা হয়েছ, প্রশংসার ক্ষেত্রেও সে বিধান প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ কেউ যদি অন্তরঙ্গতা বা শ্রোতাদের অন্তরে কোনো শরয়ি কারণ ছাড়া কাফেরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য কাফেরের গুণকীর্তন করে, তবে তাও নাজায়েজ। ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন,

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدةعن أبيه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا للمنافق : سيد، فإنه إن يك سيدا، فقد أسخطتم ربكم عز وجل

---

৪৬. আল-আশবাহ ওয়ান-নাজায়ের, ইবনে নুজাইম, ২৮০

৪৭. গামযু উয়ুনিল বাসায়ের শারহুল আশবাহ ওয়ান-নাজায়ের, ৩/৪০১

(سنن أبي داود برقم : ٧٧٩٤، كتاب الآداب، باب لا يقول المملوك : ربي وربتي، ت شعيب الأرنؤوط)

তোমরা কোনো মুনাফিককে সাইয়েদ (নেতা) বলো না। কারণ মুনাফিককে সাইয়েদ বলা আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধের কারণ।[৪৮]

মুনাফিককে নেতা বলা আল্লাহর গোসসার কারণ কেন হয়? এর একটি বড় কারণ হলো 'সাইয়েদ বা নেতা' অত্যন্ত সম্মানসূচক শব্দ আর মুনাফিক তার নেফাক ও কপটতার কারণে এমন সম্মানের অযোগ্য। আল্লামা মুযহিরি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

(فقد أسخطتم ربكم)؛ أي : أغضبتم ربكم؛ لأنكم قد عظمتم كافرا، وتعظيم الكافر يخالف رضا الله وأمره. (المفاتيح في شرح المصابيح ٧٥١/٥، كتاب الآداب، باب الأسامي)

'তোমরা তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করেছ'-এর মর্ম হলো, তোমরা কাফেরদের সম্মান করে তোমাদের প্রতিপালককে রাগান্বিত করেছ। আর কাফেরের সম্মান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাংঘর্ষিক।[৪৯]

অর্থাৎ মুনাফিক যেহেতু আল্লাহর আইনে সম্মানের পাত্র নয়, তাই তাকে নেতা ডেকে শ্রদ্ধা করাই আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ। সুতরাং যে মুনাফিক তার কুফরি লুকিয়ে রেখে চলে, তাকে সম্মান করা যদি এমন ভয়াবহ হয়, তাহলে প্রকাশ্যে কুফরের মহড়ায় লিপ্ত কাফেরদের সম্মান করা তো আরও আগে বেড়েই নিষিদ্ধ হবে।

এখানে নিষিদ্ধতার মৌলিক কারণ হলো কাফেরের প্রশংসা-স্তুতি। তা কেবল 'সাইয়েদ' শব্দের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সম্মানসূচক ও স্তুতিজ্ঞাপক সবধরনের শব্দ-বাক্যের ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে দ্বীনি কোনো স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনে তা বৈধ। যার বিবরণ মুদারাত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৪৫৮ হি.) 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে এ সম্পর্কিত আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন,

عن أنس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز له العرش. (شعب الإيمان ٩٠٥/٦، باب حفظ اللسان، ط مكتبة الرشد)

আনাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

৪৮. সুনানে আবু দাউদ, ৪৯৭৭
৪৯. আল-মাফাতিহ ফি শরহিল মাসাবিহ, ৫/১৫৭

পাপিষ্ঠের প্রশংসায় মহান আল্লাহ রাগান্বিত হন। এমনকি তাঁর আরশও কেঁপে ওঠে।[৫০]

আর কাফের যেহেতু সর্বনিকৃষ্ট পর্যায়ের পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তাই সে তো বহু আগেই আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হওয়ার উপযুক্ত। আল্লামা তিবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৪৩ হি.) উক্ত হাদিসে উল্লেখিত 'তাঁর আরশ কেঁপে ওঠে'-এর ব্যাখ্যায় বলেন,

قوله : ((اهتز له العرش)) اهتزاز العرش عبارة عن وقوع أمر عظيم وداهية دهياء؛ لأن فيه رضى بما فيه سخط الله وغضبه، بل يقرب أن يكون كفرا؛ لأنه يكاد أن يفضي إلى استحلال ما حرمه الله تعالى، وهذا هو الداء العضال لأكثر العلماء والشعراء، والقراء والمرائين في زماننا هذا. وإذا كان هذا حكم من مدح الفاسق، فكيف بمن مدح الظالم وركن إليه ركونا؟. (الكاشف عن حقائق السنن ١٣١٣/٠١ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، ط مكتبة نزار مصطفى الباز)

'আরশ কেঁপে ওঠা'-এর মাধ্যমে ঘোরতর ও ভয়াবহতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কারণ পাপিষ্ঠের প্রশংসা করার অর্থ হলো আল্লাহর ক্রোধের বস্তুর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। বরং এমন কাজ কুফরের নিকটবর্তী হয়ে যায়। কেননা এতে একরকম ব্যক্তিকে আল্লাহর হারাম করা বস্তুকে হালাল জ্ঞান করার দিকে পরিচালিত করার আশঙ্কা রয়েছে। আর এই ভয়ংকর ব্যাধিতেই আমাদের সময়ের অধিকাংশ আলেম, কবি, লেখক-সাহিত্যিক ও চাটুকাররা পতিত, যে ফাসেককে শুধু প্রশংসা করে তার হুকুমই যদি এমন হয়ে থাকে, তাহলে ওই ব্যক্তির হুকুম কেমন হবে যে জালেমের প্রশংসা করে এবং তার দিকে ধাবিত হয়![৫১]

যদি কোনো কাফেরের ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট থেকে নিজে বাঁচার জন্য বা অন্য মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য প্রসংশা করা হয়, কিংবা ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতের স্বার্থে কেউ

---

৫০. শুআবুল ঈমান, বাইহাকি, ৬/৫০৯

হাফেজ বুসিরি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৮৪০ হি.) বলেন,

قال أبو يعلى : هذا من حفظي، له شاهد من حديث بريدة بن الحصيب، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح الإسناد. (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ٤٨/٦، كتاب الآداب، باب ما جاء في مدح الصدق وذم الكذب والمدح)

এই হাদিসের শাওয়াহেদ রয়েছে যা সহিহ সনদে প্রমাণিত। ইতহাফুল খিয়ারাহ, ৬/৮৪

ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৮৫২ হি.) বলেন,

أخرجه أبو يعلى وبن أبي الدنيا في الصمت وفي سنده ضعف. (فتح الباري لابن حجر٨٧٤/٠١، كتاب الآداب، باب ما يكره من التمادح)

হাদিসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে। ফাতহুল বারি, ১০/৪৭৮ (আব্দুল্লাহ)

৫১. আল-কাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান, ১০/৩১৩১

কাফেরের প্রশংসা করে তাতে সমস্যা নেই। তবে শর্ত হলো প্রশংসায় বাস্তবতাবিবর্জিত অতি উচ্চ বাক্য ব্যবহার করা যাবে না। বরং তার প্রশংসায় বাস্তবাশ্রিত কথাবার্তার ভেতরেই থাকতে হবে। কোনো কুফরি অথবা অবৈধ অভ্যাসের কারণে তার প্রশংসা করা যাবে না। কারণ কুফরি অথবা কুফরিকে আবশ্যক করে এমন বিষয়ের প্রশংসা করাকে ফকিহগণ কুফর আখ্যা দিয়েছেন। যার কারণে দ্বীনি স্বার্থে প্রশংসা করার ক্ষেত্রেও এই শর্তগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি। বলাবাহুল্য, কাফের রাষ্ট্রগুলোর প্রশংসার ক্ষেত্রেও এসব বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে।[৫২]

কাফের আত্মীয়ের দাফন-কাফনের বিধান

যদি কোনো মুসলমানের কাফের আত্মীয় মারা যায় এবং তার দাফন-কাফন করার মতো কেউ না থাকে, এমতাবস্থায় মুসলিম কাফের আত্মীয়ের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের কাফন-দাফনের মতো হতে পারবে না। অর্থাৎ, তার শরীরে পানি ঢেলে স্বাভাবিকভাবে ধুবে, এরপর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে মাটি খোদাই করে তাতে রেখে দেবে। মুসলমানদের কবরের মতো কবর করতে পারবে না। মোল্লা আলি কারি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১০১৪ হি.) লেখেন,

> ولو مات كافر وله قريب مسلم، غسله كالثوب النجس، ولفه في خرقة، وألقاه في حفرة من غير مراعاة السنة في شيء من ذلك. فتح باب العناية ١/٤٤٠، كتاب الصلاة، باب في الجنائز)
>
> যদি মুসলমানের কাফের আত্মীয় মারা যায় (আর অন্য কোনো কাফের আত্মীয় না থাকে) তাহলে মুসলিম সে আত্মীয়কে নাপাক কাপড় যেভাবে পানি ঢেলে ধৌত করা হয় সেভাবে ধুবে, অতঃপর তাকে একটি সাধারণ কাপড়ে পেঁচিয়ে মাটি খুড়ে রেখে দেবে। এবং এতে দাফনের কোনো সুন্নত পদ্ধতির অনুসরণ করা যাবে না।[৫৩]

মুসলমানদের কবরস্থানে কাফেরদের দাফন করার বিধান

মুসলমান ও কাফেরের মাঝে যে বিষয়গুলোর পার্থক্য রাখা অত্যন্ত জরুরি তার মাঝে

---

৫২. ওপরে উল্লেখিত ফিকহি বক্তব্যগুলো ও এর ব্যাখ্যার আলোকে কাফের শিক্ষক বা কোনো কাফেরের অধীনতার কারণে প্রশংসার বিধানটিও স্পষ্ট হয়ে যায়। যদি কোনো কাফেরের শিষ্যত্ব গ্রহণে বা অধীনতার ফলে দ্বীনের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়, তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে তার শিষ্যত্ব বা অধীনতা গ্রহণ জায়েয হবে না। আর এমন আশঙ্কা যদি না থাকে তাহলেও তাদের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা রাখা জায়েয নেই। বাকি রইল নিজের দ্বীনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে ও তাদের প্রতি মুহাব্বত না রেখে তাদের সম্মান বা গুণকীর্তন করা কি জায়েয হবে? এর বিধান হলো, সাধারণ অবস্থাতে তাদের সম্মান ও গুণকীর্তন করা থেকে বিরত থাকাই উচিত। তবে বাস্তবিকই যদি 'উপকার অর্জন', যেমন তার ইসলাম গ্রহণের আশা ও 'ক্ষতি থেকে বাঁচা', যেমন জানের হেফাজত, বা সার্টিফিকেট আটকে না দেওয়া ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন প্রয়োজন পরিমাণ মৌখিক সম্মান ও প্রশংসা করার সুযোগ রয়েছে। (মুফতি উবাইদুর রহমান)

৫৩. ফাতহু বাবিল ইনায়া, ১/৪৪০

একটি হলো কবরস্থান। সাধারণ অবস্থায় মুসলমানদের কবরস্থানে কাফেরদের ও কাফেরদের কবরস্থানে মুসলমানদের দাফন করা জায়েয নেই। এর একটি কারণ তো হলো, মুসলমানরা যখন কবরস্থানের জন্য জায়গা ওয়াকফ করে তখন সাধারণত মুসলমানদেরই দাফনের জন্য ওয়াকফ করে, এমতাবস্থায় অমুসলিমদের সেখানে দাফন করা ওয়াকফকারীর শর্তের বিরুদ্ধ হয় যা ইসলামে সঠিক নয়। তেমনইভাবে কাফেরদের কবরস্থানগুলোও কাফেরদের নিজেদের জন্যই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। তাই সেখানেও মুসলমানদের দাফন করা জায়েয নেই। এ ছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলাম ও কুফরের বিধানের মাঝে পার্থক্য রাখা। সুতরাং যদি কোনো ওয়াকফকারী কবরস্থানকে কাফের ও মুসলমান উভয় শ্রেণিকে দাফন করার জন্য ওয়াকফ করে, তাহলে তার এই কাজটি হারাম ও নাজায়েয হবে। 'মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যায়' উল্লেখ রয়েছে,

اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن مسلم في مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة. (موسوعة الفقهية الكويتية ٩١/١٢)

ফকিহগণ এই ব্যাপারে একমত যে, শরিয়তনির্দেশিত কোনো ওজর ব্যতীত মুসলমানকে কাফেরদের কবরে দাফন করা বা কাফেরদের মুসলমানের কবরে দাফন করা হারাম।[৫৪]

কাফের নর-নারীকে বিবাহ করার বিধান

কাফের দুধরনের হয়ে থাকে। এক. আহলে কিতাব তথা ইহুদি, খ্রিষ্টান। দুই. আহলে কিতাব ব্যতীত অন্যান্য কাফের। উলামায়ে কেরামের প্রায় সকলেই একমত যে, আহলে কিতাব ব্যতীত অন্যান্য কাফের নর-নারীর সাথে কোনো মুসলমান নর-নারীর বিবাহ বৈধ নয়। আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬২০ হি.) বলেন,

وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. (المغني ١٣١/٧، باب فصل النكاح من الكفار غير أهل الكتاب ط مكتبة القاهرة)

আহলে কিতাব ব্যতীত অন্য সকল কাফের যারা নিজেদের পছন্দমতো মূর্তি, পাথর, গাছপালা এবং পশুপাখির উপাসনা করে, তাদের সাথে মুসলমানদের বিবাহ এবং তাদের জবাই করা পশু খাওয়া মুসলমানদের জন্য নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো মতভেদ নেই।[৫৫]

---

৫৪. মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যা, ২১/১৯

৫৫. আল-মুগনি, ইবনে কুদামা, ৭/১৩১

আহলে কিতাবের সাথে বিবাহের দুই সুরত

এক. মুসলিম নারী আহলে কিতাব কোনো পুরুষকে বিবাহ করা। এটি শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। আল্লাহ তাআলা কুরআনে একে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।

وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ

> তোমরা নিজেদের নারীদের মুশরিক পুরুষদের কাছে বিবাহ দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে।[৫৬]

তেমনইভাবে সুরা মুমতাহিনার নিম্নের আয়াতে এই ধরনের বিবাহকে আল্লাহ তাআলা নাজায়েয বলেছেন।

فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ

> তোমরা মুমিন নারীদের কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ো না। এই নারীরা কাফেরদের জন্য বৈধ নয় ও কাফেররাও এই নারীদের জন্য বৈধ নয়।[৫৭]

যার কারণে উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হলো, কোনো মুসলিম নারীর জন্য কোনো আহলে কিতাব পুরুষকে বিবাহ করা বৈধ নয়।

আল্লামা কাসানি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৫৮৭ হি.) বলেন,

> لا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى : {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}. (بدائع الصنائع ٢/١٧٢، كتاب النكاح، فصل إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة، ط. دار الكتب العلمية)

> মুসলমান নারীকে কাফেরের সাথে বিবাহ দেওয়া জায়েয নয়। এর দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী, 'তোমরা নিজেদের নারীদের মুশরিক পুরুষদের কাছে বিবাহ দিয়ো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে।'[৫৮]

আল্লামা ওয়াহবা যুহাইলি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৪৩৬ হি.) বলেন,

> يحرم بالإجماع زواج المسلمة بالكافر، لقوله تعالى : {ولا تُنْكحوا المشركين حتى يؤمنوا} وقوله تعالى : {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}. (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٩/٦٦٠٢٥، القسْمُ السَّادسُ : الأحوال الشّخْصيَّة، فصل زواج المسلمة بالكافر.)

> উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, কাফেরের সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ

---

৫৬. সুরা বাকারা : ২২১

৫৭. সুরা মুমতাহিনা : ১০

৫৮. বাদায়েউস সানায়ে, ২/২৭১

হারাম।[৫৯]

দুই. আহলে কিতাবের সাথে বিবাহের দ্বিতীয় সুরত হলো, মুসলিম পুরুষ আহলে কিতাব কোনো মহিলাকে বিয়ে করা। এটি উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতানুযায়ী মৌলিকভাবে জায়েজ। তবে বর্তমান জামানায় আদমশুমারিতে পরিচয়ধারী বহু খ্রিষ্টান-ইহুদি পাওয়া যায় ঠিক, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আহলে কিতাব খ্রিষ্টান-ইহুদি পাওয়া যায় না। কারণ তারা খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মানুযায়ী আল্লাহ, পয়গম্বর ও আসমানি কিতাবসমূহের ওপর ঈমান রাখে না। এই কারণে এই যুগে নামেমাত্র আহলে কিতাবের সাথে বিবাহ বৈধ নয়। তাই বিবাহের পূর্বে অবশ্যই যাচাই-বাছাই করতে হবে।

মুসলিম পুরুষ কর্তৃক কিতাবি মহিলাকে বিবাহ বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন,

> وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين) ليس بين أهل العلم بحمد الله، اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب. وممن روي عنه ذلك عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة وسلمان، وجابر، وغيرهم. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. (المغني ٩٢١/٧، مسألة حرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم)
>
> আহলে কিতাব স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কারও দ্বিমত নেই। এ ব্যাপারে হজরত উমর, উসমান, তালহা, হুজাইফা, সালমান ও জাবের রা. প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কিতাবি মহিলাকে বিবাহ করা হারাম' পূর্বসূরি কারও থেকে এমন মত প্রমাণিত নয়।[৬০]

সাহাবায়ে কেরামের অপছন্দ ও তার মৌলিক কারণ

ওপরে জানা গেল যে কিতাবি নারীর সাথে বিবাহ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। তবে এ কথাও নির্দ্বিধায় বলা যায়, তা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও এতে অনেকগুলো সমস্যা ও ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। যার কারণে বহুসংখ্যক সাহাবি এবং পূর্বসূরিগণ একে অপছন্দ করতেন। নিজেদের সম্পর্কিত লোকদের তা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতেন। এমনকি হজরত উমরের মতো বলিষ্ঠ, দায়িত্ববান ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত সাহাবিদের প্রতি এই নির্দেশ জারি করেছিলেন, যারা কিতাবি মহিলাকে বিবাহ করেছে তারা যেন তালাক দিয়ে দেয়।

আল্লামা ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন,

---

৫৯. আল-ফিকহুল ইসলামি, ৯/৬৬৫২

৬০. আল-মুগনি, ইবনে কুদামা, ৭/১২৯

إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن. فطلقوهن إلا حذيفة، فقال له عمر : طلقها. قال : تشهد أنها حرام؟ قال : هي جمرة، طلقها. قال : تشهد أنها حرام؟ قال : هي جمرة. قال : قد علمت أنها جمرة، ولكنها لي حلال. فلما كان بعد طلقها، فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي. (المغني ٩٢١/٧، مسألة حرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم)

সুতরাং আহলে কিতাব মহিলাকে বিবাহ না করাই উত্তম। যারা কিতাবি মহিলাকে বিবাহ করেছিল, উমর রা. তাদেরকে তালাকের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা সে নির্দেশমতে তালাক দিয়েছিল। তবে হুজাইফা রা. তালাক দেননি। তখন উমর রা. তাকে বললেন, তালাক দাও। তিনি বললেন, আপনি কি মনে করেন, সে হারাম? উমর রা. বললেন, না, সে আগুনের অঙ্গার। উমর রা. আবার বললেন, তাকে তালাক দাও। তিনি বললেন, আপনি কি মনে করেন, সে হারাম? উমর রা. বললেন, না, সে আগুনের অঙ্গার। হুজাইফা রা. বললেন, আমি জানি সে আগুনের অঙ্গার, তবে সে আমার জন্য বৈধ। পরে যখন সে কিতাবি মহিলাকে হুজাইফা রা. তালাক দিলেন, তখন তাকে বলা হলো, যখন উমর বলেছিলেন তখন কেন তালাক দেননি? তিনি বললেন, আমি অপছন্দ করেছি যে মানুষ মনে করবে, আমি কিতাবিকে বিয়ে করে কোনো মন্দ কাজ করেছি।[৬১]

কিতাবি বিবাহ বৈধ হওয়া সত্ত্বেও এ থেকে বিরত থাকতে বলার প্রধান কারণ হলো, বিবাহের মাধ্যমে কিতাবি স্ত্রীর পরিবারের সাথে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি তৈরি হয়ে যায় যা একটি শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার। আর সাধারণত অধিকাংশ মানুষ এতটা সংযমী নয় যে, সৌজন্য প্রদর্শন করতে গিয়ে কিতাবি আত্মীয়দের সাথে শরিয়তের নিষিদ্ধ সম্পর্ক ও সম্প্রীতিতে জড়িয়ে পড়া থেকে নিজেকে সংবরণ করতে পারবে।

তাই সাধারণত এমন হয় যে, এই সম্পর্কই অনেক অনেক মন্দ কাজের উৎস হয়ে ওঠে এবং এই সম্পর্কের কারণে আহলে কিতাব শ্বশুরালয়ের হস্তক্ষেপের দরজা খুলে যায়। যা কখনো কখনো পুরো পরিবারকে পূর্ণমাত্রায় বিপথগামী করার মাধ্যম হয়। ইতিহাসে এর উদাহরণও কম নয়।

পবিত্র কুরআনও মৌলিকভাবে এ প্রভাবের স্বীকৃতি দিয়েছে, তাই কাফের পুরুষের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে নিষিদ্ধ করার প্রেক্ষাপটে আল্লাহর এই বাণী রয়েছে, 'ওদেরকে আগুনের দিকে ডেকে নেওয়া হচ্ছে।' এর অর্থ এই যে, এই লোকেরা বিবাহের সুযোগ কাজে লাগিয়ে অন্যদেরকে বিচ্যুত করে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর নারী যেহেতু আনুগত্যশীল এবং অধীনস্থ, তাই তার ক্ষেত্রে এই বিপদগুলো বাস্তব,

---

৬১. আল-মুগনি, ইবনে কুদামা, ৭/১২৯

যার কারণে কাফেরদের সাথে সম্পূর্ণরূপে মুসলিম নারীর বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। আর স্বামী মুসলমান আর স্ত্রী কিতাবি, সেখানে এই সমস্যাগুলো এতটা প্রবল নয়। যার কারণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও এই মৌলিক কারণটিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই যেখানে এ ধরনের বিপদ নিশ্চিত বিদ্যমান থাকে, সেখানে কিতাবি নারীকে বিবাহ করাও নিষিদ্ধ হবে।

আল্লামা কাসানি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

> ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينه، والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدونهم في الدين إليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله -عز وجل- : {أولئك يدعون إلى النار} : لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النار، فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراما. (بدائع الصنائع ١٧٢/٢، كتاب النكاح، فصل إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة، ط. دار الكتب العلمية)
>
> কাফেরের সাথে মুমিন নারীর বিবাহের মাধ্যমে নারীর কুফরে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ স্বামী তাকে স্বীয় ধর্মের দিকে ডাকবে, আর স্ত্রীগণ সাধারণত স্বামীরা যেসব কাজে প্রভাব ফেলে সেসব ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করে এবং দ্বীনধর্মের ক্ষেত্রে তাদের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। এদিকেই আয়াতের শেষাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তারা তো আগুনের দিকে আহ্বান করে। কারণ কাফের পুরুষরা মুমিন নারীদেরকে কুফরের দিকে আহ্বান করে। আর কুফর হলো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। সুতরাং কাফেরের সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ হারামের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং বিবাহও হারাম হবে।[৬২]

আল্লামা ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহ আরেকটি বিপদের দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন,

> ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها. (المغني ٩٢١/٧، مسألة حرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم)
>
> কারণ কখনো স্বামীর মন স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে পড়লে স্বামী তার দ্বারা ফিতনার শিকার হবে। আবার এমনও হতে পারে যে, তাদের কোনো সন্তানের মায়ায় স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে পড়বে।[৬৩]

অমুসলিমের জবাই করা প্রাণীর গোশত খাওয়ার বিধান

জবাই হালাল হওয়ার জন্য জবাইকারী কোনো আসমানি ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক।

---

৬২. বাদায়েউস সানায়ে, ২/১৭১

৬৩. আল-মুগনি, ইবনে কুদামা, ৭/১৩০

তাই আহলে কিতাব ব্যতীত সবধরনের কাফের, মুরতাদ, কাদিয়ানি ইত্যাদির জবাই করা পশুর গোশত সর্বাবস্থায় হারাম। আর আহলে কিতাব ইহুদি-খ্রিষ্টানের জবাই মূলগতভাবে হালাল। তবে শর্ত হলো, তারা বাস্তবেই ইহুদি বা খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী হতে হবে এবং ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে জবাই করতে হবে।

তাই কেউ যদি কেবল জাতীয়তা বা আদমশুমারিতে খ্রিষ্টান বা ইহুদি গণ্য হয়, আর আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, নবীগণ ও আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি তাদের কিতাবমতে বিশ্বাস না রাখে, তাহলে সে মুলহিদ বলে বিবেচিত হবে; তার জবাই করা পশু হারাম। এমনইভাবে প্রকৃত কোনো আহলে কিতাব যদি স্বীয় ধর্ম অনুযায়ী জবাই না করে তাও হারাম।

বিদগ্ধ মহলের অভিজ্ঞতা হলো, বর্তমানে ইউরোপীয় দেশগুলোতে বসবাসরত মানুষ সাধারণত শুধু নামেই খ্রিষ্টান বা ইহুদি, তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং আল্লাহর উলুহিয়াতে বিশ্বাস করে না। পুনরুত্থান ও পরকালে বিশ্বাস করে না, তাই এই ধরনের লোকদের জবাই করা পশু এবং তাদের দেশগুলোর গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।[৬৪] তবে যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানা যায় যে, খ্রিষ্টান বা ইহুদিধর্মের প্রকৃত বিশ্বাসীরাই সেখানে জবাই করে এবং জবাই করার সময় তাদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি যত্নবান থাকে, তাহলে খাওয়া যেতে পারে।

ইমাম সারাখসি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৪৮৩ হি.) 'মাবসূত' কিতাবে লেখেন,

> ولا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبيحتهما لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} والمراد الذبائح، إذ لو حمل على ما هو سواها من الأطعمة لم يكن لتخصيص أهل الكتاب بالذكر معنى، ولأنهم يدعون التوحيد فيتحقق

---

৬৪. এই কথা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ২০১৬ সালের বিবিসি বাংলার একটি প্রতিবেদনই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল, 'ইংল্যান্ডে খ্রিষ্টানদের ছাড়িয়ে নাস্তিকরাই এখন সংখ্যাগুরু'। প্রতিবেদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে দিচ্ছি—

ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে নাস্তিকরাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে খ্রিষ্টানরা। সর্বশেষ জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে এ কথা জানিয়েছেন গবেষকরা। ২০১৪ সালের 'ব্রিটিশ সোশ্যাল অ্যাটিচিউড' জরিপের তথ্য অনুযায়ী ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে এখন নাস্তিক বা কোনো ধর্মের অনুসারী নন এমন মানুষ ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১১ সালের জরিপে এই সংখ্যা ছিল ২৫ শতাংশ। তখনও পর্যন্ত খ্রিষ্টানরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ।... সেন্ট মেরি'স ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির স্টিফেন বুলিভান্ট বলেন, ব্রিটেনে জনসংখ্যার অনুপাতে কোনো ধর্মের অনুসারী নন এমন মানুষের সংখ্যা স্পষ্টতই বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন, যারা জরিপে কোনো ধর্মের অনুসারী নন বলে নিজেদের চিহ্নিত করছেন, তাদের অনেকেই কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী হিসাবেই বেড়ে উঠেছেন। (আব্দুল্লাহ)

প্রতিবেদন লিংক :
https://www.bbc.com/bengali/news/2016/05/160524_atheists_outnumber_christians_in_england_and_wales

منهم تسمية الله تعالى على الخلوص إلا أن يسمعه المسلم يسمي عليه المسيح، فإذا سمع ذلك منه لم يحل أكله. (المبسوط ٦٤٢/١١، كتاب الصيد، صيد اليهودي والنصراني وذبيحتهما.)

(এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের শিকার ও তাদের গোশত খেতে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং আহলে কিতাবের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল।) তাদের খাদ্য দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের জবাই করা প্রাণী। কারণ যদি এর দ্বারা পশু ছাড়া অন্যান্য খাবারই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে আহলে কিতাবকে উল্লেখ করার বিশিষ্টতা বাকি থাকে না। আহলে কিতাবের জবাই বৈধ হওয়ার কারণ হলো তারা তাওহিদের দাবিদার, যার মাধ্যমে তাদের থেকে আল্লাহর নাম নেওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। তবে কোনো মুসলমান যদি জানতে পারে যে, মাসিহের নামে জবাই করা হয়েছে, তাহলে তা বৈধ নয়।[৬৫]

'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-তে রয়েছে,

المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى الذين يؤمنون بعقائدهم الأساسية، وإن كانوا يؤمنون بالعقائد الباطلة من التثليث والكفارة وغيرهما، أما من لا يؤمن بالله ولا برسول ولا بالكتب السماوية فهو من الماديين، وليس له حكم أهل الكتاب، وإن كان اسمه مسجلا كنصراني أو يهودي...إن النصارى اليوم خلعوا ربقة التكليف في قضية الذبح، وتركوا أحكام دينهم، فلا يلتزمون بالطرق المشروعة، فلا تحل ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لحم بعينه أنه ذكاه نصراني بالطريق المشروع، فلا يحل اللحم الذي يباع في أسواقهم ولا يعرف ذابحه.

আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইহুদি ও খ্রিষ্টান, যারা তাদের মৌলিক আকিদায় বিশ্বাসী, যদিও তারা তাদের ত্রিত্ববাদ, কাফফারা ইত্যাদি ভ্রান্ত আকিদা লালন করে। আর যে আল্লাহ, কোনো নবী ও আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, সে বস্তুবাদী। তার ওপর আহলে কিতাবের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। যদিও সে একজন খ্রিষ্টান বা ইহুদি হিসাবে নিবন্ধিত হয়... বর্তমানে খ্রিষ্টানরা পশু জবাইয়ে ধর্ম মান্য করার দায়িত্ববোধ নিজেদের কাঁধ থেকে সরিয়ে নিয়েছে। তারা তাদের ধর্মীয় বিধিনিষেধের কোনো পরোয়া করে না। তাই তাদের জবাই করা পশু হালাল নয়, তবে যদি কোনো নির্দিষ্ট গোশত সম্পর্কে জানা যায় যে সেটি বৈধ পদ্ধতিতে প্রকৃত খ্রিষ্টান দ্বারা জবাই করা হয়েছে, তাহলে তা বৈধ। সুতরাং তাদের বাজারে বিক্রি করা গোশত, যেগুলোর জবাইকারী সম্পর্কে জানা না যায়, সেগুলো বৈধ নয়।[৬৬]

---

৬৫. আল-মাবসুত, সারাখসি, ১১/২৪৬

৬৬. মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি, ভলিউম ২, পৃ. ১৯৭৩১

আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য কারা

ইসলামে কিছু বিষয়ে সাধারণ কাফের ও আহলে কিতাবদের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে। যেমন, আহলে কিতাবদের জবাই করা গোশত খাওয়া ও আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করা বৈধ। কিন্তু সাধারণ কাফেরদের জবাই করা গোশত হালাল নয় আর তাদের নারীদের বিবাহ করা বৈধ নয়। তাহলে প্রশ্ন হলো কুরআনে বর্ণিত 'আহলে কিতাব' দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? এই বিষয়ে আমাদের হানাফি উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

ক. কিছু ফকিহের মত হলো, কুরআনে বর্ণিত 'আহলে কিতাব' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, যা সকল আসমানি কিতাবের ধারকদের বোঝায়। তাই যারাই কোনো আসমানি ধর্মের অনুসারী এবং তাদের কাছে আসমানি কিতাব রয়েছে, তারাই 'আহলে কিতাব' হিসাবে গণ্য হবে। এই মতানুযায়ী 'আহলে কিতাব' শব্দটি শুধুই ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাথেই বিশেষায়িত নয়। বরং যে সম্প্রদায়ের কাছেই কোনো আসমানি কিতাব রয়েছে, যেমন জাবুর কিতাবের অনুসারী, হজরত ইবরাহিম আ.-এর ওপর অবতীর্ণ হওয়া কিতাবের অনুসারী, তারা সবাই আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর অন্য সাধারণ কাফেরদের থেকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের যে-সকল বিধানে ভিন্নতা রয়েছে, এদের ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য হবে।

আল্লামা যাইলায়ি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৪৩ হি.) বলেন,

> ثم كل من يعتقد دينا سماويا، وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود عليهم السلام فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم خلافا للشافعي فيما عدا اليهود والنصارى والحجة عليه ما تلونا. (تبيين الحقائق ١١٠/٢، كتاب النكاح، فصل في المحرمات)

সুতরাং যারাই কোনো আসমানি ধর্মের অনুসারী এবং তাদের কাছে আসমানি ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, যেমন হজরত ইবরাহিম ও শিশ আ.-এর সহিফাসমূহ, হজরত দাউদ আ.-এর জাবুর, তারাই আহলে কিতাব বলে গণ্য হবে এবং তাদের জবাই করা গোশত খাওয়া যাবে ও তাদের নারীদের বিবাহ করা জায়েয হবে।[৬৭]

ইবনে আবেদিন শামি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১২৫২ হি.) লেখেন,

> والكتابي من يعتقد دينا سماويا أي منزلا بكتاب كاليهود والنصارى. (رد المحتار، كتاب الجهاد، فصل في الجزية)
>
> আহলে কিতাব হলো যারা কোনো আসমানি ধর্মে বিশ্বাস করে এবং আসমানি কোনো কিতাবও রয়েছে। যেমন ইহুদি ও খ্রিষ্টান।[৬৮]

---

৬৭. তাবয়িনুল হাকায়েক, ২/১১০

৬৮. ফাতাওয়ায়ে শামি, ৪/১৯৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য, শামি রহিমাহুল্লাহ এখানে ইহুদি ও খ্রিষ্টানকে উদাহরণ হিসাবে এনেছেন, এই দুই প্রকারেই আহলে কিতাব সীমাবদ্ধ এমনটা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

খ. আরেকদল ফকিহদের মত হলো, আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুই ইহুদি ও খ্রিষ্টান। অন্যান্য আসমানি ধর্মের বিশ্বাসী ও প্রবক্তারা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে নিজেদের পক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করেন,

> وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلۡكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيۡنِ مِن قَبۡلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمۡ لَغَٰفِلِينَ.
>
> আর এটি এমন কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, যা বরকতময়। অতএব এর অনুসরণ করো এবং (আল্লাহকে) ভয় করতে থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি মেহেরবানি করা হয়; (তা এজন্য অবতরণ করেছি), যাতে তোমরা এ কথা না বলো যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্ববর্তী দুটি সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আর আমরা তাদের পঠনপাঠন সম্পর্কে বেখবরই ছিলাম।[৬৯]

ইমাম মাতুরিদি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতকে দলিল হিসাবে এভাবে পেশ করেন, আয়াতের মাঝে কাফেরদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে না, বরং আলোচনার প্রেক্ষিতে সকল কাফেরকে এটা শুনিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, এখন তোমাদের সামনে যে কুরআন রয়েছে, সত্যনিষ্ঠ হয়ে তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করো, যাতে কেয়ামতের দিন এই অজুহাত পেশ না করতে হয়, আসমানি কিতাব তো আমাদের পূর্বের দুই দল তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের দেওয়া হয়েছে, আমরা তো তা থেকে বঞ্চিত ছিলাম। (তাই আমাদের অপারগ মনে করে আজাব থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত।)

আর ইমাম কুদিরি রহিমাহুল্লাহ এভাবে দলিল পেশ করেন, (যদি ধরেও নিই) আয়াতে কাফেরদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু কুরআন যেহেতু কাফেরদের এই দাবিকে খণ্ডন করেনি, তাই এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আহলে কিতাব শুধুই দুটি দল—ইহুদি ও খ্রিষ্টান।

ইমাম মাতুরিদি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩৩৩ হি.) লেখেন,

> فالمجوسية ليست عندنا من أهل الكتاب؛ والدليل على ذلك قول الله تعالى : (وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا) فأخبر الله تعالى أن أهل الكتاب طائفتان؛ فلا يجوز أن يجعلوا ثلاث طوائف، وذلك خلاف ما دل عليه القرآن. (تفسير الماتريدي ٣/٣٦٤، تحت سورة المائدة : ٥)

---

৬৯. সুরা আনআম : ১৫৬

অগ্নিপূজকরা আমাদের নিকট আহলে কিতাব নয়। তার দলিল হলো আল্লাহ তাআলার এই ইরশাদ,

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا.

এই আয়াতে আল্লাহ এই সংবাদ দিচ্ছেন যে, আহলে কিতাব হলো দুটি দল। তাই আহলে কিতাবকে তিন দল বানানো সঠিক হবে না। অন্যথায় কুরআন যে বিষয়ের ওপর নির্দেশ করছে (আহলে কিতাব দুটিই দল), তার বিপরীত হয়ে যাবে।[৭০]

ইমাম কুদুরি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৪২৮ হি.) উল্লেখ করেন,

لنا : قوله تعالى : {إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين}. ولم يرد سبحانه ذلك عليهم، ولو كانوا كاذبين لرد كذبهم؛ لأنه تعالى لا يحكي عنهم الكذب ويترك إنكاره. (التجريد ٦٢٤٠/١٢، كتاب الجزية، مسألة : المجوس لا كتاب له.)

আমাদের দলিল হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَـٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـٰفِلِينَ.

আল্লাহ তাআলা এখানে কাফেরদের বক্তব্য খণ্ডন করেননি, যদি কাফেরদের এই বক্তব্য মিথ্যা হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তা খণ্ডন করতেন। কেননা আল্লাহ তাআলা কোনো মিথ্যা বর্ণনা করে তা খণ্ডন না করে রেখে দেন না।[৭১]

উপরিউক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো, আহলে কিতাব দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এই বিষয়ে হানাফি আলেমদের দুধরনের মত পাওয়া যায়। তবে এই মতানৈক্যের আপাত কোনো ফলাফল নেই। কেননা, বর্তমান সময়ে তাওরাত ও ইনজিলের অনুসারী ছাড়া আর অন্য কোনো আসমানি কিতাবের অনুসারী বা তার দাবিদারের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। আর যদি থাকেও, তাহলে আমরা জানি না।

যাইহোক, এতটুকুতে তো সবাই একমত, আহলে কিতাব হওয়ার জন্য আসমানি কিতাবের অনুসারী হতে হবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা জামাত যদি কোনো আসমানি কিতাবে বিশ্বাসীই না হয়, বা আসমানি কিতাবের অনুসারী দাবি করে, কিন্তু সে কিতাব যে আসমানি তার পক্ষে ইসলামি জ্ঞানভান্ডারে কোনো প্রমাণ নেই, তাহলে এরা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এ থেকে বোঝা গেল, কাদিয়ানি ও যে-সকল শিয়া কুফরি আকিদা লালন করে,

---

৭০. তাফসিরে মাতুরিদি, ৩/৪৬৩

৭১. আত-তাজরিদ, ১২/৬২৪০

তাদের আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করা ও তাদের ওপর আহলে কিতাবের বিধান প্রয়োগ করা ভুল।[৭২]

এ থেকে বোঝা গেল যে, কাদিয়ানিরা মোটেও আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের ওপর আহলে কিতাবের বিধিবিধান জারি করা একেবারেই ভুল। কেননা, তারা যে ওহির ওপর ঈমান আনে তা কোনো ধর্ম অনুযায়ীই আসমানি ওহি নয়। এমনইভাবে যে-সকল শিয়া কুফরি আকিদা লালন করে, তারাও কোনোভাবেই আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি কথার কথা হিসাবে মেনেও নেওয়া হয় যে, তারা কুরআন সঠিক হওয়ার বিশ্বাস রাখে, তবু আকিদাগত দিক থেকে যেহেতু কিছু কুফর লালন করে, এই হিসাবে তারা জিন্দিক বলে গণ্য হবে, আহলে কিতাব বলে গণ্য হবে না। কেননা, পারিভাষিক অর্থে আহলে কিতাব হওয়ার জন্য কুরআনে কারিম ব্যতীত অন্য কোনো আসমানি কিতাবের ওপর ঈমান রাখা আবশ্যক। যেহেতু তারা কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের দাবি রাখে, এজন্য তারা হয়তো মুসলমান হবে এবং তাদের ওপরে মুসলমানদের বিধিবিধান জারি হবে, অথবা (নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করার পরেও কুফরি আকিদা লালন করার কারণে) জিন্দিক কাফের বলে গণ্য হবে। এমনইভাবে হিন্দুদেরকেও আহলে কিতাব বলে সাব্যস্ত করা পুরোপুরি ভুল।

ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত অঞ্চলে অন্যধর্মের প্রচার-প্রসার করা

যে-সকল কাফের ইসলামি আইনকানুন মেনে ইসলামি ভূখণ্ডে বসবাস করে, তাদেরকে জিম্মি বলা হয়। তাদের জানমাল ও ইজ্জত-সম্মান মুসলমানদের মতো রক্ষিত ও নিরাপদ। এ ছাড়াও আরও বেশ কিছু বিধানে মুসলমান ও জিম্মির বিধান সমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও জিম্মিদের এই অনুমতি নেই যে, তারা ইসলামি ভূখণ্ডে নিজেদের ধর্মমত প্রচার করবে। বরং তাদের সকল ধর্মীয় কাজ তাদের নিজেদের লোকদের মাঝে ও উপাসনালয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকা জরুরি। ধর্মমত প্রচারের যত মাধ্যম হতে পারে, সকল বিষয়েই এই বিধান প্রযোজ্য। এমনকি মুসলমানদের কোনো সভায় তাদের ধর্মীয় কোনো প্রতীক প্রকাশ করাও নিষিদ্ধ। ইসলামি ভূখণ্ডের শাসকদেরও এই বিষয়ে অনুমতি দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। এ থেকে এই বিধানও স্পষ্ট হয় যে,মুসলিম নামধারী কোনো দল বা ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট কোনো কুফরী বিশ্বাস লালন করে তাহলে তারা সেগুলোর প্রচার করতে পারবে না এবং এই শিরোনামে কোনো প্রতিষ্ঠান বা উপাসনালয়ও তৈরি করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

তার একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইনই কার্যকর ও বিজয়ী থাকবে। তাই কুফরি মতবাদ বা ধর্মের প্রচারের অনুমতি দেওয়া বা প্রচারের বিষয়টি জানতে পেরেও তা এড়িয়ে যাওয়া মূলত এই উদ্দেশ্যের সাথে স্পষ্ট বিদ্রোহের

---

৭২. অর্থাৎ কাদিয়ানি ধর্মে বিশ্বাসীদের জবাই করা গোশত খাওয়া বা তাদের নারীদের বিবাহ করা স্পষ্টই হারাম। তেমনইভাবে কুফরি আকিদায় বিশ্বাসী শিয়াদের জবাই করা গোশত খাওয়া ও তাদের নারীদের বিবাহ করা অবৈধ। (আব্দুল্লাহ)

শামিল। তেমনই যে-সকল কাজ ও চিন্তা জিম্মিদের ধর্মমত অনুযায়ীও ভুল ও ভ্রান্ত, সেগুলোর প্রচার ও প্রকাশ থেকেও ইসলামি ভূখণ্ডে নিষেধ করা হবে।

'বাদায়েয়ুস সানায়ে' গ্রন্থে রয়েছে,

ولا يمكنون من إظهار صليبهم في عيدهم؛ لأنه إظهار شعائر الكفر، فلا يمكنون من ذلك في أمصار المسلمين، ولو فعلوا ذلك في كنائسهم لا يتعرض لهم وكذا لو ضربوا الناقوس في جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض لذلك؛ لأن إظهار الشعائر لم يتحقق، فإن ضربوا به خارجا منها لم يمكنوا منه لما فيه من إظهار الشعائر... وإنما يكره ذلك في أمصار المسلمين، وهي التي يقام فيها الجمع والأعياد والحدود؛ لأن المنع من إظهار هذه الأشياء؛ لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام، فيختص المنع بالمكان المعد لإظهار الشعائر وهو المصر الجامع.

(وأما) إظهار فسق يعتقدون حرمته كالزنا وسائر الفواحش التي هي حرام في دينهم، فإنهم يمنعون من ذلك سواء كانوا في أمصار المسلمين، أو في أمصارهم ومدائنهم وقراهم. (بدائع الصنائع ٤١١/٧، كتاب السير، فصل في بيان حكم الغنائم وما يتصل به، ط. دار الكتب العلمية)

খ্রিষ্টানদেরকে তাদের ঈদ উৎসবের দিন ক্রুশ প্রকাশ্যে বের করার সুযোগ দেওয়া হবে না। কেননা এতে কুফরি প্রতীকের প্রকাশ হয়। ফলে মুসলমানদের শহরে তারা তা করতে পারবে না। যদি তারা তা নিজেদের পুরাতন গির্জার মধ্যে করে, তাহলে বাধা দেওয়া হবে না। কেননা এতে কুফরি প্রতীকের প্রকাশ হয় না। যদি গির্জার বাহিরে করে, তাহলে তা করতে পারবে না, কেননা এতে কুফরি প্রতীক প্রকাশ হয়। এ ধরনের বিষয়গুলো শুধু মুসলিমদের শহরগুলোতেই নিষিদ্ধ। আর মুসলিমদের শহর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেখানে জুমা, ঈদ এবং হদ (শরিয়তনির্ধারিত দণ্ডবিধি) কায়েম করা হয়। আর এই সকল জিনিস প্রকাশ্যে করা থেকে নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হলো, এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতীকগুলো প্রকাশ পাওয়ার স্থানে কুফরের প্রতীকগুলো প্রকাশ করা হয়। এতে কুফরি প্রতীক ও ইসলামের প্রতীক একই স্থানে প্রকাশ হওয়া আবশ্যক হয়। তাই নিষেধাজ্ঞা শুধু সে সকল স্থানের সাথেই থাকবে, যা ইসলামের প্রতীক প্রকাশের স্থান আর তা হলো শহর।

আর যে-সকল গোনাহের কাজ জিম্মিদের ধর্মমত অনুযায়ীও হারাম, যেমন জিনা ও ওই সকল বেহায়া এবং নির্লজ্জ কাজসমূহ, যেগুলো তাদের ধর্মেও হারাম, সেগুলোও প্রকাশ্যে করা থেকে বিরত রাখা হবে। চাই তা

মুসলমানদের শহরে হোক বা তাদের শহরে বা গ্রামে হোক।[৭৩]

ইসলামি ভূখণ্ডে অমুসলিমদের উপাসনালয় তৈরির বিধান

ইসলামি ভূখণ্ডে অমুসলিমদের ইবাদতখানা, মন্দির, গির্জা ইত্যাদি তৈরি করা জায়েয নেই। চাই তারা ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, অথবা যেকোনো ধরনের কাফেরই হোক না কেন।[৭৪] কেননা, এই সকল ইবাদতখানায় আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়, ইসলামি দৃষ্টিতে এগুলো উপাসনালয় বলারও উপযুক্ততা রাখে না। ইসলামি শাসনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য যেহেতু মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষার সর্বাত্মক ব্যবস্থা করা এবং যেখানেই ঈমানের ওপর কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সেগুলোকে সম্ভাব্য সকল উত্তম পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে দূর করার ব্যবস্থা করা; সাথে অমুসলিম জিম্মিরা যেন মুসলমান ও ইসলামি অনুপম শিক্ষাকে সঠিকভাবে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পায় এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম ও মুসলমানকে বুঝতে পারে সেটা নিশ্চিত করা; এইজন্য ইসলামের শিয়ারগুলোকে বিজয়ী রাখা অত্যন্ত জরুরি। ইসলামি প্রতীকগুলোর সাথে কুফর ও শিরকের কেন্দ্রগুলোকে রাখার কোনো নৈতিক কারণ নেই। তাই ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠিত ভূখণ্ডে অমুসলিমদের উপাসনালয় তৈরির বিষয়টি কিছু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

ক. জাযিরাতুল আরবের[৭৫] মাঝে কোনো অমুসলিমের বসবাস করারই অধিকার নেই। তাই সেখানে তাদের উপাসনালয় তৈরির প্রশ্নই আসে না।

খ. জাযিরাতুল আরবের বাহিরে অন্যান্য ইসলামি ভূখণ্ডে অমুসলিমদের নতুন কোনো উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করা জায়েয নয়। হ্যাঁ, যদি কোনো পুরাতন উপাসনালয় থাকে, উদাহরণত, কোনো কুফরি ভূখণ্ড মুসলমানরা বিজয় করে নেয় আর সেখানে পূর্ব থেকেই অমুসলিমদের উপাসনালয় থেকে থাকে, এখন ইসলামি শাসনের অধীনে আসার পর জিম্মিদের বসতি সেখানে বেশি থাকে, তাহলে পুরাতন সে উপাসনালয়সমূহ মেরামত করা যাবে।

গ. উপরিউক্ত বিধান শহর ও গ্রাম সবখানেই প্রযোজ্য হবে। কিছু কিতাবে ইমাম আবু

---

৭৩. বাদায়েউস সানায়ে, ৭/১১৩

৭৪. যেমন কাদিয়ানি বা গোঁড়া রাফেজিদের মসজিদের নামে নিজেদের ইবাদতখানা, বাহায়ি বা হিজবুত তাওহিদের কোনো ধর্মশালা ইত্যাদি। (আব্দুল্লাহ)

৭৫. জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপের সীমানা বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের একটি বৃহৎ অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত।
উত্তরে : ইরাক এবং জর্ডান।
উত্তর-পূর্বে : কুয়েত।
পূর্বে : কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন (যা সউদি আরবের সাথে কিং ফাহদ সেতু দ্বারা সংযুক্ত)।
দক্ষিণে : ইয়েমেন।
দক্ষিণ-পূর্বে : ওমান।
পশ্চিমে : লোহিত সাগর। (আব্দুল্লাহ)

হানিফা রহিমাহুল্লাহ থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, গ্রামে যদি জিম্মিরা নতুন কোনো উপাসনালয় তৈরি করতে চায়, তাহলে সে সুযোগ রয়েছে। কিন্তু অসংখ্য দলিলের বিপরীত হওয়ার কারণে এই বক্তব্যটিকে ফকিহগণ দুর্বল ও অপ্রাধান্যযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন। আর যে-সকল ফকিহ এই বক্তব্যটিকে ইমাম আবু হানিফা থেকে প্রমাণিত মনে করেছেন, তারা এর একটি উপযোগী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, গ্রাম দ্বারা শুধুই জিম্মি বসবাস করে এমন গ্রাম উদ্দেশ্য, যেখানে ইসলামের প্রতীক বিজয়ী নয়। যাইহোক, এই বর্ণনা দিয়ে মুসলমানদের সাধারণ শহরে বা গ্রামে অমুসলিমদের উপাসনালয় তৈরির বিষয়ে দলিল পেশ করা সঠিক হবে না।

ঘ. যে-সকল জায়গায় উপাসনালয় মেরামতের অনুমতি রয়েছে সেখানে উদ্দেশ্য হলো, কাফেররা যদি নিজেদের ইবাদতখানা মেরামত করাতে চায়, তাহলে সে সুযোগ রয়েছে। মুসলিম শাসক তা থেকে তাদের বাধা দেবে না। কিন্তু ইসলামি শাসকের সেগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া বা সে কাজে সহযোগিতা করা জায়েয হবে না।

'তাবয়িনুল হাকায়েক' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

> قال رحمه الله (ولا تحدث بيعة ولا كنيسة في دارنا) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» ... والمراد بالنهي عن الكنيسة إحداثها، أي لا تحدث في دار الإسلام كنيسة في موضع لم تكن فيه وبيت النار كالكنيسة...
>
> قال رحمه الله (ويعاد المنهدم من الكنائس والبيع القديمة) لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بترك الكنائس في أمصار المسلمين، ولا يقوم البناء دائما، فكان دليلا على جواز الإعادة، ولأن الإمام لما أقرهم عهد إليهم الإعادة، لأن الأبنية لا تبقى دائما، ولا يمكنون من نقلها إلى موضع آخر، لأنه إحداث في ذلك الموضع في الحقيقة، والصومعة بمنزلة الكنيسة، لأنها تبنى للتخلي للعبادة كالكنيسة، بخلاف موضع الصلاة في البيت، لأنه تبع للسكنى، وهذا في الأمصار دون القرى، لأن الأمصار هي التي تقام فيها شعائر الإسلام، فلا يعارض بإظهار ما يخالفها، ولهذا يمنعون من بيع الخمر والخنازير وضرب الناقوس خارج الكنيسة في الأمصار لما قلنا، ولا يمنعون من ذلك في قرية لا تقام فيها الجمع والحدود، وإن كان فيها عدد كثير لأن شعائر الإسلام فيها غير ظاهرة، وقيل : يمنعون في كل موضع لم تشع فيه شعائرهم، لأن في القرى بعض الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها من شعائر الكفر، والمروي عن أبي حنيفة، كان في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة، وفي أرض العرب يمنعون من ذلك كله ولا يدخلون فيها الخمر

والخنازير، ويمنعون من اتخاذها المشركون مسكنا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنه عليه الصلاة والسلام قال في مرضه الذي مات فيه : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» رواه أحمد والبخاري ومسلم، وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال «لا يترك بجزيرة العرب دينان». وعن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» رواهما أحمد، وأجلى عمر اليهود والنصارى من أرض الحجاز فيما رواه البخاري. (تبيين الحقائق ٣/٩٧٢، كتاب السير، باب العشر و ا لخراج، فصل في الجزية)

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের উপাসনালয় আমাদের ভূখণ্ডে (দারুল ইসলামে) নতুন তৈরি করতে দেওয়া হবে না। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ইসলামে পুরুষের জন্য অণ্ডকোষ কর্তন করা এবং (ইসলামের ভূমিতে) গির্জা তৈরি করা বৈধ নয়।' গির্জা তৈরির নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'নতুন তৈরি করা যাবে না।' অর্থাৎ ইসলামি ভূখণ্ডে পূর্বে ছিল না এমন কোনো স্থানে নতুন গির্জা তৈরি করা যাবে না। অগ্নিপূজকদের উপাসনালয়ের হুকুমও গির্জার মতোই। যে পুরাতন গির্জাগুলো ভেঙে যাবে, সেগুলোকে মেরামত ও নতুন করে তৈরি করা যাবে। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আজ পর্যন্ত এটাই মুসলমানদের কর্মপন্থা ছিল, পুরাতন গির্জাগুলোকে তারা অক্ষত রেখেছেন। যেহেতু ভবন সর্বদা ঠিক থাকে না (তাতে নির্মাণজনিত বিভিন্ন ত্রুটি তৈরি হয়), তাই এটা এ কথার দলিল যে, গির্জার ভবন পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করতে দেওয়া হবে। কেননা যখন মুসলিম শাসক গির্জাগুলোকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন, এর অর্থ তিনি এই অনুমতিও দিয়েছেন যে এগুলোর পুনর্নির্মাণ করা যাবে।[৭৬]

---

৭৬. পুরাতন গির্জা পুনর্নির্মাণের বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য।

এক. পুরাতন গির্জা যদি কোনো দুর্যোগে ভেঙে যায় বা পুরাতন হয়ে তার অবকাঠামো ধসে পড়ে, তাহলে তার পুনর্নির্মাণ করা যাবে। কিন্তু যদি মুসলিম শাসক তা কোনো কারণে ভেঙে ফেলে বা বন্ধ করে দেয়, তাহলে সেটা পুনর্নির্মাণ করা জায়েয নেই। কেউ যদি এমনটা করে তাহলে সে মুসলিম শাসককে ছোট করল, ইসলামের বদলে কুফরকে সাহায্য করল। তাই তাকে এর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। শামি রহিমাহুল্লাহ লেখেন,

(قوله أشباه) حيث قال في فائدة نقل السبكي الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه لا يجوز إعادتها ذكره السيوطي في حسن المحاضرة. قلت : يستنبط منه أنها إذا قفلت، لا تفتح ولو بغير وجه كما وقع ذلك في عصرنا بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة قفلها الشيخ محمد بن إلياس قاضي القضاة، فلم تفتح إلى الآن حتى ورد الأمر السلطاني بفتحها فلم يتجاسر حاكم على فتحها، ولا

তবে গির্জা এক স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যাবে না। কেননা তা মূলত নতুন নির্মাণের অন্তর্ভুক্ত। (আর ইসলামি ভূখণ্ডে নতুন গির্জা নির্মাণ জায়েয নেই।) পাদরির আশ্রম বা মঠ গির্জার হুকুমে। কেননা সেগুলো মূলত গির্জার মতোই উপাসনার জন্য তৈরি করা হয়। তবে ঘরের কোণে ব্যক্তিগত উপাসনালয়ের জন্য নির্ধারিত স্থানের হুকুম ভিন্ন। কেননা তা মূলত ঘরেরই অনুগামী হয়। (তাই অমুসলিমরা যেমন নিজেদের জন্য নতুন ঘর তৈরি করতে পারবে, তেমনই ঘরের সাথে ব্যক্তিগত উপাসনালয়ও তৈরি করতে পারবে)। ...ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ থেকে গ্রামে উপাসনালয় তৈরির যে বক্তব্যটি বলা হয়, তা হলো কুফার ওই গ্রামের বিষয়ে, যেখানে অধিকাংশ অধিবাসী জিম্মি।

জাযিরাতুল আরবের মাঝে ওপরের সবকিছু থেকেই নিষেধ করা হবে, কাফেররা সেখানে মদ বা শূকর নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। মুশরিকরা সেখানে বসবাসের জন্য থাকতে পারবে না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যশয্যায় থাকাকালে বলেছেন, 'মুশরিকদের আরবের ভূখণ্ড থেকে বের করে দাও।' ইমাম আহমাদ, বুখারি ও মুসলিম রহিমাহুল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত উমর রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'অবশ্যই আমি পুরো আরবের ভূখণ্ড থেকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানকে বের করে দেবো। শুধু মুসলমানদেরকেই এখানে (অধিবাসী হিসাবে) রাখব।' হাদিসটি ইমাম আহমাদ, মুসলিম ও তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ অসিয়ত এটা ছিল যে, 'আরবের ভূখণ্ডে দুই ধর্মকে রাখা যাবে না।' হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ যে কথাটি বলেছেন তা হলো, 'মদিনা ও নাজরানের ইহুদিদের আরব থেকে বের করে দাও।' শেষোক্ত দুটি

ينافي ما نقله السبكي قول أصحابنا يعاد المنهدم لأن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما تهدم فليتأمل.
اهـ قال الخير الرملي في حواشي البحر أقول : كلام السبكي عام فيما هدمه الإمام وغيره في كلام الأشباه يخص الأول. والذي يظهر ترجيحه العموم لأن العلة فيما يظهر أن في إعادتها بعد هدم المسلمين استحفافا بهم، وبالإسلام وإخمادا لهم وكسرا لشوكتهم، ونصرا للكفر وأهله غاية الأمر أن فيه افتياتا على الإمام فيلزم فاعله التعزير. (رد المحتار، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، مطلب إذا هدمت الكنيسة ولو بغير وجه لا تجوز إعادتها)

দুই. পুরাতন গির্জা পুনর্নির্মাণের সময় ঠিক ততটুকুই নির্মাণ করতে পারবে, যা পূর্বে ছিল। পূর্বের অবকাঠামো থেকে বাড়ানো যাবে না, বা আরও জাঁকজমক করে করা যাবে না। আল্লাম শিলবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১০২১ হি.) লেখেন,

وقوله القديمة أي على قدر البناء الأول ويمنع من الزيادة على البناء الأول. (تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي، كتاب السير، باب العشر و الخراج، فصل في الجزية)

'পুরাতন উপাসনালয় তৈরিতে বাধা দেওয়া হবে না' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রথম অবকাঠামোর যে পরিমাণ ছিল তা। প্রথম অবকাঠামো থেকে বড় করে নির্মাণে বাধা দেওয়া হবে। (আব্দুল্লাহ)

হাদিস ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। সহিহ বুখারির বর্ণনানুযায়ী হজরত উমর রা. তার শাসনামলে আরব থেকে সকল ইহুদি ও খ্রিষ্টানকে বের করে দিয়েছেন।[৭৭]

'আদ-দুররুল মুখতার' গ্রন্থে রয়েছে,

(ولا) يجوز أن (يحدث بيعة، ولا كنيسة ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا مقبرة) ولا صنما حاوي (في دار الإسلام) ولو قرية في المختار فتح. (ويعاد المنهدم) أي لا ما هدمه الإمام، بل ما انهدم أشباه في آخر الدعاء برفع الطاعون.

দারুল ইসলামে ইহুদিদের উপাসনালয়, গির্জা, পাদরিদের মঠ, অগ্নিপূজকদের উপাসনালয়, অমুসলিমদের কবরস্থান এবং মূর্তি বানানো জায়েয নেই। অগ্রাধিকারযোগ্য বক্তব্য হলো, শহরের মতো গ্রামেও এগুলো করা যাবে না। পুরাতন উপাসনালয় যেগুলো ভেঙে গেছে, সেগুলোর নবনির্মাণ করা যাবে। অর্থাৎ, যেগুলো দুর্যোগে নিজে থেকেই ভেঙে গেছে। মুসলিম শাসক যেগুলো ভেঙেছে সেগুলোর পুনর্নির্মাণ করা যাবে না।

শামি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১২৫৮ হি.) এই কথার ব্যাখ্যায় লেখেন,

مطلب لا يجوز إحداث كنيسة في القرى ومن أفتى بالجواز فهو مخطئ ويحجر عليه (قوله ولو قرية في المختار) نقل تصحيحه في الفتح عن شرح شمس الأئمة السرخسي في الإجارات ثم قال : إنه المختار، وفي الوهبانية إنه الصحيح من المذهب الذي عليه المحققون إلى أن قال : فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زمامنا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخذ عامة المشايخ ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا، ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه، ويحجر عليه في الفتوى ويمنع لأن ذلك منه مجرد إتباع هوى النفس وهو حرام لأنه ليس له قوة الترجيح، لو كان الكلام مطلقا فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى فتنبه لذلك، والله الموفق. مطلب تهدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكناها قال في النهر : والخلاف في غير جزيرة العرب، أما هي فيمنعون من قراها أيضا لخبر «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . اهـ قلت : الكلام في الإحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة ولو قديمة فضلا عن إحداثها لأنهم لا يمكنون من السكنى بها للحديث المذكور كما يأتي وقد بسطه في الفتح وشرح السير الكبير وتقدم تحديد جزيرة العرب أول الباب المار. (رد المحتار، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، مطلب في أحكام الكنائس)

'গ্রহণযোগ্য মত হলো গ্রাম হলেও করা যাবে না', 'ফাতহুল কাদির' গ্রন্থে

৭৭. তাবয়িনুল হাকায়েক ৩/২৭৯

ইমাম সারাখসির উদ্ধৃতিতে এই মতটির বিশুদ্ধতা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর ইবনুল হুমাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটাই গ্রহণযোগ্য মত। 'ওয়াহবানিয়্যাহ' গ্রন্থে রয়েছে, এটাই হলো সঠিক মাজহাব। মুহাক্কিকগণ এই মতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। তিনি তো এটাও বলেছেন যে, অধিকাংশ আলেম এই মতটিই গ্রহণ করেছেন এবং একেই বিশুদ্ধ মাজহাব বলে উল্লেখ করেছেন, এরপর আর বর্তমান সময়ের কোনো আলেমের জন্য দারুল ইসলামের গ্রামগুলোতে নতুন করে অমুসলিমদের উপাসনালয় বানানো জায়েজের ফাতাওয়া দেওয়া বৈধ হবে না। কেউ যদি এখন এর বিপরীত মতের ফাতাওয়া দেয়, তাহলে তার ওপর আমল করা বা তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করার সুযোগ নেই। যে এমন ফাতাওয়া দেবে তার ফাতাওয়ার ওপর আমল করা বৈধ হবে না এবং এমন ব্যক্তিকে ফাতাওয়া দেওয়ার কাজ থেকে বিরত রাখা হবে। কেননা সে শুধু প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে এমন ফাতাওয়া দিয়ে থাকবে। আর প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে ফতোয়া দেওয়া হারাম। কারণ, যদি প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া স্বাভাবিকভাবেই এই মতটি উল্লেখ করা হতো, তবুও এমন ব্যক্তির তারজিহ দেওয়ার মতো যোগ্যতা নেই। তাহলে ফুকাহায়ে কেরামের স্পষ্ট তারজিহ ও ফতোয়া থাকার পরেও তার ফতোয়া কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? সুতরাং, এ ব্যাপারটিতে সতর্ক থাকো। আর আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা...

'আন-নাহরুল ফায়েক' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এই ইখতেলাফ আরবের ভূমির ক্ষেত্রে নয়। সেখানে গ্রামেও গির্জা বানানো জায়েয নেই। হাদিসে উল্লেখ আছে, দুই ধর্ম আরবের ভূমিতে একসাথে হতে পারবে না। শামি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ওপরে যে ইখতেলাফ তা মূলত নতুন গির্জা বানানোর ক্ষেত্রে। আর আরবের ভূমিতে তো গির্জা ইত্যাদি অক্ষত রাখাই জায়েয নেই, চাই তা পুরাতনই হোক কেন, তাহলে সেখানে নতুন গির্জা তৈরির তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা পূর্বে হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে যে, কাফেররা আরবের ভূমিতে থাকতে পারবে না।[৭৮]

ইমাম শামি রহিমাহুল্লাহ অপর এক জায়গায় লেখেন,

ذكر الشرنبلالي في رسالة في أحكام الكنائس عن الإمام السبكي أن معنى قولهم لا نمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به بل بمعنى نتركهم وما يدينون فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه ولا نقول : إن ذلك جائز لهم، فلا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك ولا أن يعينهم عليه، ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه، ولا يخفى

৭৮. ফাতাওয়ায়ে শামি ৪/২০২

ظهوره وموافقته لقواعدنا. (رد المحتار، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، مطلب في أحكام الكنائس)

ইমাম শুরুনবুলালি রহিমাহুল্লাহ অমুসলিমদের উপাসনালয়ের বিধানসংক্রান্ত যে পুস্তিকা রচনা করেছেন তাতে সুবকি রহিমাহুল্লাহ থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন, 'পুরাতন গির্জা নতুন করে নির্মাণে নিষেধ করা হবে না'— এটার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এই কাজটি একটি জায়েয কাজ, যার আদেশ আমরা তাদের করব। এটার উদ্দেশ্য হলো, আমরা তাদেরকে তাদের ধর্মমত অনুযায়ী চলতে ছেড়ে দিচ্ছি। মদ ইত্যাদি খাওয়ার মতোই এটাও একটি গোনাহের কাজ। আমরা এটা বলব না যে, এগুলো তাদের জন্য জায়েয ও নৈতিক। সুতরাং কোনো মুসলিম শাসক বা বিচারপতির জন্য অমুসলিমদের পুরাতন গির্জা পুনর্নির্মাণের আদেশ করা এবং তাতে সহযোগিতা করা জায়েয হবে না। কোনো মুসলমানের জন্য সেখানে কাজ করা জায়েয হবে না। আর এটা একদমই স্পষ্ট বিষয়, যাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। আর ইমাম সুবকির এই বক্তব্য আমাদের মাজহাবের মূলনীতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৭৯]

ইমাম মাওয়ারদি রহিমাহুল্লাহ ইসলামি শাসননীতি সংক্রান্ত 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ' গ্রন্থে লেখেন,

ولا يجوز أن يحدثوا في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة، فإن أحدثوها هدمت عليهم، ويجوز أن يبنوا ما استهدم من بيعهم وكنائسهم العتيقة. (الأحكام السلطانية ص ٢٢٧، الباب الثالث عشر: في وضع الجزية والخراج)

দারুল ইসলাম—ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত অঞ্চলে অমুসলিমদের উপাসনালয় নতুন করে তৈরি করা জায়েয নেই। যদি তারা নতুন নির্মাণ করে, তাহলে তা ভেঙে ফেলতে হবে। তবে পুরাতন উপাসনালয় ভেঙে গেলে তার পুনর্নির্মাণ করা যাবে।[৮০]

আরব ভূখণ্ডে অমুসলিমদের বসবাস

আরব ভূখণ্ডে কোনো কাফেরকে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দেওয়া জায়েয নেই। বেশ কিছু হাদিসে কাফেরদের জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ এসেছে। তাই আরবের পুরো ভূখণ্ডে কোনো কাফেরকে বসবাসের অনুমতি দেওয়ার সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে সেই কাফের শ্রমিক বা মজদুর হিসাবে হোক কিংবা মালিক ও মনিব হিসাবে থাকুক, কোনো অবস্থাতেই হুকুমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ও পার্থক্য আসবে না। সেখানে তাদের জন্য সর্বাবস্থায় স্থায়ী বসবাস নিষিদ্ধ। প্রত্যেক

---

৭৯. ফাতাওয়ায়ে শামি ৪/২০৪

৮০. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ২২৭

মুসলমান এই বিষয়ে আদিষ্ট যে, আরবের এই নির্দিষ্ট ভূমিকে অমুসলিমদের বসবাস থেকে পবিত্র রাখতে নিজের সাধ্যমতো ভূমিকা রাখবে। ফকিহগণ এটাও লিখেছেন যে, আরবের ভূমিতে কোনো অমুসলিমের জিম্মি হয়ে থাকারও অনুমতি নেই। আর যদি স্থায়ী বসবাসের জন্য না হয়, বরং ব্যবসা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অমুসলিমরা সেখানে আসতে চায় এবং তাতে দ্বীনের কল্যাণবিরোধী কিছু না থাকে, তাহলে শাসকদের জন্য সাময়িকভাবে তাদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

সহিহ বুখারিতে হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, বৃহস্পতিবার যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা ও মৃত্যযন্ত্রণা বেড়ে গেল, তখন তিনি তিনটি বিষয়ে উম্মতকে অসিয়ত করে যান। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ছিল,

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب.

(صحيح البخاري برقم : ٨٨٨٢، كتاب الجزية والموادعة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب)

মুশরিকদের জাযিরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) থেকে বের করে দাও।

'শরহুস সিয়ারিল কাবির' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

وليس ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار في شيء من الأمصار والقرى، وكذلك لا ينبغي أن يظهر فيها بيع الخمر والخنزير بحال من الأحوال. لأن هذا كله يبنى على سكنى أهل الذمة فيها، وهم لا يمكنون من استدامة السكنى في أرض العرب، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه موضع ولادته ومنشئه، وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : «لا يجتمع في أرض العرب دينان»... وإذا دخلها مشرك تاجرا على أن يتجر ويرجع إلى بلاده لم يمنع من ذلك، وإنما يمنع من أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ فيها مسكنا... حتى إذا أراد رجل من أهل الذمة أن ينزل أرض العرب، مثل المدينة ومكة والطائف والربذة ووادي القرى، فإنه يمنع من ذلك.... وقد بينا أن أرض العرب من عذيب إلى مكة طولا ومن عدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة عرضا. (شرح السير الكبير، كتاب سهمان الخيل والرجالة في الغنائم باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور)

আরবের কোনো জমিন, চাই তা শহর হোক বা গ্রাম, সেখানে কোনো গির্জা, অগ্নিপূজকদের উপাসনালয় রাখা জায়েয হবে না। তেমনইভাবে সেখানে কোনো অবস্থাতেই প্রকাশ্যে শূকর ও মদ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। কেননা মদ ও শূকর জিম্মিদের বসবাসের ওপর ভিত্তি করেই রাখতে

দেওয়া হয়। আর তাদের সেখানে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি নেই। (এর একটি কারণ তো হলো) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান বজায় রাখা, কেননা তিনি এই জমিনে বড় হয়েছেন ও এখানেই বেড়ে উঠেছেন। (আরেকটি কারণ হলো) এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিসে বিষয়টি বলে গিয়েছেন, 'আরবের জমিনে দুই ধর্ম একত্র হবে না।' ...কোনো অমুসলিম যদি সেখানে ব্যবসার জন্য আসে এবং আবার নিজ দেশে ফিরে যায়, তাহলে তাকে বাধা দেওয়া হবে না। তবে যদি দীর্ঘসময় অবস্থান করে যে, এখানেই আবাস গেড়ে বসে, তাহলে তাকে নিষেধ করা হবে। ...এমনকি কোনো জিম্মি যদি আরবের ভূমিতে, যেমন মক্কা, মদিনা, তায়েফ, ওয়াদিউল কুরা ইত্যাদি জায়গায় এসে জিম্মা চুক্তির মাধ্যমে বসবাস করতে চায়, তাহলেও তাকে সে অনুমতি দেওয়া হবে না। আরবের ভূখণ্ডের সীমানা হলো দৈর্ঘ্যে জাহিদ থেকে নিয়ে মক্কা পর্যন্ত আর প্রস্থে আদমে আবিয়ান থেকে নিয়ে ইয়েমেনের মারা নামক স্থানের সর্বশেষ পাথর পর্যন্ত।[৮১]

কাফেরদের মসজিদে প্রবেশের বিধান

কাফেরদের জন্য মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশের অধিকার রয়েছে কি না, এই বিষয়ে মুজতাহিদ আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও আরও বেশ কিছু আলেমের মত হলো, কাফেররা মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। মুসলমানদের দায়িত্ব হলো, কাফেরদের মসজিদে প্রবেশ থেকে দূরে রাখবে। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা ও অন্য ইমামদের মত হলো, কাফেরদের মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। তবে মসজিদে প্রবেশে তাদেরকে মসজিদের পূর্ণ আদব ও সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে এবং কোনোরকম বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা না থাকতে হবে।

হানাফি ফকিহ ইমাম কাসানি রহিমাহুল্লাহ লেখেন,

> ولا بأس بدخول أهل الذمة المساجد عندنا وقال مالك رحمه الله والشافعي لا يحل لهم دخول المسجد الحرام. (بدائع الصنائع ٨٢١/٥، كتاب الاستحسان، ط. دار الكتب العلمية)

আমাদের হানাফি উলামায়ে কেরামের নিকট জিম্মিদের মসজিদে প্রবেশে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম মালেক ও শাফেয়ি বলেন, জিম্মিদের মসজিদে হারামে প্রবেশ বৈধ নয়।[৮২]

---

৮১. শরহুস সিয়ারিল কাবির, ১/১৫৪১

৮২. বাদায়েউস সানায়ে, ৫/১২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক সম্পর্ক

- সামাজিক সম্পর্কসমূহ
- কাফের আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখার বিধান
- ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাফেরদের সাহায্য করা
- অসুস্থ কাফের ব্যক্তির সেবাশুশ্রূষা করা
- কাফেরদের জন্য দোয়া করা
- আর্থিক সাহায্য করা
- কাফেরের গিবত করা
- কাফেরদের থেকে সাহায্য নেওয়া
- কাফেরদের ঘরে দাওয়াত দেওয়া ও তাদের সাথে একসাথে খাওয়া
- জিম্মিদের পোশাকে পার্থক্য

কাফেরদের সাথে ভালো আচরণ প্রদর্শন করা

'মুদারাত'[৮৩] বা উত্তম আচরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাহ্যিকভাবে ভালো আচরণ করা। কার্যত তাদের প্রতি অন্তরে কোনো ধরনের ভালোবাসা রাখা হবে না, তবে সৌজন্যের খাতিরে তাদের সাথে হাসিমুখে এবং ভালো আচরণ দেখিয়ে চলাফেরা করা যাবে, বৈধ সীমা পর্যন্ত তাদেরকে সমীহ-সম্মান করা যাবে।

মূলত এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, কুফরের মতো বড় অপরাধের কারণে কাফেররা মোটেও সুন্দর আচরণ পাওয়ার যোগ্য নয়, তবে বাস্তবিক দ্বীনের কোনো কল্যাণার্থে অথবা কাফেরের মাধ্যমে ধর্মীয় বা পার্থিব কোনো ঝায়ঝামেলা হটাতে তাদেরকে যদি সুন্দর আচরণ দেখাতে হয়, তাহলে এর সুযোগ আছে। অনুরূপ কোনো কাফেরের সাথে যদি আত্মীয়তার বন্ধন থাকে, তাহলে প্রয়োজন মোতাবেক সৌজন্য প্রদর্শন করে তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা যাবে। কুরআনের আয়াত,

إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةً.

> তবে তোমরা যখন তাদের থেকে কিছুটা আত্মরক্ষা করতে চাও (তখনকার কথা ভিন্ন)।[৮৪]

এই আয়াতের মধ্যে শর্তসাপেক্ষে সুসম্পর্কের বৈধতা দেওয়া হয়েছে, কাফেরের পক্ষ থেকে কোনো মুসলমানের জানমাল, ইজ্জত-আবরুর বিনাশের আশঙ্কা থাকলে বাহ্যত তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ করা যাবে।

তবে সুসম্পর্কের এই চিত্র কেবল প্রয়োজনের তাগিদে, তাই এর বৈধতা প্রয়োজনের পরিসরেই হবে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুতেই ক্ষান্ত থাকতে হবে। সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। অতএব যখন কোনো কাফেরের নিন্দা না করে চুপ থাকলে কোনো অকল্যাণ হবে না, সেখানে তার প্রশংসায় মত্ত থাকা সঠিক হবে না।

---

৮৩. মুদারাত ও মুদাহানাত—এ দুটি বিষয়ের পরিচয় জানা আমাদের জন্য জরুরি। কারণ এর সাথে বেশ কিছু বিধানের সম্পৃক্ততা রয়েছে। মুহতারাম লেখক সামনে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন। তবে এখানে মুদারাত ও মুদাহানাতের পরিচয় বিষয়ে বাংলাদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা. বা.-এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করা মুনাসিব মনে করছি। হজরত এক প্রবন্ধে লেখেন—

এক হলো মুদারাত তথা উদারতা, যার অর্থ হলো, নিজের প্রতিপক্ষের সঙ্গে উত্তম আচরণ ও কোমল ব্যবহার করা এবং তার কোনো হক নষ্ট না করা; বরং তার সবধরনের হক ও অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা। উদারতা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এবং অনেক বড় ঈমানি বৈশিষ্ট্য। আরেক হলো মুদাহানাত তথা শৈথিল্য প্রদর্শন। অর্থাৎ আকিদা-বিশ্বাস ও আদর্শিক বিষয়গুলোকে হালকা মনে করা। অন্যদের খুশি করতে গিয়ে তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি, ভ্রান্তি ও গোমরাহিগুলোকে সঠিক বা গ্রহণযোগ্য বলা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা নিষিদ্ধ এবং এটা মুনাফেকির অনেক ভয়াবহ প্রকার।

সূত্র, মাসিক আলকাউসার, নভেম্বর ২০১৯ খ্রি., প্রবন্ধ : উদারতা অর্থ আকীদা ও আদর্শের বিসর্জন নয় (আব্দুল্লাহ)

৮৪. সুরা আলে ইমরান : ২৮

আল্লামা জাসসাস রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩৭০ হি.) বলেন,

فهذه الآي والآثار دالة على أنه ينبغي أن يعامل الكفار بالغلظة والجفوة دون الملاطفة والملاينة، ما لم تكن حال يخاف فيها على تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه أو ضررا كبيرا يلحقه في نفسه، فإنه إذا خاف ذلك جاز له إظهار الملاطفة والموالاة من غير صحة اعتقاد. (أحكام القرآن ٢/٢١، قبيل مطلب : في بيان معنى التقية وحكمها، دار الكتب العلمية)

এই আয়াত ও হাদিস ও সালাফের বর্ণনাগুলো ইঙ্গিত করে যে, নম্রতা বা কোমলতা ছাড়াই কাফেরদের সাথে কঠোর আচরণ করা উচিত। তবে মুসলমান যদি তার জীবননাশ বা তার অঙ্গহানি অথবা বড় ধরনের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করে তখন ভিন্ন। সুতরাং কোনো মুসলমান যদি এমন আশঙ্কা করে থাকে, তাহলে কাফেরের সাথে কোমল ও নম্র আচরণ করতে পারবে। তবে শর্ত হলো তাদের আকিদা-বিশ্বাসকে ভুল মনে করবে।[৮৫]

আল্লামা নাসাফি রহিমাহুল্লাহ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন,

ومن يوال الكفرة فليس من ولاية الله في شيء لأن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان {إِلا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تقاة} إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه أي إلا أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة وإبطال المعاداة. (مدارك التنزيل ٢٤٢/١)

যারা কাফেরদের বন্ধুত্ব চায়, তারা আল্লাহর বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত। কেননা বন্ধুর বন্ধুত্ব আর বন্ধুর শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়। 'তবে তোমরা যখন ওদের থেকে কিছুটা আত্মরক্ষা করতে চাও (তখনকার কথা ভিন্ন)', অর্থাৎ, যদি কাফেরদের পক্ষ থেকে এমন ভীতির আশঙ্কা করো, যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। এটার মর্ম হলো, যদি কাফেরের কর্তৃত্ব তোমার ওপর চলে আসে, আর তুমি তার থেকে নিজের জান ও মালের ব্যাপারে আশঙ্কায় পড়ে যাও, তাহলে তার সাথে বাহ্যত বন্ধুত্বের আচরণ প্রকাশ করতে এবং তার প্রতি শত্রুতা লুকিয়ে রাখতে পারবে।[৮৬]

কাফেরের সাথে আত্মীয়তা ঠিক রাখার বিধান

সৌহার্দ প্রকাশের অন্যতম একটি হলো, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা। যদি মুসলমানের কোনো কাফের আত্মীয় থাকে, তাহলে তার সাথে অন্তরঙ্গ ভালোবাসা ও বিশ্বাস রাখা শরিয়তে জায়েয নেই। এতৎসত্ত্বেও আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা

৮৫. আহকামুল কুরআন, ২/২৯০
৮৬. তাফসিরে নাসাফি, ১/২৪৮

ও তা বলবত রাখা বৈধ, বরং এটি উত্তম কাজ। শরিয়ত যেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার বিধান দিয়েছে, সেখানে কোথাও মুসলমান অথবা কাফেরের মাঝে কোনো ধরনের বিভাজন করেনি। কাজেই মুসলিম-কাফের উভয়ের সাথেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক ও বলবত রাখা চাই। যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা বৈধ, তাই এর আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ের প্রতি যত্নবান হওয়াও শরিয়ত অনুমোদিত। যেমন খোশগল্প করা, খোঁজখবর রাখা, একে অপরের দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া, জরুরি ও প্রয়োজনীয় সময়ে পরস্পরের সাহায্য-সহায়তা করা ইত্যাদি।

আত্মীয়তা ঠিক রাখার জন্য এসব কাজের প্রতি যত্নশীল হওয়া 'মুদারাত' (উত্তম আচরণের) অন্তর্ভুক্ত। শরিয়তের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো ধরনের বাধা নেই। যেমনটি জাসসাস রহ.-এর বক্তব্য থেকে ইতিপূর্বে স্পষ্ট হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর 'আস-সিয়ারুল কাবির' ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'শরহুস সিয়ারিল কাবির'-এ باب صلة المشرك (মুশরিকদের সাথে আত্মীয়তার অধ্যায়) নামে পৃথক একটি অধ্যায় রয়েছে। সেখানে বর্ণনা রয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম কাফের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা ঠিক রাখতেন এবং এ ব্যাপারে শরিয়তে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নেই। যৌক্তিকভাবে আত্মীয়তা ঠিক রাখা উত্তম কাজ এবং উৎকৃষ্ট স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ এই বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করার পর লেখেন,

> ولأن صلة الرحم محمود عند كل عاقل وفي كل دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم : «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» . فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا.(شرح السير الكبير ٦٩/١، باب صلة المشرك)
>
> আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা প্রতিটি ধর্মের ও বিবেকবান ব্যক্তির নিকটই প্রশংসনীয়। অন্যকে উপহার দেওয়া উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে উত্তম স্বভাব পূর্ণ করতে।' এ থেকে জানা গেল, উত্তম আচরণ করা মুসলিম ও কাফের সকলের ক্ষেত্রেই সমান।[৮৭]

মোটকথা, সৌহার্দ-প্রীতি প্রদর্শন করে আত্মীয়তা বজায় রাখার সময় সতর্ক থাকতে হবে যে, এর কারণে যেন শরিয়তের কোনো নিষিদ্ধ এবং অবাধ্য কর্মকাণ্ড প্রকাশ না পায়। যেমন কাফেরের মিথ্যা আকিদার প্রশংসা, সেটির প্রতি সন্তুষ্টি এবং একমত প্রকাশ করা, কাফেরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

৮৭. শরহুস সিয়ারিল কাবির, ১/৯৬

কাফেরদের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া ও সহায়তা করা

এ ক্ষেত্রে যদি নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত লক্ষ রাখা হয় তাহলে জায়েজ, অন্যথায় নয়।

প্রথম শর্ত : হারবি কাফের[৮৮] হতে পারবে না। কারণ হারবি ব্যক্তির সাথে এ ধরনের আচরণ করা নিষিদ্ধ। সুরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

> لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٨ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَـٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ وَظَـٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ.

> যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কারও করেনি, আল্লাহ তোমাদের তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ তো তোমাদের কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কারকরণে সহযোগিতা করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই জালেম।[৮৯], [৯০]

---

৮৮. হারবি কাফের বলা হয়,

الكفار من أهل الكتاب و المشركين الذين امتنعوا عن قبول دعوة الإسلام، ولم يعقد لهم عقد ذمة ولا أمان، ويقطنون في دار الحرب التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام. فهم أعداء المسلمين الذين يعلن عليهم الجهاد مرة أو مرتين كل عام.

এমন আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফেরদের যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং তাদের সাথে মুসলমানদের জিম্মা বা নিরাপত্তা চুক্তি হয়নি। তারা এমন ভূখণ্ডে বসবাস করে যেখানে ইসলামের বিধান বিধিবদ্ধ নয়। এরা হলো মুসলমানদের এমন শত্রু, যাদের সাথে বছরে একবার বা দুইবার জিহাদের ঘোষণা করতে হয়।

মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যা, ৭/১২১ (আব্দুল্লাহ)

৮৯. সুরা মুমতাহিনা : ৮-৯

৯০. আল্লামা বুরহানুদ্দিন ইবনে মাযাহ আল-হানাফি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬১৬ হি.) লেখেন,

ولا بأس أن يصل المسلم المشرك قريباً كان أو بعيداً، محارباً كان أو ذمياً، وأراد بالمحارب المستأمن، فأما إذا كان غير مستأمن فلا ينبغي بأن يصله بشيء، والأصل في ذلك قوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو في الدين} (الممتحنه : ٨) الآية إلى آخرها، فالله تعالى بين بأول الآية أنه ما نهانا عن مبرة الذمي، وبين بآخر الآية أنه نهانا عن مبرة أهل الحرب؛ إلا أن المستأمن صار مخصوصاً عن آخر الآية؛ لأن الأمان المؤبد أو المؤقت خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا، فكما لا يكون بصلة المسلم بأساً، فلا يكون بصلة المستأمن بأساً؛ بخلاف غير المستأمن؛ لأنه لم يوجد في حقه ما هو خلف عن الإسلام؛ حتى يلحق بالمسلم في حق هذا الحكم، فبقي داخلاً تحت النهي؛ هذا هو الكلام في صلة المسلم المشرك. (كتاب الكراهية في معاملة أهل الذمة)

দ্বিতীয় শর্ত : এতে ইসলাম এবং মুসলিমদের কোনো ক্ষতি থাকতে পারবে না।

কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১২২৫ হি.) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসিরে উল্লেখ করেন,

> ومن هاهنا يظهر أن المنهي عنه إنما هو موالاة أهل الحرب دون مبرتهم بشرط أن لا يضرب المومنين.
>
> নিষিদ্ধ তো শুধু হারবি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা, তবে তাদের সাথে ভালো আচরণ করা যাবে এই শর্তে যে, এতে মুমিনদের ক্ষতি হতে পারবে না।[৯১]

বোঝা গেল, কাফেরদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা জায়েজ, যতক্ষণ না এর কারণে মুসলিমদের বিপদ ও অনিষ্ট হয়।

স্মরণে থাকা চাই যে, সহায়তা-সহানুভূতি এবং হৃদ্যতা পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার মুসলিমরা। যদি কোনো মুসলিমের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে কাফেরের বিপরীতে মুসলিমের দিকেই প্রথমে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। ফুকাহায়ে কেরাম একটি মাসআলা উল্লেখ করেন যে, যদি জাকাতদাতার এলাকায় জাকাতের উপযুক্ত গরিব থাকে, তাহলে তাদেরকেই জাকাত দেওয়া উত্তম। তাদেরকে না দিয়ে অন্য এলাকার গরিবদের মাঝে বণ্টন করা মাকরুহ। যখন শুধু একটি শহরে থাকার কারণে এত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তখন ইসলামের সাথে সম্পর্ক তো আরও দৃঢ় এবং সম্মানের যোগ্য।

তৃতীয় শর্ত : এই সদাচরণের বিষয়টিতে কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না।

কাফেরদের সাথে ভালো আচরণে কোনো সমস্যা নেই। চাই কাফের জিম্মি হোক বা হারবি মুসতামিন হোক (মুসতামিন, যে মুসলমানদের থেকে নিরাপত্তা নিয়ে ইসলামি ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে)। আর যদি কাফের হারবি হয়, তাহলে তার সাথে সদাচরণ ও শৈথিল্য প্রদর্শন না করাই উচিত। এ ক্ষেত্রে মূল দলিল হলো, কুরআনে বর্ণির সুরা মুমতাহিনার ৭ নম্বর আয়াত। আল্লাহ তাআলা আয়াতের প্রথম অংশে জিম্মি কাফেরদের সাথে সদাচরণে নিষেধ করেননি। আর আয়াতের শেষাংশে হারবি কাফেরের সাথে কোমল আচরণে নিষেধ করেছেন। আর মুসতামিন অন্য আয়াতের কারণে হারবির হুকুম থেকে ভিন্ন হয়েছে।

দুনিয়ার বিধান প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের বিকল্প হিসাবে আমান ধর্তব্য হয়, চাই তা স্থায়ী হোক যেমন জিম্মি, বা সাময়িক হোক যেমন মুসতামিন। একজন মুসলমানের সাথে যেমন সদাচরণে কোনো নিষেধ নেই, তেমনই মুসতামিনের সাথেও সদাচরণে কোনো সমস্যা নেই। (কেননা ইসলাম তার মাঝে না থাকলেও দুনিয়ার বিধানের ক্ষেত্রে তার স্থলাভিষিক্ত সাময়িক নিরাপত্তাচুক্তি আছে) কিন্তু হারবি কাফেরের মাঝে ইসলাম বা তার স্থলাভিষিক্ত কোনো চুক্তি নেই যে, সে মুসলিমদের মতো সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং সদাচরণ করা যাবে না এই ব্যাপক হুকুমের অধীনেই সে থাকবে। আর এটাই হলো মুসলিম ও কাফেরের মাঝে সদাচরণবিষয়ক মূলনীতি।

আল-মুহিতুল বুরহানি, ৮/৭০ (আব্দুল্লাহ)

৯১. আত-তাফসিরুল মাজহারি, ৯/২৬২, সুরা মুমতাহিনা

কল্যাণ ও কল্যাণকামিতার মাঝে শরিয়তের সীমাবদ্ধতা ও বিধিনিষেধকে অতিক্রম করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, এমন কিছু বলা বা করা যাবে না, যার কারণে তাদের মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থিত হয় অথবা শরিয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন, তাদের ধর্মীয় কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা; তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এত পরিমাণ দেওয়া যে, ইসলামি ভূখণ্ডে সাধারণ জনগণ এবং দরিদ্র মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের ওপর এর প্রভাব পড়ে; তাদেরকে বড় পদগুলোতে স্থান দেওয়া ইত্যাদি।

ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সহায়তা করা

উপরিউক্ত তিনটি শর্ত লক্ষ রেখে কাফেরদের সাহায্য ও সহায়তা করা, তাদের প্রতি আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করা বৈধ, আর যদি দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে যেকোনো কাফেরকে সহযোগিতা করা অথবা উপহার-উপঢৌকন দেওয়া কেবল জায়েজই নয়, বরং একধরনের উত্তম প্রতিদানের (সওয়াব) কাজ। শরহুস সিয়ারিল কাবির কিতাবে রয়েছে,

> وإذا طمع في إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل الهدية، ويهدي إليهم، عملا بقوله عليه السلام : «تهادوا تحابوا» (شرح السير الكبير، باب هدية أهل الحرب)

> যদি তাদের (কাফেরদের) ইসলাম গ্রহণের আশা থাকে, তাহলে তাদের প্রতি হৃদ্যতা দেখানো উত্তম কাজ। তাই তারা হাদিয়া দিলে তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে এবং তাদের কাছেও হাদিয়া পাঠানো যাবে, এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের تَهَادَوْا تَحَابُّوا—'তোমরা পরস্পর হাদিয়া দাও, পরস্পর হৃদ্যতা বিনিময় করো', এই বাণীর প্রতি আমল হয়।[৯২]

অসুস্থ কাফেরকে দেখতে যাওয়া এবং তার দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া

জিম্মি কাফেরকে দেখাশোনা করা এবং তার দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষেত্রে শরিয়তে কোনো আপত্তি নেই, কারণ এ দুটিই আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার প্রকার, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ।

আল্লামা শামি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১২৫২ হি.) বলেন,

> (قوله وجاز عيادته) أي عيادة مسلم ذميا نصرانيا أو يهوديا، لأنه نوع بر في حقهم وما نهينا عن ذلك، وصح أن النبي الله «عاد يهوديا مرض بجواره» هداية... وفي النوادر جار يهودي أو مجوسي مات ابن له أو قريب ينبغي أن يعزيه، ويقول أخلف الله عليك خيرا منه، وأصلحك وكان معناه أصلحك الله

---

৯২. শরহুস সিয়ারিল কাবির, ১/১২৩

بالإسلام يعني رزقك الإسلام ورزقك ولدا مسلما كفاية. (رد المحتار، كتاب الحظر و الإباحة، فصل في البيع)

জিম্মি ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান, তাদের শুশ্রূষা করা জায়েজ। কারণ এটি তাদের প্রতি একধরনের সহানুভূতি, যে ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়নি। আর এটা প্রমাণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পার্শ্ববর্তী এক ইহুদি অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যান। ...'নাওয়াদির' কিতাবে উল্লেখ আছে, ইহুদি বা অগ্নিপূজারি প্রতিবেশীর সন্তান বা নিকটাত্মীয় কেউ মারা গেলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া (মুসলিমের জন্য) উচিত, তখন সে বলবে, 'আল্লাহ আপনাকে এর চেয়ে ভালো কিছু দান করুন, এবং আপনার মঙ্গল করুন।' মঙ্গল করার অর্থ হলো আল্লাহ আপনাকে ইসলাম (গ্রহণের তাওফিক) দান করুন, আর আপনাকে একটি মুসলিম সন্তান দান করুন।[৯৩]

কিছু কিছু ফিকহি শাখাগত মাসআলায় এ (দেখাশোনা বা সান্ত্বনার) ক্ষেত্রে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাথে جار তথা প্রতিবেশীর শর্ত করা হয়। কিন্তু এই শর্ত আবশ্যকীয় কোনো শর্ত নয়, কারণ দেখাশোনা বৈধ হওয়ার যে কারণ বিবৃত হয়েছে, সেটি 'হারবি' না হলে প্রতিবেশী ও দূরে বসবাসকারী উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

আল্লামা হামাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১০৯৮ হি.) 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই শর্তটি আবশ্যকীয় শর্ত নয়।[৯৪]

তেমনইভাবে কিছু কিতাবে 'আহলে কিতাব'—এই শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। অমুসলিম যদি আহলে কিতাব হয়, তাহলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে বা তার সেবাশুশ্রূষা করা যাবে। তবে মাজুসি বা অন্য কোনো ধর্মের হলে তা করা যাবে না। এটা কিছু ফকিহের মত হলেও প্রাধান্যযোগ্য বক্তব্য হলো, যেকোনো জিম্মি অমুসলিমের সেবা-শুশ্রূষা করা যাবে। আল্লামা শিলবি রহিমাহুল্লাহ 'তাবয়িনুল হাকায়েক' গ্রন্থের টীকায় ইমাম মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, অগ্নিপূজকদেরও সেবাশুশ্রূষা করা যাবে।

কাফেরদের জন্য দোয়া করা

১. কোনো ব্যক্তি কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা জায়েয নয়, তাই সান্ত্বনা দেওয়ার কালে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা কাম্য।

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ

৯৩. ফাতাওয়ায়ে শামি, ৬/৩৮৮

৯৪. শরহুল আশবাহ লিল-হামাবি, ৩/৪০২

নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সংগত নয়, যদিও তারা আত্মীয়স্বজন হোক, যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা দোজখি।[৯৫]

আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

والحق أنه يكون عاصيا بالدعاء للكافر بالمغفرة غير عاص بالدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين. (البحر الرائق ٣٥٠/١، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، آداب الصلاة)

সঠিক কথা হলো কাফেরদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করার দ্বারা ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কিন্তু সমস্ত মুসলমানের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করার দ্বারা গোনাহগার হবে না।[৯৬]

আন-নাহরুল ফায়েক গ্রন্থে আরও উল্লেখ হয়েছে,

(ودعا) لنفسه ولأبويه المؤمنين والمؤمنات أما الدعاء للكافرين بالمغفرة فلا يجوز بل ادعى القرافي المالكي البهنسي أنه كفر. (النهر الفائق ٢٢٤/١، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة)

নিজের জন্য, নিজের মুসলিম পিতামাতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা জায়েজ। আর কাফেরদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা জায়েয নয়। বরং কারাফি আল-মালেকি রহিমাহুল্লাহ তো দাবি করেছেন যে, এটা (কাফেরদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা) কুফর।[৯৭]

বাকি রইল জীবিত কাফেরদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করার বিধান। এই বিষয়ে ফকিহদের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়। কতক আহলে ইলমের মতে তা জায়েজ। 'আল-মুতাসার মিনাল মুখতাসার' কিতাবে উল্লেখ হয়েছে,

ومما يدل على جواز الاستغفار للمشرك مادام حيا قوله صلى الله عليه وسلم : اللَّهُمَّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. (المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ١٢١/١، كتاب الجنائز، باب في الاستغفار للمشرك)

জীবিত কাফেরের জন্য মাগফেরাতের দোয়া জায়েয হওয়ার দলিল হলো, যেমনটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদযুদ্ধের সময় করেছেন—হে আল্লাহ আমার কওমকে ক্ষমা করে দেন, কেননা তারা জানে না।[৯৮]

---

৯৫. সুরা তাওবা : ১১৩

৯৬. আল-বাহরুর রায়েক, ১/৩৫০

৯৭. আন-নাহরুল ফায়েক, ১/২২৪

৯৮. আল-মুতাসার মিনাল মুখতাসার, ১/১২১

আর কতকের মতে কুরআনে মাগফেরাতের দোয়া করতে যে নিষেধ করা হয়েছে তা ব্যাপক অর্থেই করা হয়েছে। তাই জীবিত ও মৃত সব কাফেরই এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬৭১ হি.) বলেন,

فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. فإن قيل : فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد حين كسروا رباعيته وشجوا وجهه : (اللَّهُمَّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين. قيل له : إن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء والدليل عليه ما رواه مسلم عن عبد الله قال : كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : (رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون). (الجامع لأحكام القرآن ٣٧٢/٨، تحت سورة التوبة الآية : ٣١١)

অর্থাৎ, মুমিনদের জন্য কাফেরের মাগফেরাত চাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।[৯৯]

কিন্তু বাহ্যত এটাই মনে হয় যে, যদি জীবিত কাফেরের জন্য তার কুফরি অবস্থায় মাগফেরাতের দোয়া করা হয়, তাহলে তা নাজায়েয হবে। তবে যদি এভাবে মাগফেরাত চাওয়া হয় যে, কাফেরের যেন সঠিক ধর্ম ইসলাম কবুলের তাওফিক হয়, তাহলে দোয়া করার সুযোগ আছে। এতে কোনো সমস্যা নেই।[১০০]

---

৯৯. তাফসিরে কুরতুবি, ৮/২৭৩

১০০. **রিপ কালচার ও কিছু কথা :**
বর্তমানে আমাদের সমাজে বড় ভয়ংকর বিকৃত সংস্কৃতি চালু হয়েছে, যেটাকে বলা হয় 'রিপ কালচার'। বিভিন্ন অমুসলিম সেলেব্রেটি মারা গেলে তার মৃত্যুতে শোক জানানো হয় এবং তার জন্য ক্ষমাপার্থনা ও মৃত জীবনে সে যেন ভালো থাকে সে দোয়া করা হয়। এতে বেশ প্রচলিত একটি বাক্য হলো RIP (Rest in peace)। অর্থাৎ ওপারে ভালো থেকো। মুসলিম সন্তানরা এমন ব্যক্তির সম্পর্কে ওপারে ভালো থাকার দোয়া করছে, যে সারাজীবন মানুষের নৈতিকতা ধ্বংসের কাজ করে গেছে। এমন মানুষের ওপারে ভালোর দোয়া করছে, যে জীবনভর আখেরাতে অবিশ্বাস করে গেছে এবং মানুষকে সে অবিশ্বাসের দিকে আহ্বান করে গেছে। এর থেকে বড় আফসোসের বিষয় আর কী হতে পারে! এটা বড়ই দুঃখজনক। আমাদের সন্তানদের এ থেকে আমাদের বিরত রাখা, ইসলামের সঠিক জ্ঞান দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই মাসআলাসংক্রান্ত একটি আয়াত লেখক ওপরে পেশ করেছেন। এখানে আমরা এ সংক্রান্ত আরও একটি প্রসিদ্ধ আয়াত ও কয়েকজন ইমামের বক্তব্য দেখব।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ.

আর তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে আপনি কক্ষনো তার (জানাজার) নামাজ পড়বেন না এবং তার কবরের সামনে দাঁড়াবেনও না। তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করেছে এবং নাফরমান অবস্থায়ই মারা গেছে। সুরা তাওবা : ৮৪

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট হাম্বলি ফকিহ আল্লামা বাহুতি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১০৫১ হি.) বলেন,

২. হেদায়েত ও সত্য দ্বীন গ্রহণের তাওফিক হয়, এজন্য দোয়া করা। এটা সম্পূর্ণ

وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، أن المراد عند أكثر المفسرين : القيام للدعاء والاستغفار. (كشاف القناع، كتاب الجنائز، شروط صلاة الجنازة)

কুরআনের বাণী, 'আপনি তার কবরের সামনে দাঁড়াবেন না', অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের জন্য দোয়া ও ক্ষমাপার্থনা করার জন্য দাঁড়াবেন না। কাশশাফুল কিনা, ৪/২৪২

সুরা তাওবার ১১৩ নম্বর আয়াতের (যে আয়াতটি মূল লেখক উল্লেখ করেছেন) ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি আল-মালেকি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. (تفسير القرطبي ٣٧٢/٧، تحت سورة التوبة : آية ١١٣، دار الكتب المصرية)

এই আয়াতের মর্মার্থই হলো কাফেরদের সাথে মৃত বা জীবিত সর্বাবস্থায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। সুতরাং কোনো মুশরিকের জন্য ক্ষমাপার্থনা করা নাজায়েজ। তাফসিরে কুরতুবি, ৮/২৭৩

হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম সারাখসি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৪৮৩ হি.) মৃত কাফেরের জন্য দোয়ার বিষয়ে লেখেন,

وإذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فإن كانت الغلبة للمسلمين غسلوا وصلي عليهم إلا من عرف أنه كافر لأن الحكم للغلبة والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب وإن كانت الغلبة لموتى الكفار لا يصلى عليهم إلا من عرف أنه مسلم بالسيما فإذا استويا لم يصل عليهم عندنا لأن الصلاة على الكفار منهي عنها. (المبسوط ٤٥/٢، كتاب الصلاة، باب الشهيد، دار الكتب العلمية)

...আমাদের নিকট কাফেরের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা নিষেধ। আল-মাবসুত, ২/৫৪

একটি সংশয় ও তার জবাব :

যখন কোনো স্পষ্ট কাফের বা দ্বীনবিদ্বেষী মৃত্যুবরণ করে আর কিছু মানুষ 'ওপারে ভালো থাকবেন' এমন আবেগঘন বক্তব্য দিতে থাকে, তখন আলেম-উলামা ও দ্বীনদার শ্রেণি 'এমন কাজ করা ইসলামে নাজায়েজ, কাফেরের প্রতি এভাবে ভালোবাসা প্রকাশ ঈমানের জন্য ক্ষতিকর' বলে সতর্ক করে, তখন একদল সেকুলার রাম-বাম আর ঈমানহীন বুদ্ধিজীবী অথবা অজ্ঞ মুসলিমদের খুবই আবেগতাড়িত সুরে বলতে দেখা যায়, 'সে কাফের হলেও একজন মানুষ তো! একজন মানুষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা কেন সমস্যা! কেন একজন মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে এভাবে বলা হবে, সে জাহান্নামি! ধর্ম কি এভাবে অমানবিকতা শিক্ষা দেয়!'

সেকুলার আর লিবারেল নফসের পূজারি বুদ্ধিজীবীদের এই বক্তব্যে অনেক মুসলমানই বিভ্রান্ত হয়! তারাও তাদের সাথে সুর মিলায়। অথচ একটু ভালো করে লক্ষ করলেই দেখা যায়, 'মানবতা' বলে চিৎকার দিয়ে ভালোবাসার যে মাপকাঠি ঠিক করে তারা ইসলামের স্পষ্ট বিধানকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে, মানবতা নামক এই মাপকাঠি শুধুই ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। সময়ে সময়ে এই সেকু-লিবারেলদের এই মানবতা নামক মিথ্যা মাপকাঠির চেহারা থেকে পর্দা খসে পড়ে। একটি ছোট্ট উদাহরণ দেখা যাক। কিছুদিন পূর্বে (১৪ আগস্ট ২০২৩ খ্রি.) বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লামা সাঈদী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তখন এ দেশের শাহবাগী, জাতীয়তাবাদী, লিবারেল ও সেকুলার লোকেরা আনন্দে-উল্লাসে ফেটে পড়ে! শুধুই কি উল্লাস! বরং তার মৃত্যুতে কেউ শোক প্রকাশ করলে তার সাথে ঘৃণ্য আচরণ করতেও এরা দ্বিধাবোধ করেনি। আল্লামা সাঈদীর মৃত্যুতে (এমন আরও অসংখ্য ঘটনায়) তারা কিন্তু মানবিকতার বয়ান নিয়ে হাজির হচ্ছে না। সাঈদীকে একজন মানুষ হিসাবে তারা কল্পনা করতে পারছে না! তারা মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর ঘৃণার কিন্তু আরেকটি মূল্যবোধ ও মাপকাঠি নিয়ে আসছে, তা হলো একাত্তরের রাজাকার! অর্থাৎ একজন মানুষ মানুষ হওয়ার পরেও যখন তাকে রাজাকার বলে ধরে নেওয়া হবে, জীবদ্দশায় তো তাকে ভালোবাসার প্রশ্নই ওঠে না, মৃত্যুবরণ করার পরেও তাকে ঘৃণা করতে হবে, তার প্রতি সামান্য ভালোবাসা দেখানো দেশের সাথে গাদ্দারির শামিল বলে ধর্তব্য হবে! তার অপকর্মগুলো মানুষকে স্পষ্ট করতে হবে, যেন মানুষ তাকে ভালো না বাসে। এমনকি এই বিষয়ে ন্যূনতম কোনো ছাড় নেই।

জায়েজ। বরং কেউ যদি ইখলাসের সাথে দোয়া করে, তাহলে সে অবশ্যই অনেক বড় একটি সওয়াবের কাজ করল। আর এটা হলো তাবলিগের একটি নীরব পদ্ধতি।

৩. দীর্ঘজীবন, নিরাপত্তার জন্য ও সুখশান্তির জন্য দোয়া করা। এখানেও মতানৈক্য রয়েছে। কারও নিকট জায়েয আর কারও নিকট নিষেধ। তবে মাসআলাটির মূল ভিত্তি এটাই মনে হয়, যে দোয়া করছে তার উদ্দেশ্য কী সেটা দেখতে হবে। যদি উদ্দেশ্য হয়, দীর্ঘজীবন পেলে এবং সুখশান্তিময় জীবন লাভ করলে কাফের ব্যক্তিটি ইসলাম গ্রহণ করবে, অথবা দীর্ঘজীবী হলে তার জিজিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের উপকার হবে, এমন উদ্দেশ্য হলে এ ধরনের দোয়ায় কোনো সমস্যা নেই। আর যদি উদ্দেশ্য হয় কুফর নিয়ে সে দীর্ঘজীবী হোক, তাহলে স্পষ্টই এটা নিষিদ্ধ। 'তাবয়িনুল হাকায়েক' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

> ولو دعا له بالهدى جاز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال اللّٰهُمَّ أهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولو دعا له بطول العمر قيل لا يجوز؛ لأن فيه التمادي على الكفر، وقيل يجوز؛ لأن في طول عمره نفعا للمسلمين بأداء الجزية فيكون دعاء لهم، وعلى هذا الاختلاف الدعاء له بالعافية. (تبيين الحقائق ٣٠/٦، كتاب الكراهية، فصل في البيع)
>
> অর্থাৎ, কাফেরের জন্য হেদায়েতের দোয়া করা জায়েজ। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের হেদায়েতের দোয়া করেছেন। কাফেরদের দীর্ঘজীবী হওয়ার দোয়া করা জায়েয নয়, কেননা এতে কুফরের ওপর দীর্ঘজীবনের দোয়া হয়। আবার কেউ বলেছেন জায়েজ। কেননা কাফের দীর্ঘজীবী হলে সে জিজিয়া দেবে, এতে মুসলমানদের কল্যাণ। ফলে এখানে মুসলমানদের পক্ষেই দোয়া করা হচ্ছে। কাফেরের জন্য আরোগ্যের দোয়া করার ব্যাপারেও একই মতভেদ রয়েছে।[১০১]

'মিনহাতুস সুলুক' গ্রন্থে বদরুদ্দিন আইনি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৮৫৫ হি.) বলেন,

---

এতে স্পষ্টই যে, সেকুলাঙ্গার আর জাতীয়তাবাদীদের নিকট একজন মানুষ মানুষ হওয়ার পরেও তাকে ভালোবাসা ও ঘৃণার ভিন্ন মাপকাঠি রয়েছে। আর তাতে তাদের রয়েছে জিরো টলারেন্স! এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই! এই হলো মানুষের বানানো মাপকাঠির দ্বিচারিতা ও ধোঁকাবাজি।

জি, ঠিক এমনই ইসলামেরও রয়েছে মানুষ মানুষ হওয়ার পরেও তাকে ভালোবাসা ও ঘৃণা করার ভিন্ন একটি মাপকাঠি। আর তা হলো ঈমান-কুফর। একজন মানুষের ব্যাপারে যখন এটা প্রমাণিত হবে যে সে মুসলিম, এতটুকুই যথেষ্ট তার প্রতি আমার ভালোবাসা থাকার। অপরদিকে কারও ব্যাপারে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে সে কাফের, এতটুকুই যথেষ্ট সে মানুষ হিসাবে যেমনই হোক তাকে ঘৃণা করার, তাকে শত্রু বিবেচনা করার। যেখানে কোনো দ্বিচারিতা নেই, নেই কোনো ধোঁকাবাজি।

যখন দুটি মতাদর্শেরই মানুষকে ভালোবাসা আর ঘৃণার আলাদা মূল্যবোধ আর মূল্যায়নের মাপকাঠি আছে, সেখানে ইসলামেরটা উগ্রতা আর সেকুলার-লিবারেলেরটা মানবতা! এটা কি দ্বিচারিতা নয়! এটা কি ধোঁকাবাজি নয়! (আব্দুল্লাহ)

১০১. তাবয়িনুল হাকায়েক, ৬/৩০

(ولو قال للذمي : أطال الله بقائك : لم يجز) لأن فيه التمادي على الكفر (إلا إذا نوى به) أي بهذا الدعاء (إطالة بقائه لأجل أن يسلم، أو لمنفعة الجزية) لأن الدعاء فيهما لا يرجع إلى الذمي. (منحة السلوك في شرح تحفة الملوك ص ٤٥٣، كتاب الجهاد، الفصل الثاني)

জিম্মিকে এই কথা বলা, 'আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুক', জায়েয নেই। কেননা, এতে কুফরের ওপর দীর্ঘজীবিতা চাওয়া হয়। তবে যদি এই নিয়তে এই কথা বলা হয় যে, সে দীর্ঘজীবী হলে ইসলাম গ্রহণ করবে বা জিজিয়া আদায় করবে, তাহলে এই দুই সুরতে তা জায়েজ। কেননা এখানে জিম্মির জন্য দোয়া করা হচ্ছে না।[১০২]

কাফেরদের সালাম দেওয়া

সালাম মূলত একটি ব্যাপক অর্থবোধক একটি দোয়া। মুহাব্বত ও সম্মান প্রকাশেরও একটি বড় মাধ্যম। আর কাফেররা এই দুটির কোনোটিরই অধিকার রাখে না। তাই অমুসলিমকে প্রথমে আগে বেড়ে সালাম দেওয়া মাকরুহ। তবে সে যদি সালাম দেয়, তাহলে মুসলমানরা শুধু 'ওয়া আলাইকা' (তোমার ওপরও) এতটুকুই বলবে। ইমাম কাসানি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৫৮৭ হি.) বলেন,

ويكره الابتداء بالتسليم على اليهودي والنصراني لأن السلام اسم لكل بر وخير ولا يجوز مثل هذا الدعاء للكافر إلا أنه إذا سلم لا بأس بالرد عليه مجازاة له ولكن لا يزيد على قوله وعليك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقولوا وعليك». (بدائع الصنائع ٨٢١/٥، كتاب الاستحسان)

ইহুদি ও খ্রিষ্টানকে প্রথমেই সালাম দেওয়া মাকরুহ। কেননা সালাম সকল নেকি ও কল্যাণের দোয়ার নাম। আর কাফেরদের জন্য এমন দোয়া করা জায়েয নেই। তবে কাফের সালাম দিলে তার জবাব দেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। তবে জবাবে শুধুই 'ওয়া আলাইকা' বলতে হবে, এর বেশি নয়। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কোনো ইহুদি সালাম দিলে সে বলে, আসসামু আলাইকুম (অর্থ : তোমাদের ওপর ধ্বংস আসুক)। তখন তোমরা বলবে, ওয়া আলাইকা (অর্থ : তোমাদের ওপরও)।[১০৩]

---

১০২. মিনহাতুস সুলুক, পৃ. ৩৫৪

১০৩. বাদায়েউস সানায়ে, ৫/১২৮

কাফেরদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা

জাকাত শুধু মুসলমানকেই দেওয়া যাবে, যারা জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত। কোনো কাফেরকে জাকাত দেওয়া বৈধ নয়। তবে জাকাত ছাড়া অন্যান্য যত সদকা রয়েছে, তা ওয়াজিব সদকাই হোক না কেন, তা যেমন মুসলমানদের দেওয়া জায়েজ, তেমনই জিম্মি কাফেরদের দেওয়াও জায়েজ। আর হারবি কাফেরকে কোনো ধরনের সদকা দেওয়া জায়েয নেই। কেননা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তাবয়িনুল হাকায়েক গ্রন্থে রয়েছে,

> (وصح غيرها) أي صح دفع غير الزكاة من الصدقات إلى الذمي كصدقة الفطر والكفارات وقال أبو يوسف والشافعي لا يجوز... والحربي خارج بالنص. (تبيين الحقائق ۳۰۰/۱، كتاب الزكاة، باب المصرف)

> জাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদকা কাফেরদের দেওয়া জায়েজ। যেমন সদকাতুল ফিতর, বিভিন্ন কাফফারা। ইমাম আবু ইউসুফ ও শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ এটাকে নাজায়েয বলেছেন। আর হারবি কাফেরের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে তারা এই হুকুমের বাহিরে থাকবে। (অর্থাৎ তাদেরকে কোনো ধরনের সদকার টাকাও দেওয়া যাবে না।)[১০৪]

‘হিদায়া’ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

> ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي... ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة. (الهداية، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز)

> কোনো জিম্মিকে জাকাত দেওয়া জায়েয নেই। তবে অন্যান্য সদকা দেওয়া যাবে।[১০৫]

কাফেরের গিবত করা

কাফের দুই প্রকার। এক. জিম্মি। দুই. হারবি। জিম্মি হলো ওই সমস্ত কাফের যারা ইসলামি ভূখণ্ডে জিজিয়া-কর দিয়ে ইসলামি আইনের অধীনে থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। আর হারবি হলো যারা কুফরি রাষ্ট্রে বসবাস করে। জিম্মি কাফেরের গিবত করা নাজায়েজ। কেননা তার জানমাল ও ইজ্জত সকল বিষয় তেমনই নিরাপদ যেমন মুসলমানের জানমাল ও ইজ্জত। তবে হারবি কাফেরের গিবত হারাম নয়। কেননা, কুফরি অবলম্বন ও কুফরি ভূখণ্ডে বসবাসের কারণে তার জানমালের যেখানে নিরাপত্তা নেই, সেখানে তার ইজ্জত কীভাবে নিরাপদ হবে!

তবে এখানে মনে রাখতে হবে, হারবি কাফেরের গিবতে যদি কোনো উল্লেখযোগ্য

---

১০৪. তাবয়িনুল হাকায়েক, ১/৩০০

১০৫. হিদায়া, ১/১১১

ফায়েদা না থাকে, তাহলে তা থেকেও বিরত থাকা চাই। কেননা, এক তো হলো, এতে সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নেই। অথচ একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হলো সে অনর্থক কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। দ্বিতীয়ত, গিবত অন্যান্য অভ্যাসের মতোই মানুষের স্বভাবের সাথে মিশে যায়। একবার মানুষের নফস গিবতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া অনেক কঠিন।

নাহরুল ফায়েক গ্রন্থে রয়েছে,

لا خفاء في منع غيبة الذمي. (النهر الفائق ٣/٨٤٤، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد)

জিম্মিদের গিবত করা নাজায়েয এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।[১০৬]

ইবনে হাজার হাইতামি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৯৭৪ হি.) লেখেন,

وسئل الغزالي في فتاويه عن غيبة الكافر. فقال : هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل : الإيذاء وتنقيص خلق الله، فإن الله خالق لأفعال العباد، وتضييع الوقت بما لا يعني. قال : والأولى تقتضي التحريم، والثانية الكراهة، والثالثة خلاف الأولى. وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء؛ لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله... وأما الحربي فليس بمحرم على الأولى ويكره على الثانية والثالثة. (الزواجر في اقتراف الكبائر ٢/٧٢، كتاب النكاح، الكبيرة الثامنة والتاسعة والأربعون بعد المائتين الغيبة والسكوت عليها)

ইমাম গাজালি রহ.-কে কাফেরদের গিবত বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, মুসলমানদের ব্যাপারে গিবত করা তিন কারণে নিষিদ্ধ। এক. কষ্ট দেওয়া। দুই. আল্লাহর সৃষ্টির দোষ তালাশ করে তার সম্মানকে খাটো করা। কেননা আল্লাহই তো বান্দার সকল কাজের স্রষ্টা। তিন. অনর্থক কাজে সময় অপচয় করা। প্রথম কারণটি পাওয়া গেলে গিবত হারাম হবে। দ্বিতীয় কারণ পাওয়া গেলে মাকরুহ আর তৃতীয় কারণ পাওয়া গেলে অনুত্তম হবে। জিম্মিদের কষ্ট দেওয়া মুসলমানদের মতোই হারাম। কেননা, ইসলাম তাদের জীবনকে তেমনই নিরাপত্তা দিয়েছে, যেমন মুসলমানের জীবনকে দিয়েছে। হারবি কাফেরদের গিবত প্রথম প্রকারের কারণে হারাম হবে না। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের কারণে মাকরুহ হবে।[১০৭]

হজরত আবদুল হাই লাখনবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৩০৬ হি.) 'গিবাত কিয়া হ্যায়' এই নামে গিবত বিষয়ে সকলের জন্য উপকারী চমৎকার একটি কিতাব রচনা করেন। সেখানে লেখেন, দ্বিতীয় হলো জিম্মির গিবত করা। জিম্মি বলা হয় ওই সকল

১০৬. আন-নাহরুল ফায়েক, ৩/৪৪৮

১০৭. আয-যাওজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের, ২/২৭

কাফেরকে, যারা দারুল ইসলামে অধীনস্থ হয়ে বসবাস করে। এই গিবতও হারাম। কেননা, যখন কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে গেল তখন তারও জানমাল ও ইজ্জত মুসলমানদের মতোই নিরাপদ ধরা হবে। তৃতীয় হলো হারবি কাফেরের গিবত। অর্থাৎ যে-সকল কাফের ইসলামি রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করেনি। ফিকহের কিতাব থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, তাদের গিবত করা হারাম নয়।[১০৮]

গিবত নাজায়েয হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হলো গিবতের মাধ্যমে ব্যক্তির ইজ্জতকে নষ্ট করা হয়। আর কাফেরদের গিবতের অনুমতি দ্বারা তাদের ইজ্জত রক্ষার বিষয়টিও অনুমেয়।

কাফের থেকে সাহায্য গ্রহণ করা

কারও থেকে সাহায্য গ্রহণ করার জন্য এটা জরুরি নয় যে, সে মুসলিম হতে হবে; বরং কাফেরদের অনুগ্রহ ও সহায়তা থেকে উপকৃত হওয়া যাবে। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, কখনো কখনো তারা কাফেরদের সাহায্য, সহায়তা ও উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। তবে এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে, কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যেন লেনদেন করা না হয়। অনুরূপ এমনটিও যেন না হয় যে, উপহার গ্রহণ করার কারণে মুসলিমদের ব্যক্তিত্ব অথবা ভূখণ্ড এমন পরিস্থিতির শিকার হয় যে, কাফেররা মুসলিমদের ধর্মীয় এবং সামাজিক বিষয়ে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পায়, অথবা এর কারণে অতিরিক্ত অবৈধ লেনদেনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩৭০ হি.) বলেন,

> قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للمسلمين الاستعانة بالكفار على قتال الكفار، إلا أن يكون حكم الإسلام هو الغالب، فإن كان كذلك واحتيج إليهم : فلا بأس بذلك)
>
> وذلك لأن حكم الكفر إذا كان هو الغالب، فالقهر والغلبة إذا حصلا، كان حكم الكفر هو الظاهر، فصار ذلك قتالا لإظهار حكم الكفر، ولا يجوز للمسلم القتال على إظهار حكم الكفر، وإنما يجوز للمسلمين القتال لإظهار دين الإسلام، ولتكون كلمة الله العليا، فلذلك لم يجز للمسلمين أن يقاتلوا مع الكفار.وأما إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر، فإنما جازت الاستعانة بالكفار. (شرح مختصر الطحاوي ٢٩١/٧، كتاب السير والجهاد، باب استعانة المسلمين بالمشركين في الحرب)
>
> আবু জাফর (তহাবি রহ.; মৃত্যু : ৩২১ হি.) বলেন, মুসলিমদের জন্য উচিত

---

১০৮. গিবাত কিয়া হ্যায়, পৃ. ১৭

নয় কোনো কাফেরের সাথে লড়াই করার সময় অন্য কাফেরের সাহায্য নেওয়া, তবে যদি ইসলামি শাসনক্ষমতা শক্তিশালী হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হলে নিতে পারবে, এতে সমস্যা নেই।

(জাসসাস রহিমাহুল্লাহ এই কথার ব্যাখ্যায় লেখেন,) কারণ কুফরি শাসন যদি শক্তিশালী থাকে, তাহলে বিজয় ও শক্তি অর্জিত হলে তা কুফরি শাসনেরই হবে, ফলত তা হবে কুফরি শাসনের বিজয়ের লড়াই, অথচ মুসলিমের জন্য কুফরি শাসনকে বিজয়ী করার জন্য লড়াই করা মোটেও বৈধ নয়; বরং সে লড়াই করবে ইসলামের বিজয়ের জন্য, আল্লাহর কালিমার বুলন্দির জন্য। তাই মুসলিমদের জন্য বৈধ হবে না কাফেরদের সঙ্গী হয়ে লড়াই করা। আর ইসলামি শাসনব্যবস্থা বিজয়ী থাকা অবস্থায় কাফেরদের সাহায্য নেওয়া জায়েজ।[১০৯]

ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপনের পর একটি সংশয় তুলে ধরেন যে, কতক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মুশরিক ও কাফেরদের থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে না। অতঃপর তিনি নিজেই তার জবাব উল্লেখ করেন,

فإنه يحتمل أن يكون في حال قلة المسلمين، بحيث لم يأمن غدرهم وكيدهم. (شرح مختصر الطحاوي ٧٩١/٧، كتاب السير والجهاد، باب استعانة المسلمين بالمشركين في الحرب)

এটি হয়তো মুসলিমদের সংখ্যা কম হলে, কারণ তখন মুসলমানরা কাফেরদের প্রতারণা ও ধোঁকা থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না।[১১০]

---

১০৯. শরহে মুখতাসারুত তাহাবি, ৭/১৯২

১১০. শরহে মুখতাসারুত তহাবি, ৭/১৯২

ইমাম ইবনে জামাআ রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৩৩ হি.) এই বিষয়ে খুব চমৎকার বলেছেন,

لا يستعان في الجهاد بمشرك أو ذمي إلا إذا علم السلطان حسن رأيه في المسلمين وأمن من خيانتهم، وكان المسلمون قادرين عليهم لو اتفقوا مع العدو، فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جازت الاستعانة بهم. وقيل: لا يجوز استصحابهم في الجيش مع موافقتهم العدو في المعتقد، فعلى هذا تكون الشروط أربعة. (تحرير الأحكام في تدبير الإسلام ٢٤٤، الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، مكتبة دار المنهاج، ط. ١٤٣٣هـ)

কাফের অথবা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের থেকে মুসলমানদের যুদ্ধে কোনোপ্রকার সহযোগিতা নিতে হলে তিনটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে। যথা : এক. মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের সুধারণা। দুই. তাদের পক্ষ থেকে ধোঁকা-প্রতারণা প্রকাশ না হওয়ার নিশ্চয়তা। তিন. তারা যদি কোনোভাবে শত্রুদের সাথে মিলে যায় তাহলে তাদের প্রতিরোধের সামর্থ্য রাখা। এই তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে তাদের থেকে সহযোগিতা নেওয়া জায়েজ হবে। এ ছাড়া আরও বলা হয়, মুসলিমদের সেনাঘাঁটিতে তাদের রাখা যাবে না শত্রুদের সাথে আকিদাগত অভিন্নতার দরুন। অতিরিক্ত এই শর্তসহ কাফেরদের থেকে সহযোগিতা নিতে হলে মোট চারটি শর্ত প্রযোজ্য। তাহরিরুল আহকাম, পৃ. ৪৪২

অর্থাৎ এই নিষেধাজ্ঞা তখন আসবে যখন কাফেরদের থেকে সাহায্য নেওয়ায় ইসলাম ও মুসলিমের ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার, যদিও উল্লেখিত মাসআলাটি জিহাদে অংশগ্রহণসংশ্লিষ্ট, কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণের মৌলিক নীতিমালা এটিই। এ থেকে জানা গেল যে, বৈধ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে কাফেরদের থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে, তবে তা তখনই, যখন কাফের অনুসৃত হবে না; বরং অনুসারী হবে, এবং এর কারণে মুসলিমদের কোনো ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না। পক্ষান্তরে এ শর্তগুলোর কোনোটি যদি ছুটে যায়, তাহলে তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

বিদেশি এনজিও (সেবা-সংস্থা) থেকে সহায়তা নেওয়া

বর্তমানে অধিকাংশ অনৈসলামি দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রদত্ত 'উপহার-উপঢৌকন' সাধারণত ভয়ানক পরিকল্পনার অংশ হয়ে থাকে। তাদের উপহার-উপঢৌকনের দ্বারা কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা শাসককে সহযোগিতা বা সম্মান করা এবং উৎসাহ দেওয়া উদ্দেশ্য থাকে না, বরং এর মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা—মুসলিমদের বশীভূত করে রাখাই উদ্দেশ্য হয়। অন্যথায় কুফর ও ইসলামের মধ্যে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব এবং চলতে থাকা যুদ্ধসত্ত্বেও এ জাতীয় নিছক উপহারের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

প্রিয়ভূমি পাকিস্তান এবং অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কাজ করা বিভিন্ন বিদেশি এনজিও সম্পর্কে সাধারণত বলা হয় যে, এরা সাহায্য-সহযোগিতা, দারিদ্র্য-দুর্দশা বিমোচন এবং চিকিৎসার সুবিধার প্রতি গুরুত্ব দেয়। অথচ বাস্তবতা হলো এমন নানা ধরনের মুখোশ পড়ে তারা মুসলমানদের মাঝে মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি ও ভ্রান্ত আকিদা প্রচার করে বিভ্রান্ত করে থাকে এবং মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা আর বিশ্বাস পরিবর্তনের চেষ্টা করে। তারা পশ্চিমা ধ্যানধারণা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতিকে ইসলামি সমাজে ছড়িয়ে দেয়। অশ্লীলতা, নগ্নতা ও নির্লজ্জতার বৈধতার পক্ষে কাজ করে ও প্রচার করে। আর এসবই হয় তাদের তৈরি সুখী জীবনের বিভিন্ন মুখরোচক স্লোগানে ও আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তাদান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে।

তাই যেখানে এই ধরনের ঝুঁকির নিশ্চয়তা রয়েছে, কিংবা সন্তোষজনক মাধ্যমে এ সকল বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়, সেখানে এই ধরনের এনজিওর সাথে সম্পর্ক রাখা কিংবা তার সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

কাফেরকে দাওয়াত দেওয়া ও মেহমানদারি করা এবং তার সাথে একত্রে খাওয়াদাওয়া করা

যদি কোনো কাফের ইসলামি ভূখণ্ডের আইনকানুন মেনে চলে, তাহলে তাকে

এ থেকে রাজনৈতিক স্বার্থে কাফেরদের সাথে জোট করার বিধানটিও আশা করি স্পষ্ট হয়ে যাবে। উপরিউক্ত শর্তসাপেক্ষেই শুধু কাফেরদের সাথে রাজনৈতিক জোট করা জায়েজ হবে, অন্যথায় নয়। আল্লাহু আলাম। (আব্দুল্লাহ)

দাওয়াতে আমন্ত্রণ করা বৈধ, সে কোনো মুসলিমকে আমন্ত্রণ করতে চাইলে মুসলিমের জন্য তা গ্রহণ করার অনুমতি আছে। অনুরূপ সে যদি খানা খাওয়াতে চায়, তাহলেও অনুমতি আছে; তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত লক্ষ রাখা বাধ্যতামূলক—

প্রথম শর্ত : খানা হালাল হওয়া, যদি গোশত হয় তাহলে বৈধ পন্থায় জবাইকৃত হওয়া। 'আল-মুহিতুল বুরহানি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

> ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة، فإن ذبيحتهم حرام، قال عليه السلام : سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم. (المحيط البرهاني ٥/٣٦٢، كتاب الاستحسان و الكراهة، الفصل السادس عشر في معاملة أهل الذمة)
>
> অগ্নিপূজারিদের সকল খাবার খাওয়া যাবে, কেবল তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত ছাড়া। কারণ তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অগ্নিপূজকদের সাথে আহলে কিতাবদের মতোই আচরণ করো। তবে তাদের মহিলাদের বিয়ে করবে না এবং তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাবে না।[১১১]

দ্বিতীয় শর্ত : আমন্ত্রণটা কোনো জরুরত বা আত্মীয়তা ঠিক রাখা অথবা অন্য কোনো বৈধ উদ্দেশ্যে হতে হবে এবং তা মাঝেমধ্যে হতে হবে, নিয়মিত নয়। কেননা নিয়মিত হতে থাকলে তাদের সাথে অন্তরের মুহাব্বত হয়ে যাওয়ার একটি আশঙ্কা রয়েছে, যা শরিয়তে নিষিদ্ধ এবং তা আরও অসংখ্য অন্যায় কাজের মাধ্যম হয়ে যাবে। আল্লামা ইবনে মাজাহ বুখারি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬১৬ হি.) বিষয়টি উল্লেখ করেছেন,

> ولم يذكر محمد رحمه الله الأكل مع المجوسي ومع غيره من أهل الشرك أنه هل يحل أم لا، وحكي عن الحاكم عبد الرحمن الكاتب أنه إن ابتلي به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به، فأما الدوام عليه يكره؛ لأنا نهينا عن مخالطتهم وموالاتهم وتكثير سوادهم، وذلك لا يتحقق في الأكل مرة أو مرتين، إنما يتحقق بالدوام عليه. (المحيط البرهاني ٥/٣٦٢، كتاب الاستحسان و الكراهة، الفصل السادس عشر في معاملة أهل الذمة)
>
> মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ অগ্নিপূজক ও অন্যান্য মুশরিকদের সাথে খাওয়া বৈধ কি বৈধ না তা উল্লেখ করেননি। আর হাকিম আবদুর রহমান আল-কাতেব থেকে বর্ণিত আছে যে, মুসলমান এক বা দুইবার এর সম্মুখীন হলে তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু নিয়মিত এমনটি করা মাকরুহ; কারণ আমাদেরকে তাদের সাথে মিশতে, বন্ধুত্ব করতে এবং তাদের দল ভারী করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর দুয়েকবার খাওয়ার দ্বারা এমনটি সাধারণত হয় না, বরং

---

১১১. আল-মুহিতুল বুরহানি, ৫/৩৬২

বারবার ও নিয়মিত খেলেই হয়।[১১২]

থানবি রহ.-এর 'ইমদাদুল ফাতাওয়ায়' একটি প্রশ্ন ও তার জবাবে মাসআলাটি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো—

প্রশ্ন : কোনো খ্রিষ্টানের সাথে খানা খাওয়া যাবে কি না? যদি এক পাত্রে ও দস্তরখানে খেতে হয়, তাহলে তখন কী করতে হবে? একসাথে খাওয়ার সময় সাধারণত মিশতে হয়, তো তাদের সাথে মেলামেশা কি নিষিদ্ধ?

উত্তর : কাফেরদের সাথে অপ্রয়োজনে মেলামেশা ও সম্পর্ক রাখা নিষেধ, আর তাদের সাথে খানা খাওয়াও অপ্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।[১১৩]

মুফতি কিফায়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ইহুদি ও নাসারাদের সম্পর্কে লিখেছেন, অপ্রয়োজনে তাদের সাথে মেলামেশা করা এবং তাদের সাথে পানাহারের সম্পর্ক রাখা জায়েয নেই, কারণ এতে দ্বীনের ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে, হঠাৎ কখনো একসাথে খাওয়া হয়ে গেলে সমস্যা নেই।[১১৪]

তৃতীয় শর্ত : আমন্ত্রণে শরিয়তে নিষিদ্ধ কিছু থাকতে পারবে না। অতএব যদি আমন্ত্রণের কারণে আমন্ত্রণকারী বা আমন্ত্রিত মুসলিম কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ের সম্মুখীন হয় এবং এ ব্যাপারে সে পূর্ব থেকেই জানে, তাহলে এমন আমন্ত্রণের আয়োজন করা বা তা গ্রহণ করা অবৈধ। যেমন—

ক. কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ, অথবা তাদেরকে নিজের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া। কেননা এমন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাদের দাওয়াত দেওয়ার অর্থ তাদেরকে সম্মান করা। যা জায়েয নেই। ইসলামি আইনজ্ঞগণ তো জিম্মিদের সাথে মুসাফাহা করাও নিষেধ করেছেন, কেননা এতে তাদেরকে সম্মান করা হয়। আল্লামা ইবনে মাজাহ বুখারি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬১৬ হি.) লেখেন,

> ويكره مصافحة الذمي؛ لأن فيه توقير الذمي. (المحيط البرهاني ٥/٧٢٣، كتاب الاستحسان، الفصل الثامن في السلام، وتشميت العاطس)
>
> জিম্মির সাথে মুসাফাহা করা মাকরুহ। কেননা এতে জিম্মিকে সম্মান করা হয়।[১১৫]

খ. কোনো সাধারণ পার্থিব আমন্ত্রণে যাওয়া, যেখানে তারা প্রকাশ্যে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে।

---

১১২. আল-মুহিতুল বুরহানি, ৫/৩৬২

১১৩. ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৯/৪২৯, কিতাবুল হাযরি ওয়াল-ইবাহাত, বাবু মুআমালাতিল মুসলিমিন বি-আহলিল কিতাব ওয়াল-মুশরিকিন, শাব্বির আহমাদ কাসেমির তাহকিককৃত নুসখা

১১৪. কিফায়াতুল মুফতি, ১৩/১২৫, কিতাবুল হাযরি ওয়াল-ইবাহাত, বাবুল মুওয়ালাত মাআল কুফফার ওয়াল-ফাসাকাহ ফিসকাহ, ইদারাতুল ফারুক, করাচি

১১৫. আল-মুহিতুল বুরহানি, ৫/৩২৮

গ. এমন অনুষ্ঠান যেখানে নারী-পুরুষ একত্রে মিলিত হয়, কিংবা কোনো ভুল এজেন্ডা পূর্ণ করার জন্য পরিকল্পিত প্রোগ্রামসমূহে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'-তে উল্লেখিত আছে,

> وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي أن المجوسي إذا كان لا يزمزم فلا بأس بالأكل معه وإن كان يزمزم فلا يأكل معه لأنه يظهر الكفر والشرك ولا يأكل معه حال ما يظهر الكفر والشرك (الفتاوى الهندية ٧٤٣/٥، كتاب الكراهية الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم)

> ইমাম সুগদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, অগ্নিপূজক যদি খানা খাওয়ার সময় মুখ বন্ধ করে আওয়াজ না করে—মূলত মাজুসিরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসমতে মুখ বন্ধ রেখে একধরনের আওয়াজ করে থাকে—তাহলে তখন তার সাথে খাওয়া যাবে, আর যদি আওয়াজ করে তাহলে তার সাথে খাওয়া যাবে না; কেননা (এর দ্বারা) সে কুফর ও শিরক প্রদর্শন করে, আর এমতাবস্থায় তার সাথে খানা খাওয়া যাবে না।[১১৬]

শাহ আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১২৩৯ হি.)-এর দিকে সম্পৃক্ত 'ফাতাওয়ায়ে আজিজিয়্যা'-তে এমন বিষয়ক একটি প্রশ্নের বিশদ জবাব দেওয়া হয়েছে, যার সারাংশ হলো, কাফেদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা, তাদের সাথে বসে খাবার খাওয়ার মধ্যে যদি কোনো অবৈধ বিষয় সম্পৃক্ত থাকে, তাহলে এতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নেই। আর যদি এতে কোনো অবৈধ বিষয় না থাকে, তাহলে কদাচিৎ একবার খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু একে নিয়মিত রূপ দেওয়া মাকরুহ, কেননা তাদের সাথে মেশা ও হৃদ্যতা রাখা এবং তাদের দল ভারী করা অবৈধ।[১১৭]

জিম্মি কাফেরের জানমাল রক্ষার গুরুত্ব

কাফেরদের প্রতি ভালোবাসা ও মিত্রতার যে বিধানাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম কাফেরদের সাথে নিষ্ঠুরতা ও সহিংসতাকে উৎসাহিত করে বা কাফেরদের প্রতি অন্যায় ও খারাপ আচরণের সুযোগ দেয়। বরং বাস্তবতা হলো, যখন একজন অমুসলিম কোনো ইসলামি ভূখণ্ডের আইন মেনে সেখানে বসতি স্থাপন করে, তখন ইসলামধর্ম তার জানমাল, পাশাপাশি তার সম্মান ও মর্যাদার নিরাপত্তার স্বীকৃতি দেয়, সে খেলাফত বা ইমারতের জিম্মায় চলে আসে। তখন তাকে সাধারণ মুসলমানদের মতো দেশের একজন নাগরিক হিসাবে ইসলামের দেওয়া সকল বৈধ অধিকারের সুযোগ দেওয়া হয়। অনুরূপ শাসকের মতো সাধারণ মুসলিমদের ক্ষেত্রেও একই বিধান যে, তারা অমুসলিম নাগরিকদের সাথে ন্যায় ও নিষ্ঠার সাথে আচরণ করবে। কোনো নির্যাতন ও সহিংসতা এবং অন্যায় দেখাবে না।

১১৬. আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, ৫/৩৪৭

১১৭. ফাতাওয়ায়ে আযিযিয়্যাহ, পৃ. ৬১০

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. (سنن أبي داؤد برقم : ٣٠٥٢، كتاب الخراج والفيء والإمارة،باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات)

সাবধান! যে কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাবে অথবা তাকে অপদস্থ করবে কিংবা তার ওপর সাধ্যাতীত বিষয় চাপিয়ে দেবে অথবা তার থেকে তার অসন্তুষ্টিতে কিছু নেবে, কেয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হবো।[১১৮]

ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ তার সনদে অতিরিক্ত কিছু শব্দ বর্ণনা করেন,

ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا. (السسن الكبرى ٤٤٣/٩، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم، وما ورد من التشديد في ظلمهم وقتلهم)

চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিরাপত্তায়, তাকে কেউ হত্যা করলে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের সুঘ্রাণ নেওয়া হারাম করে দেবেন, অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।[১১৯]

এই বর্ণনাগুলোতে জিম্মি কাফেরের জানমাল এবং আবরু সংরক্ষিত ও নিরাপদ হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, আর এত কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যে, যে-কেউ তার সাথে নিষ্ঠুরতা ও সহিংসতা দেখাবে, কেয়ামতের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সে মুসলিমের বিপক্ষে বাদী হবেন। হত্যা করার ক্ষেত্রেও কঠিন হুমকি দিয়েছে যে, তার হত্যাকারী জান্নাতে তো যাবেই না, বরং সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

এসব বর্ণনার কারণে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, অকারণে কোনো জিম্মি কাফেরের উপর অসাধ্য বিষয় চাপিয়ে দেওয়া এবং তাদের হতাশ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও গোনাহের কাজ। যদি 'কাফের' শব্দে তাদের ডাকার কারণে তাদের কষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সে শব্দে ডাকা ঠিক নয়। আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে,

لو قال ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه. اهـ(البحر الرائق ٧٤/٥، كتاب الحدود، قذف مملوكا أو كافرا بالزنا أو مسلما بيا فاسق)

---

১১৮. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৩০৫২

১১৯. আস-সুনানুল কুবরা, ৯/৩৪৪

যদি কেউ কোনো (জিম্মি) ইহুদি অথবা অগ্নিপূজককে 'হে কাফের' বলে ডাকে, আর তাতে সে কষ্ট পায়, তাহলে মুসলমান গোনাহগার হবে।[১২০]

জিম্মির অধিকার খর্ব করা সংক্রান্ত একটি কথা

আল্লামা বিরকিবি রহিমাহুল্লাহ তার গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা 'জালাউল কুলুব'-এর মধ্যে আলোচনা করেন যে, কাফের এবং জানোয়ারের অধিকার খর্ব করা এবং তার ওপর নিষ্ঠুরতা ও সহিংসতা প্রদর্শন করা থেকে বিশেষভাবে বেঁচে থাকা জরুরি; কারণ সাধারণ নির্যাতিত মুসলমানদের ক্ষেত্রে তো এই সম্ভাবনা আছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা জালেমের কিছু নেকি দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে দেবেন এবং সে জালেমকে ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু কাফের এবং জানোয়ারের ক্ষেত্রে তো নেকির কোনো কার্যকারিতা নেই, কাফের সে নেয়ামত ভোগ করতে পারবে না, ফলত এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের হিসাব বহু কঠিন হবে যা অনেক ক্ষতির কারণ হবে।[১২১]

'ফাতাওয়ায়ে নাওয়াজেল' গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে,

الظلم على الذمي أشد من الظلم للمسلم، لأنه من أهل النار، فلا يرجى عفوه.
(فتاوى النوازل ص ٣٠٠، مسائل متفرقة)

মুসলমানের ওপর জুলুম করা থেকে কাফেরের ওপর জুলুম করা বেশি কঠোর হবে (কেয়ামতে)। কেননা জিম্মিরা জাহান্নামি হবে, ফলে (কেয়ামতের দিন সওয়াবের বিনিময়ে) তার থেকে ক্ষমা পাওয়ার কোনো আশাও থাকবে না।[১২২]

জিম্মিদের স্বতন্ত্র পোশাক

ইসলামি ভূখণ্ডে বসবাস করতে আগ্রহী কাফের ও মুসলমানদের মাঝে অবশ্যই কিছু পার্থক্যরেখা টেনে দেওয়া জরুরি। জীবনযাপনের যেকোনো বিষয়ে কিছু পার্থক্য থাকা জরুরি। এর অনেক যৌক্তিক কারণ রয়েছে। ইসলামি আইনের কিতাবসমূহে হজরত উমর ফারুক রা.-এর দিকে সম্পৃক্ত 'শুরুতে উমরিয়্যাহ' নামে জিম্মিদের সাথে একটি চুক্তির বিষয় উল্লেখ আছে। যেখানে কিছু ধারা এমন আছে যেগুলোতে স্পষ্টই মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে পার্থক্যের বিষয়টি উঠে এসেছে।

ইসলামি আইনজ্ঞগণ এই পার্থক্যের যৌক্তিকতার অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন, মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানকে সালাম দেওয়া একটি সুন্নত। কিন্তু অমুসলিমদের আগে বেড়ে সালাম দেওয়া বৈধ নয়। মৃত মুসলমানের গোসল ও দাফনের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে, তেমনই মৃত অমুসলিমেরও রয়েছে তাদের নিজেদের পদ্ধতি। এখন যদি কোনো পার্থক্যই না থাকে আর অনাকাঙ্ক্ষিত রাস্তায় কোনো

---

১২০. ৫/৪৭

১২১. জালাউল কুলুব, পৃ. ২০

১২২. ফাতাওয়ায়ে নাওয়াজেল পৃ. ৩০০

অপরিচিত লাশ পাওয়া যায়, তাহলে তাকে কোন পদ্ধতিতে গোসল ও দাফন দেওয়া হবে—ইসলামি রীতিনীতি অনুযায়ী না অন্য কোনো ধর্মের? বর্ণিত আছে, খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ একবার রাস্তা দিয়ে খুবই শানশওকতের সাথে অতিক্রম করা কিছু পথচারীকে দেখে আগে বেড়ে সালাম দিলেন। পাশে থাকা খাদেম বলল, মহামান্য খলিফা! আপনি কি জানেন এরা কারা? তিনি না-সূচক জবাব দিলে খাদেম বলল, এরা বনু তাগলিবের জিম্মি। এটা শুনে উমর বিন আবদুল আজিজ বললেন, জিম্মিদের উচিত চালচলনে কিছু পার্থক্য রাখা। যাতে এরকম ধোঁয়াশার সৃষ্টি না হয়।

ফকিহগণ জিম্মিদের পোশাকে পার্থক্য রাখার বিষয়টির কিছু কারণ ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে মৌলিক কারণ দুটি—

১. বেশ কিছু বিধানে মুসলমান ও জিম্মিদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পোশাকের পার্থক্য এজন্য জরুরি যে, যেন ওই বিধানসমূহ পালনে কোনো ধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্টি না হয়।

২. এর মধ্যে জিম্মিদের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা রয়েছে। আর এটা এজন্য জরুরি যে, কুফরের মতো জঘন্য অন্যায় করার পরও তারা ইসলামি ভূখণ্ডে শান্তিতে বসবাস করছে। এখন তারা যদি দাপট ও প্রতাপের সাথে থাকে, তাহলে দুর্বল ঈমানের মুসলমানরা কুফরের দিকে ধাবিত হয়ে যাবে, অথবা কুফরের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে, কিংবা কমে যাবে।

কিন্তু যে বিষয়টি বাহ্যত বুঝে আসে—

ক. পোশাকের এই পার্থক্যের মূল উদ্দেশ্য ও কারণ হলো যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি—উভয়ের বিধানগত পার্থক্যগুলো স্পষ্ট থাকা। হজরত উমর রা. কর্তৃক শর্তগুলো গভীর দৃষ্টিতে দেখলেও এই বিষয়টি আরও জোরালো হয়। এ ছাড়া অন্যান্য যে কারণগুলো উল্লেখ করা হয় সেগুলো মূল কারণ বা উদ্দেশ্য নয়। বরং সেগুলো হলো ফলাফল ও পরিণাম। হজরত উমর রা.-এর জিম্মিদের চুক্তির ধারাগুলো দেখলেও স্পষ্ট যে, সেখানে এতটুকু আছে যে, জিম্মিরা পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে পারবে না। আর তাতে শুধু উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে সাদৃশ্য সৃষ্টি না হওয়াই উদ্দেশ্য। লাঞ্ছনা বা অপদস্থতা উদ্দেশ্য নয়।[১২৩]

---

১২৩. এখানে সম্মানিত লেখক যা বলেছেন সে ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তির সুযোগ রয়েছে। বাস্তবতা হলো এসব বিধিবিধানের দ্বারা কাফেরদের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতাও উদ্দেশ্য। তারা কুফরির কারণে সম্মানের উপযুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দলিল হলো কুরআনে কারিম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

কিতাবিদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং শেষদিবসের প্রতিও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা-কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ সে চুক্তির একটি ধারা উল্লেখ করেন,

وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم. وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا. ولا ننقش خواتمنا بالعربية. (أحكام أهل الذمة ٣٧٢/٢، ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها، ط. دار ابن حزم)

আমরা (জিম্মিরা) যেখানেই থাকি নিজেদের বিশেষ বেশভূষা আঁকড়ে ধরব। আর মুসলমানদের সাথে টুপি, পাগড়ি, জুতা, চুলে সিঁথি করা, যানবাহনে আরোহণে সাদৃশ্য রাখব না। আমরা তাদের মতো করে কথাও বলব না

বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যাবৎ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া আদায় করে। সুরা তাওবা : ২৯

এই আয়াতের 'তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া আদায় করে' এই অংশের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

{وهم صاغرون} أي ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم... تفسير القرآن العظيم - ابن كثير (١٠/ ٧٤)

অর্থাৎ, তারা এমতাবস্থায় (জিজিয়া আদায় করবে যে তারা) অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও অপমানিত থাকবে। এজন্য জিম্মিদেরকে সম্মান করা জায়েজ নেই। মুসলিমদের ওপরে তাদেরকে মর্যাদা দেওয়াও জায়েয নেই। বরং তারা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত থাকবে... আর এই (লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করার) উদ্দেশ্যেই উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সেই প্রসিদ্ধ শর্তগুলো আরোপ করেছিলেন...। তাফসিরে ইবনে কাসির, ১০/৪৭

প্রিয় পাঠক, এই কিতাবেই আপনি দেখতে পাবেন, ইমাম ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, জিম্মিদের জন্য এ সকল বিধান তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করার জন্যই। তবে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার অর্থ তাদেরকে জুলুম করা নয় এবং সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া নয়। বরং কুফরের কারণে তার প্রাপ্যটুকুই দেওয়া হচ্ছে। হয়তো খেয়াল করে থাকবেন, লেখক স্বয়ং যে-সকল সূত্র উল্লেখ করেছেন সেগুলোতেও সুস্পষ্টভাবে জিম্মিদেরকে লাঞ্ছনা করার উদ্দেশ্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আবার মুসলিম ও জিম্মিদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্যেই এসব বিধান বিধিবদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং, উভয়টাই কারণ। এখানে শুধু একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। বাকি বক্তব্যগুলো লক্ষ করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন বিষয়টি।

لأن إذلالهم واجب بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه بل المراد اتصافه بهيئة وضيعة وكذا لو أمروا بالكستيجات. اهـ كمال. (حاشية الشلبي على التبيين، كتاب السير، باب العشر والخراج)

কেননা, তাদেরকে লাঞ্ছিত করা আবশ্যক। তবে আঘাত করা, থাপ্পড় দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া যাবে না। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের বেশভূষা ও চালচলন নিম্নমানের হওয়া। এমনইভাবে তাদের কোমরে (নিম্নমানের) কোমরবন্ধ পরতে বলার নির্দেশ দেওয়াটাও (এর অন্তর্ভুক্ত)। তাবয়িনুল হাকায়েক (সম্পাদক)

এবং তাদের মতো করে নিজেদের নামের উপাধিও রাখব না। আমরা মাথার সামনের অংশের চুল কেটে রাখব। আমরা পইতা বাঁধব এবং নিজেদের মোহরে আরবি ব্যবহার করব না।[১২৪]

খ. পার্থক্যের চিহ্নগুলো থাকার অর্থ এই নয় যে, তা জিম্মিদের ওপর জুলুম ও অত্যাচার। বরং মুসলমান ও অমুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মাঝে একটি পার্থক্যরেখা রাখা। যাতে প্রত্যেকের হক যথাযথভাবে আদায় করা যায়।

গ. আমাদের ফকিহগণ পার্থক্যের যে বিবরণগুলো দিয়েছেন ও যে-সকল চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, বর্তমান সময়ে তার অনেকগুলোর ব্যাপক প্রচলন নেই। আর বর্তমানে পার্থক্যের জন্য সেগুলো যথেষ্টও নয়। যেমন, জিম্মিরা ঘোড়ায় চড়তে পারবে না, গাধায় বা খচ্চরে চড়বে। অথচ বর্তমানে পশুর যানবাহনের প্রচলন নেই। ফকিহদের বর্ণনার ভিন্নতা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, এই সকল বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে পার্থক্যের একটি সীমারেখা বজায় রাখা। আর সেই উদ্দেশ্য অর্জন স্থান, কাল ও সময়ভেদে বিভিন্ন হতে পারে। তবে সর্বাবস্থায় মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ করা জরুরি।

(ويميز الذمي عنا في الزي والمركب والسرج فلا يركب خيلا ولا يعمل بالسلاح ويظهر الكستيج ويركب سرجا كالإكاف) إظهارا للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسلمين يقينا لأن من هو ضعيف اليقين إذا رآهم يتقلبون في النعم والمسلمين في محنة وشدة يخاف أن يميل إلى دينهم وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى {ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة} [الزخرف : ٣٣] الآية وحكاية قارون مع الضعفة من قوم موسى عليه السلام معروفة ظاهرة ولأن المسلم يوقر والذمي يحقر ويضيق عليه الطريق ولا يبدأ بالسلام فلو لم يكن له علامة يميز بها لما وقع التفرقة بينهما فيعامل معاملة المسلمين وأول من أخذ أهل الذمة بالعلامة عمر رضي الله عنه لكثرة الناس في أيامه فرأى أنه لم تقع التفرقة بين المسلم والكافر إلا بالعلامة. (تبيين الحقائق، كتاب السير، باب العشر و الخراج)

জিম্মিরা আমাদের থেকে পোশাক-আশাক, যানবাহন ও (ঘোড়ায় চড়ার) জিনের মাঝে পার্থক্য রাখবে। তারা ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতে পারবে না। অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। (দড়ির তৈরি একজাতীয় বিশেষ) কোমরবন্ধনী প্রকাশ করতে হবে। পশুতে আরোহণের সময় এমন জিন ব্যবহার করবে যা খাটের মতো দেখতে। যেন তাদের হীনতা প্রকাশ পায় এবং দুর্বলচিত্তের মুসলমানদের রক্ষা হয়। কেননা এই দুর্বল ঈমানদাররা

১২৪. আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ২/২৭৩

যখন কাফেরদের প্রফুল্ল ও বিলাসী জীবনযাপন দেখবে আর নিজেদের দরিদ্রতা আর কষ্ট দেখবে, তখন আশঙ্কা রয়েছে তাদের ধর্মের প্রতি এরা ঝুঁকে যাবে। আর আল্লাহ এই দিকে ইশারা করে বলেন,

وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ.

সকল মানুষ একই মতাবলম্বী হয়ে যাবে, এই আশঙ্কা যদি না থাকত, তবে যারা রহমানকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে তাদের ঘরের জন্য দিয়ে দিতাম রুপার ছাদ এবং রুপার সিঁড়ি, যার ওপর তারা আরোহণ করত।[১২৫]

মুসা আ.-এর দুর্বল ঈমানের অধিকারী উম্মতের কারুনের সাথে ঘটা ঘটনা এই বিষয়ে বেশ প্রসিদ্ধ। আর এজন্যই মুসলমানদের সম্মান করা হবে এবং অমুসলিমদের অবজ্ঞা করা হবে। তাদেরকে আগে বেড়ে সালাম দেওয়া হবে না। তাদের রাস্তা সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে। আর যদি জিম্মিদের মাঝে এমন কোনো আলামত বা চিহ্ন না থাকে, যার মাঝে তাদেরকে মুসলিম থেকে পার্থক্য করা যায়, তাহলে তাদের সাথেও মুসলমানদের মতোই আচরণ করা হয়ে যাবে। প্রথমে জিম্মিদেরকে আলাদা চিহ্ন ধারণ করার আদেশ হজরত উমর রা. দিয়েছেন। কেননা, তার জামানায় লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং নির্দিষ্ট চিহ্ন ছাড়া মুসলিম এবং কাফেরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা যাচ্ছিল না।[১২৬]

আল্লামা শিলবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১০২১ হি.) লেখেন,

وحاصل هذا أن أهل الذمة لما كانوا مخالطين لأهل الإسلام فلا بد مما يتميز به المسلم من الكافر كي لا يعامل معاملة المسلم من التوقير والإجلال وذلك لا يجوز وإذ وجب التمييز وجب أن يكون فيه صغار لا إعزاز لأن إذلالهم واجب بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه بل المراد اتصافه بهيئة وضيعة وكذا لو أمروا بالكستيجات. اهـ كمال. (حاشية الشلبي على التبيين، كتاب السير، باب العشر و الخراج)

মোটকথা, জিম্মিরা যখন মুসলমানদের সাথে একত্রে বসবাস করবে, তখন মুসলমান আর কাফেরের মাঝে পার্থক্য থাকা জরুরি। যাতে তাদেরকে মুসলমানদের মতো সম্মান না করা হয়। কেননা তা নাজায়েজ। আর যখন পার্থক্য জরুরি তখন এই পার্থক্যের মাঝে হীনতা ও অপদস্থতা থাকা আবশ্যক। কেননা, তাদেরকে কোনোরূপ কষ্ট দেওয়া ছাড়া হীনতার সাথে রাখা আবশ্যক। কেননা, তাদেরকে লাঞ্ছিত করা আবশ্যক। তবে আঘাত

১২৫. সুরা যুখরুফ : ৩৩
১২৬. তাবয়িনুল হাকায়েক ৩/২৮০

করা, থাপ্পড় দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া যাবে না। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের বেশভূষা ও চালচলন নিম্নমানের হওয়া। এমনইভাবে তাদের কোমরে (নিম্নমানের) কোমরবন্ধ পরতে বলার নির্দেশ দেওয়াটাও (এর অন্তর্ভুক্ত)।[১২৭]

আল্লামা ইবনে মাজাহ বুখারি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬১৬ হি.) লেখেন,

ولأنهم من أهل الصغار، والمسلمون من أهل العز، فيجب إظهار المخالفة في الزي، والهيئة ليقع التميز بيننا وبينهم، فلا يذل المسلم، ولا يعز الكافر، ولأنا نهينا عن بدايتهم بالسلام والتحية. قال الله تعالى : {لا تتخذوا عدوي} إلى قوله : {تلقون إليهم بالمودة} (الممتحنة : ١)، فلا بد من علانية يعرفهم كيلا يحسبهم مسلمين، فيبدأهم بالتحية، ويمنعون عن ركوب الفرس؛ لأنه من باب العز، وهم من أهل الصغار، فيمنعون عنه إلا إذا وقعت الحاجة إلى ذلك بأن استعان بهم الإمام في المحاربة، والذب عن المسلمين، هكذا ذكر شيخ الإسلام. (المحيط البرهاني، كتاب الخراج، فصل في المتفرقات)

জিম্মিরা হলো অসম্মানিত আর মুসলমানরা হলো সম্মানিত। তাই উভয়ের মাঝে পোশাক-পরিচ্ছদে পার্থক্য প্রকাশ করা আবশ্যক। যাতে উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট থাকে। ফলে মুসলিমকে হীন করা হবে না এবং কাফেরকে সম্মান করা হবে না। আর তা এই কারণে যে, আমাদের তাদেরকে প্রথমে সালাম দিতে ও দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সুরা মুমতাহিনার প্রথম আয়াতে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন। তাই এমন স্পষ্ট আলামত তাদের মাঝে থাকা জরুরি যাতে তাদের মুসলমান মনে করে প্রথমে সালাম না দেওয়া হয়। তাদেরকে ঘোড়ায় আরোহণ করতে নিষেধ করা হবে, কেননা এটাও একটা সম্মানের বিষয়, অথচ জিম্মিরা হলো অপদস্থ সম্প্রদায়। তবে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে, যেমন মুসলিম খলিফা বা শাসক মুসলমানের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধে তাদের সহযোগিতা নিয়েছে, তখন তারা ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারবে।[১২৮]

ইমাম কাসানি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৫৮৭ হি.) বলেন,

(وأما) بيان ما يؤخذ به أهل الذمة، وما يتعرض له وما لا يتعرض فنقول - وبالله التوفيق : إن أهل الذمة يؤخذون بإظهار علامات يعرفون بها، ولا يتركون يتشبهون بالمسلمين في لباسهم ومركبهم وهيئتهم... والأصل فيه ما روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مر على رجال ركوب ذوي هيئة فظنهم مسلمين

---

১২৭. হাশিয়াতুশ শিলবি আলাত তাবয়িন, ৩/২৮০

১২৮. আল-মুহিতুল বুরহানি, ৩/৩৫৮

فسلم عليهم، فقال له رجل من أصحابه : أصلحك الله، تدري من هؤلاء؟ فقال : من هم؟ فقال : هؤلاء نصارى بني تغلب فلما أتى منزله أمر أن ينادي في الناس أن لا يبقى نصراني إلا عقد ناصيته، وركب الإكاف.

ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون كالإجماع، ولأن السلام من شعائر الإسلام فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه الشعائر عند الالتقاء، ولا يمكنهم ذلك إلا بتمييز أهل الذمة بالعلامة، ولأن في إظهار هذه العلامات إظهار آثار الذلة عليهم، وفيه صيانة عقائد ضعفة المسلمين عن التغيير على ما قال سبحانه وتعالى {ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون} [الزخرف : ٣٣]. (بدائع الصنائع ٣١١/٧، كتاب السير، فصل في بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال)

অবশ্যই জিম্মিদের এমন আলামত ও চিহ্ন ধারণ করার জন্য বাধ্য করা হবে, যার মাধ্যমে তাদের আলাদা পরিচয় স্পষ্ট হয়। তারা মুসলমানদের বেশভূষা, যানবাহন ও আকার-আকৃতি ধারণ করলে তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখা হবে। ...এ ক্ষেত্রে (একটি) মৌলিক দলিল হলো, উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, একবার তিনি রাস্তা দিয়ে একদল আরোহী লোকের আকৃতি দেখে মুসলিম মনে করে আগ বেড়ে সালাম দেন। তার সাথে থাকা একজন বললেন, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করে দিক! আপনি কি জানেন এরা কারা? উমর বিন আবদুল আজিজ বললেন, এরা কারা ছিল? সাথে থাকা লোকটি বলল, এরা বনু তাগলিবের খ্রিষ্টান। উমর বিন আবদুল আজিজ এই ঘটনার পর নিজ অবস্থানে ফিরে এসে ফরমান জারি করেন, আজ থেকে সকল খ্রিষ্টান যেন বাধ্যতামূলকভাবে মাথার সামনের ঝুঁটি বেঁধে রাখে এবং গাধায় আরোহণ করে।

হজরত উমর বিন আবদুল আজিজের এই হুকুমের ওপর কেউ আপত্তি জানায়নি। সে হিসাবে এটা একধরনের ইজমা (ঐকমত্যপূর্ণ মাসআলা)।

আর তা এজন্যও যে, সালাম ইসলামের একটি শিয়ার বা প্রতীক। মুসলমানরা পরস্পর মিলিত হলে এই শিয়ার প্রকাশ করে থাকে। জিম্মিদের কোনো চিহ্নের মাধ্যমে পার্থক্য করা না গেলে মুসলমানদের জন্য এই শিয়ার প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ ধরনের আলামতগুলো প্রকাশের দ্বারা জিম্মিদের হীনতাও প্রকাশ করা যায়। তাতে দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুমিনদের ঈমান-আকিদা রক্ষা করা যায়। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন,

وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا

مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ.

সকল মানুষ একই মতাবলম্বী হয়ে যাবে, এই আশঙ্কা যদি না থাকত, তবে যারা রহমানকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে তাদের ঘরের জন্য দিয়ে দিতাম রুপার ছাদ এবং রুপার সিঁড়ি, যার ওপর তারা আরোহণ করত।[১২৯], [১৩০]

ইমাম শামি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১২৫২ হি.) ফাতহুল কাদির গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে লেখেন,

حاصله : أنهم لما كانوا مخالطين أهل الإسلام، فلا بد من تمييزهم عنا كي لا يعامل معاملة المسلم من التوقير والإجلال، وذلك لا يجوز وربما يموت أحدهم فجأة في الطريق ولا يعرف فيصلى عليه، وإذا وجب التمييز وجب أن يكون بما فيه صغار لا إعزاز لأن إذلالهم لازم بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه بل المراد اتصافه بهيئة وضيعة فتح. (ردالمحتار، كتاب الجهاد، مطلب في تمييز أهل الذمة في الملبس)

সারকথা হলো, যখন জিম্মিরা মুসলমানদের সাথে একত্রে থাকবে, তখন তাদের জন্য কিছু পার্থক্য থাকা জরুরি। যাতে তাদেরকে মুসলমানদের মতো ইজ্জত ও সম্মান না করা হয়। কখনো হঠাৎ যদি তাদের কারও মৃত্যু হয়ে যায়, আর এই সম্ভাবনা থাকে যে তার পরিচয় না পাওয়া যাওয়ার কারণে মুসলমানরা তার জানাজা পড়ে ফেলবে! পার্থক্য যখন আবশ্যকই, তখন এমন কিছু দিয়েই পার্থক্য হতে হবে, যেখানে তাদের হীনতা প্রকাশ হয়, সম্মান প্রকাশ না হয়। কেননা তাদেরকে কোনোরূপ কষ্ট দেওয়া ছাড়া হীনতার সাথে রাখা জরুরি। মোটকথা, উদ্দেশ্য হলো, জিম্মিদের নির্দিষ্ট বেশভূষাই ধারণ করতে হবে।[১৩১]

---

১২৯. সুরা যুখরুফ : ৩৩

১৩০. বাদায়েউস সানায়ে, ৭/১১৩

১৩১. ফাতাওয়ায়ে শামি, ২/২০৬

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনীতি, চিকিৎসা, অভিবাসন

- কাফেরদের সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক
- কাফেরদের শাসনকার্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করানো
- একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা
- কাফেরদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা
- কাফেরদের রাষ্ট্রে যাওয়া ও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা

কাফেরদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক

অমুসলিমদের সাথে বেচাকেনা এবং লেনদেনের সম্পর্ক; এ ক্ষেত্রে মূলত মুসলিম ও কাফেরের মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। মুসলিমদের সাথে যে ধরনের লেনদেন করা বৈধ সেগুলো কাফেরদের (মুসলিম ভূখণ্ডের জিম্মি) সাথেও করা যাবে; কারণ হাদিসের কিতাবগুলোতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের থেকে মদিনায় স্থানীয় ইহুদিদের সাথে বেচাকেনা, ভাড়া, আরিয়াত (ধার দেওয়া), ঋণ এবং বন্ধক ইত্যাদি লেনদেন সাব্যস্ত রয়েছে।

তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি যত্নশীল হওয়া জরুরি—

ক. লেনদেনের আড়ালে স্বতন্ত্র বন্ধুত্ব, মুহাব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়া যাবে না; কারণ কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য নসের (টেক্সটের) মধ্যে এর পরিষ্কার নিষিদ্ধতা ঘোষণা করা হয়েছে, যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

খ. এর মাধ্যমে মুসলিমদের দ্বীনি এবং পার্থিব কোনো ক্ষতি হতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো অনুসরণীয় ব্যক্তি যদি তাদের সাথে বাধাহীন লেনদেন করে এবং এর কারণে এই আশঙ্কা হয় যে, এমন ব্যক্তির এসব কর্মকাণ্ড দেখে সাধারণ মুসলিমদের মন ও মগজ থেকে কুফর ও ইসলামের পার্থক্যরেখা উঠে যাবে, কিংবা 'মুসলিম-কাফের' পার্থক্যের যে চেতনা তা হালকা হয়ে যাবে, মানুষেরা শরিয়তের সীমারেখায় ভ্রুক্ষেপ না করেই লেনদেন শুরু করে দেবে। অথবা অনুসরণীয় ব্যক্তির এই সম্পর্ক ভিত্তি করে কাফের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মুসলিমদের মাঝে তাদের ধর্মীয় অথবা কোনো দুরভিসন্ধিমূলক এজেন্ডা বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়ে যাবে—উপরিউক্ত এমন কোনো সম্ভাবনার ব্যাপারে নিশ্চিত জানা গেলে বা প্রবল ধারণা তৈরি হলে জায়েয লেনদেন থেকেও কাফেরদের সাথে যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে।

শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৩৩৯ হি.) লেখেন, কাফেরদের সাথে 'মুওয়ালাত' (বন্ধুত্ব) আর 'মুআমালাত' (লেনদেন) দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। কুরআনে মুওয়ালাত থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুওয়ালাতের বিষয়ে আমি বলব, হ্যাঁ, মর্মের বিবেচনায় মুআমালাত ও মুওয়ালাতের মাঝে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু মুওয়ালাত শব্দটি আভিধানিক অর্থের কারণে তার মর্মের মধ্যে নৈকট্যসংক্রান্ত এবং পারস্পরিক সাহায্যের যত সম্পর্ক রয়েছে সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং প্রত্যেক ওই মুআমালা যার কারণে দুশমনের সাথে সম্পর্ক ও ঐক্য বৃদ্ধি পায়, তাদের সাথে শত্রুতার শক্তি বৃদ্ধি করে না, এমন সকল সম্পর্ক (যেমন সেনাবাহিনীর চাকরি ইত্যাদি) যা মুসলমানদের ধ্বংস এবং প্রতাপ ও শক্তিকে মিটিয়ে দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, এমন সম্পর্ক যার কারণে শত্রুদের এই সুযোগ তৈরি হয় যে, তারা ভাবে মুসলমানরা আমাদের ওপর সন্তুষ্ট, এমন সকল সম্পর্ক যার ফলে তাদের সাথে ভালোবাসা ও প্রীতির প্রকাশ হয়, তা সরাসরি হোক বা মাধ্যমে হোক, এই সবটাই শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ মুওয়ালাতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সাহাবি হজরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআ রা.-এর ঘটনা গভীরভাবে দেখলে এবং হজরত উমর ফারুক রা.-এর ঈমানি দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ আর সৃষ্টি হবে না।[১৩২]

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে রয়েছে,

> يكره للمشهور المقتدى به الاختلاط إلى رجل من أهل الباطل والشر إلا بقدر الضرورة لأنه يعظم أمره بين أيدي الناس ولو كان رجلا لا يعرف يداريه ليدفع الظلم عن نفسه من غير إثم فلا بأس به كذا في الملتقط. (الفتاوى الهندية ٦٤٣/٥، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم)
>
> অনুসরণীয় বিখ্যাত ব্যক্তির জন্য বিভ্রান্ত ও পাপাচারী লোকদের সাথে প্রয়জনের বেশি মেশা মাকরুহ, কারণ তার বিষয়টা মানুষের মাঝে বিরাট রূপ ধারণ করবে। আর যদি অপরিচিত কোনো ব্যক্তি হয়, যে নিজ দায় থেকে কোনো ধরনের গোনাহ ছাড়া এমন ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক রাখে, সে ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই।[১৩৩]

'কোনো বৈধ বিষয় থেকে মানুষের মাঝে অবৈধ কোনো ভুল ধারণা বা আমল তৈরি হয়ে যাওয়া' বিষটিকে ফুকাহায়ে কেরাম খুব গুরুত্বের সাথে দেখেন এবং এর ওপর ভিত্তি করে অনেকগুলো শাখাগত মাসআলা উল্লেখ করেন, 'হেদায়া' গ্রন্থকার এই ধরনের একটি মাসআলা আলোচনা করেছেন,

> قال : ويكره استخدام الخصيان؛ لأن الرغبة في استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع وهو مثلة محرمة. (الهداية مع الفتح ٣٦/١٠، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة)
>
> অণ্ডকোষ কর্তনকারী খাসি লোকদের খেদমত নেওয়া মাকরুহ; কেননা তাদের থেকে খেদমত নেওয়া মানুষকে এই কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, অথচ এটি হারাম দেহবিকৃতি ও হারাম।[১৩৪]

আল্লামা ইবনে মাওদুদ মাওসিলি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬৮৩ হি.) বলেন,

> (ويكره استخدام الخصيان) لأنه تحريض على الخصاء المنهي عنه لكونه مثلة. (الإختيار لتعليل المختار ٣٦١/٤، كتاب الكراهية، مسائل مختلفة)
>
> অণ্ডকোষ কর্তনকারী লোকদের থেকে খেদমত নেওয়া মাকরুহ; কারণ এটি

---

১৩২. খুতবাতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, পৃ. ৬৮

১৩৩. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৪৬

১৩৪. হেদায়া, ৪/৩৮০

খাসি হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, যা দেহবিকৃতি হওয়ায় নিষিদ্ধ।[১৩৫]

এ থেকে বোঝা যায়, কোনো একটি কাজ স্বাভাবিক অবস্থায় যদিও জায়েয হয়, কিন্তু এর কারণে যদি সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে গোনাহ করার আকাঙ্ক্ষা ও দুঃসাহস জন্মায়, তাহলে এমন শঙ্কার কারণে জায়েয কাজও মাকরুহ হয়ে যায়।

গ. উক্ত লেনদেনের কারণে কাফেরদের কোনো অবৈধ বিষয়ের সমর্থন বা সাহায্যের দিক থাকতে পারবে না। তাই যে কাফের মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত আছে, তাদের নিকট অস্ত্র বিক্রি করা বৈধ নয়; কারণ এতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে একধরনের সহায়তা করা হয়।

শরহুস সিয়ারিল কাবিরে উল্লেখ রয়েছে,

ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك، إلا السلاح والكراع، والسبي سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان. (شرح السير الكبير ص ١٢٣٧، باب هدية أهل الحرب)

মুসলিমরা মুশরিকদের নিকট খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি জাতীয় বস্তু বিক্রি করতে পারবে। তবে অস্ত্র, ঘোড়া (বাহন) এবং বন্দি ব্যক্তিকে বিক্রি করতে পারবে না। চাই সে আমান নিয়ে আসুক বা আমান ছাড়া আসুক।[১৩৬]

ঘ. লেনদেন কোনো হারাম বিষয়ের হতে পারবে না।

'উমদাতুল কারি'-তে উল্লেখ রয়েছে,

وَقَالَ الْمُهلب : كره أهل الْعلم ذَلِك إِلَّا للضَّرُورَة بِشَرْطَيْنِ : أَحدهمَا : أَن يكون عمله فِيمَا يحل للْمُسلم، وَالْآخر : أَن لَا يُعينهُ على مَا هُوَ ضَرَر على الْمُسلمين، وَقَالَ ابْن الْمُنِير : اسْتَقَرَّتْ الْمذَاهب على أَن الصناع فِي حوانيتهم يجوز لَهُم الْعَمَل لأهل الذِّمَّة، وَلَا يعْتد ذَلِك من الذلة، بِخِلَاف أَن يَخْدمه فِي منزله وبطريق التَّبعِيَّة لَهُ. (عمدة القاري ٤٩/٢١، كتاب الإجارة، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب)

মুহাল্লাব রহিমাহুল্লাহ বলেন, আহলে ইলমরা অমুসলিমদের সাথে লেনদেন দুই শর্তে জায়েয বলেছেন, এক. তার কাজটা এমন হতে হবে যেটি করা মুসলিমদের জন্য বৈধ। দুই. অমুসলিমদের এমন কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা না করা, যে ক্ষেত্রে মুসলিমদের ক্ষতি হয়। ইবনে মুনির রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল মাজহাব একমত যে, মুসলিম কারিগর তার দোকানে জিম্মিদের কাজ করতে পারবে, এতে লাঞ্ছনা নেই। তবে সে (মুসলিম) তার (কাফেরের)

---

১৩৫. আল-ইখতিয়ার লি-তা'লিল মুখতার, ৪/১৬৩

১৩৬. শরহুস সিয়ারিল কাবির, পৃ. ১২৩৭

গৃহে এবং অধীনস্থ হয়ে কাজ করার অনুমতি নেই।[১৩৭]

কাফেরদেরকে দেশের কোনো উচ্চ পদে নিযুক্ত করা

ইসলামি ভূখণ্ডে অমুসলিমদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চতর বিষয়ে অংশীদার বানানো, তাদেরকে মুসলিমদের বিষয়ের কর্তৃত্বকারী ও সিদ্ধান্তদাতা বানানো জায়েয নেই। কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَٰتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের লোকদের ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ো না। ওরা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোনো ত্রুটি করে না। ওরা মনে-প্রাণে কামনা করে, তোমরা কষ্ট ভোগ করো। ওদের মুখ থেকে শত্রুতা প্রকাশ হয়ে পড়ে, আর ওদের অন্তর যা (অর্থাৎ যে শত্রুতা) গোপন রাখে, তা আরও গুরুতর। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাদি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলাম, যদি তোমরা বুদ্ধি রাখো।[১৩৮]

ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন,

وفي هذه الآية دلالة على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة.(أحكام القرآن ٢/٧٤، باب الاستعانة بأهل الذمة، دار الكتب العلمية)

উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমদের শাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন গভর্নর কেরানি ইত্যাদি পদে জিম্মিদের থেকে সাহায্য নেয়া জায়েয নেই।[১৩৯]

এরপর তিনি উল্লেখ করেন যে, আবু মুসা আশআরি রা. লেখায় পারদর্শী এক জিম্মি কাফেরকে তাঁর লেখার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। উমর রা. এ ব্যাপারে জানতে পারলে তাকে (আবু মুসা আশআরি রা.) নিষেধ করে দেন, আর নিষেধ করার ক্ষেত্রে তিনি উক্ত আয়াতটি দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন। এভাবে (আরেকটি ঘটনা রয়েছে যে,) কেউ একজন কোনো এক জিম্মি কাফের সম্পর্কে উমর রা.-এর কাছে সুপারিশ করল যে, সে তো বড় সংরক্ষক এবং দক্ষ লোক, সে এই কাজের জন্য যথেষ্ট যোগ্য। তখন উমর রা. তার কথা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, তাকে এই কাজে নিযুক্ত করা এই আয়াতের বিরোধী।

---

১৩৭. উমদাতুল কারি, ১২/৯৪

১৩৮. সূরা আলে ইমরান : ১১৮

১৩৯. আহকামুল কুরআন, ২/৪৭

ওসকে রুমি বলেন, আমি উমর রা.-এর গোলাম ছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি ইসলাম কবুল করলে আমি তোমাকে মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয়ে কাজে লাগাব (কাফের থাকলে কাজে লাগাব না)। কারণ এটি কারও দৃষ্টিতেই সঠিক হবে না যে, আমি অমুসলিমকে মুসলিমদের দায়িত্বশীল ও সিদ্ধান্তদাতা বানাব। তখন আমি ইসলাম কবুল না করলে তিনি আমাকে তার মৃত্যু পর্যন্ত কোনো দায়িত্ব দেননি, বরং মৃত্যুর পূর্বে আমাকে স্বাধীন করে বলেন, যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারো।

আল্লামা কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬৭১ হি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন,

> نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء، يفاوضونهم في الآراء، ويسندون إليهم أمورهم. (تفسير القرطبي ٨٧١/٤، تحت سورة آل عمران : آية ٨١١)
>
> আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে কাফের ইহুদি ও বিদআতিদেরকে এমন ঘনিষ্ঠ ও আপনজন বানাতে নিষেধ করেছেন, যাদের সাথে বিভিন্ন মতামত বিনিময় করা হবে এবং যাদের কাছে মুসলিমদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেড়ে দেওয়া হবে।[১৪০]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১১৭৬ হি.) 'ইজালাতুল খফা' গ্রন্থে 'শাসকের আবশ্যকীয় দায়িত্ব'-সংক্রান্ত অধ্যায়ে লেখেন, মুসলিম শাসকের জন্য এটাও একটি ওয়াজিব দায়িত্ব যে, মুসলমানদের কোনো দায়িত্ব বা পদ কোনো কাফেরকে নিযুক্ত করবেন না। হজরত উমর রা. এই বিষয়ে কঠোরতার সাথে নিষেধ করেছেন।[১৪১]

একটি জরুরি সতর্কবার্তা

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট কী? এবং তা কাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে? এ নিয়ে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত রয়েছে, কেউ বলেছেন, আয়াতটি মূলত মদিনার ইহুদিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম তাদের সাথে দুনিয়াবি বিষয়ে পরামর্শ করতেন এবং এ ধারণা রাখতেন যে, ধর্মের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা অন্তত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য দুনিয়াবি বিষয়ে আমাদের সাথে একনিষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের বাস্তব অবস্থা জানিয়ে মুসলিমদের নিষেধ করেছেন। কিছু মুফাসসির বলেন, আয়াতটি মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ মুসলিমরা তাদের কথায় আস্থা রাখে এবং তাদের হিতৈষী মনে করে, তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে ইত্যাদি।

মোটকথা, অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, গ্রহণযোগ্য মত হলো,

---

১৪০. তাফসিরে কুরতুবি, ৪/১৭৮

১৪১. ইজালাতুল খফার উদ্ধৃতিতে আকায়েদে ইসলাম, পৃ. ২১৫

আয়াতের বাণী ব্যাপক এবং এতে সকল কাফেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাফেরকে—চাই সে ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, মুশরিক অথবা নাস্তিক ইত্যাদি যাই হোক—মুসলমানদের কোনো বিষয়ের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা, অনুরূপ তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব তৈরি হয় ইসলামি দেশে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া শরিয়তে জায়েজ নেই। একইভাবে তাদেরকে মুসলিমদের ধর্মীয় কোনো কাজে নিযুক্ত করা, যেমন ফাতাওয়া প্রদান, বিচারকার্য পরিচালনা ইত্যাদি শরিয়তে নাজায়েজ। যদি অন্তরে কুফর রেখে কেউ তার কুফরকে ইসলামের চাদরে ঢেকে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, যেমনটি আমাদের মধ্যে কাদিয়ানি ও কুফরি আকিদা লালনকারী শিয়াদের অবস্থা, তাহলে তার বিধান কাফেরের চেয়েও কঠিন।

আল্লামা আলুসি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১২৭০ হি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

> والمعنى لا تَتَّخِذُوا الكافرين كاليهود والمنافقين أولياء وخواص من غير المؤمنين أو ممن لم تبلغ منزلته، منزلتكم في الشرف والديانة، والحكم عام وإن كان سبب النزول خاصا فإن اتخاذ المخالف وليا مظنة الفتنة والفساد.
>
> আয়াতের অর্থ হলো, মুসলিমদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু এবং অন্তরঙ্গ বানাবে না, সে ইহুদি হোক কিংবা মুনাফিক, অথবা এমনসব লোক যারা মর্যাদা ও দ্বীনদারির দিক থেকে তোমাদের পর্যায়ে পৌঁছেনি। এটি একটি ব্যাপক বিধান। যদিও উল্লেখিত আয়াতের প্রেক্ষাপট নির্দিষ্ট। কারণ বিরোধী ব্যক্তিকে বন্ধু বানালে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা প্রবল থাকে।[১৪২]

আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬০৬ হি.) এই মতকে প্রাধান্য দিয়ে লেখেন,

> وأما ما تمسكوا به من أن ما بعد الآية مختص بالمنافقين فهذا لا يمنع عموم أول الآية، فإنه ثبت في أصول الفقه أن أول الآية إذا كان عاما وآخرها إذا كان خاصا لم يكن خصوص آخر الآية مانعا من عموم أولها. (التفسير الكبير ٩٣٣/٨، تحت سورة آل عمران : آية ٨١١)
>
> ফিকহের একটি স্বীকৃত মূলনীতি হলো, যদি আয়াতের প্রথম অংশ ব্যাপক হয় এবং শেষ অংশ নির্দিষ্ট হয়, তাহলে তা প্রথম অংশের ব্যাপকতার মাঝে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না।[১৪৩]

প্রসিদ্ধ হানাফি আইনবেত্তা ইমাম কাসানি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৫৮৭ হি.) বিচারক পদসংক্রান্ত বিষয়ে লেখেন যে, ইসলামি শাসনে বিচারক হওয়ার জন্য শর্ত হলো, আকেল, বালেগ, মুসলমান ইত্যাদি হওয়া। এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন,

১৪২. রুহুল মাআনি, ২/২৫৩

১৪৩. তাফসিরে কাবির, ৮/৩৩৯

لأن القضاء من باب الولاية، بل هو أعظم الولايات، وهؤلاء ليست لهم أهلية أدنى الولايات - وهي الشهادة - فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى. (بدائع الصنائع ٣/٧، كتاب آداب القضاء، فصل في بيان من يفترض عليه قبول تقليد القضاء)

বিচারকের পদ একটি কর্তৃত্বের বিষয়, বরং এটা অনেক বড় পর্যায়ের কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত আর জিম্মিদের যেহেতু কর্তৃত্বের নিম্নস্তর তথা মুসলিমদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ারই যোগ্যতা নেই, তাহলে বড় কর্তৃত্ব না থাকার বিষয়টি আরও স্পষ্টই।[১৪৪]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে—

ক. বিচার ও অন্যান্য শাসনসংক্রান্ত যে পদগুলো রয়েছে, সেগুলোয় পদাসীন ব্যক্তির তার অধীনস্থদের ওপর কর্তৃত্ব অর্জিত হয়।

খ. কাফেররা যেহেতু মুসলমানদের ওপর কোনোরকম কর্তৃত্ব রাখার অধিকার রাখে না, তাই তাদেরকে ইসলামি ভূখণ্ডে মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব হয় এমন কোনো পদ দেওয়া যাবে না। অথবা মুসলমানদের বিচারসংক্রান্ত কোনো কাজেও তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।[১৪৫]

---

১৪৪. বাদায়েউস সানায়ে, ৭/৩

১৪৫. ইবনে জামাআ রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৩৩ হি.) এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও চমৎকার বলেছেন,

ولا يجوز تولية الذمي في شيء من ولايات المسلمين إلا في جباية الجزية من أهل الذمة أو جباية ما يؤخذ من تجارات المشركين. فأما ما يجبى من المسلمين من خراج أو عشر أو غير ذلك فلا يجوز تولية (٨٤ / ب) الذمي فيه، ولا تولية شيء من أمور المسلمين، قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ومن ولى ذميا على مسلم فقد جعل له سبيلا عليه. وقال تعالى: {ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم} ، ولأن تولية الكافر على المسلم تتضمن إعلاءه عليه، وإعزازه بالولاية، وذلك مخالف للشريعة وقواعدها. وقال تعالى: {لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} . ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. (تحرير الأحكام في تدبير الإسلام ص ٦٢٤، الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان)

মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব হয় এমন কোনো পদে জিম্মিদের নিয়োগদান করা জায়েজ নেই। তবে জিম্মিদের থেকে জিজিয়া কর আদায় বা দারুল হরব থেকে আসা কাফের ব্যবসায়ীদের থেকে ব্যবসায়িক ট্যাক্স আদায়সংক্রান্ত পদগুলোতে তাদের নিয়োগে কোনো সমস্যা নেই। মুসলমানদের উশর, খারাজ ইত্যাদি বিভিন্ন রাজস্ব আদায়সংশ্লিষ্ট কোনো পদে কাফেরদের নিয়োগ দেওয়া জায়েজ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.

আল্লাহ মুমিনদের ওপর কাফেরদের কিছুতেই কর্তৃত্ব দেবেন না।

মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব হয় এমন কোনো পদে কোনো জিম্মিকে নিয়োগ দেওয়ার অর্থই হলো কাফেরকে মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব দেওয়া। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

কাফেরের অধীনে চাকরি করা

কাফেরের অধীনে চাকরি করার বিধান হলো, যদি নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে জায়েজ, অন্যথায় জায়েয নয়।

প্রথম শর্ত : চাকরির প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি উভয়টিই শরিয়তসিদ্ধ হতে হবে। তাই যদি কোনো কাজের মূল উদ্দেশ্য বৈধ না হয়, বরং মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতা ও নগ্নতা ছড়ানো অথবা এ ছাড়া অন্য কোনো আকিদা বা কর্মগত বিভ্রান্তি ছড়ানো উদ্দেশ্য হয়, এবং মুসলমানদেরকে কোনো অবৈধ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা বা তাদের মধ্যে ইসলামবিরোধী উপাদান তৈরি করা হয়, তাহলে এ ধরনের চাকরি করা জায়েয হবে না। এ ক্ষেত্রে সাহায্য-সহায়তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। তেমনইভাবে চাকরি কোনো ফরজ বা ওয়াজিব বিধান পালনে বাধা না হতে হবে। এ কারণে যে চাকরিতে ফরজ নামাজ পড়া নিষিদ্ধ বা যেখানে দাড়ি কামানো আবশ্যক, সেসব কাজে নিযুক্ত হওয়া জায়েয নেই।

চাকরি ছাড়াও মুসলমানদের জন্য কাফের পিতামাতাকেও শরিয়ত কর্তৃক কোনো অনৈতিক কাজে সাহায্য করা জায়েয নেই। সুতরাং পিতামাতা যদি কাফের হয় আর তারা নিজেদের উপাসনালয়ে যাওয়ার জন্য ছেলের কাছে সাহায্য চায়, তাহলে মুসলিম ছেলের জন্য এ ক্ষেত্রে সাহায্য করা জায়েয নেই। তেমনইভাবে কাফের পিতামাতা যদি মুসলিম সন্তানের কাছে মদ তৈরির জন্য পাত্রের দাবি করে, তাহলে মুসলমান সন্তানের জন্য পিতামাতার এমন আবদার পূরণ করা জায়েয নেই।

‘ফাতাওয়ায়ে কাজিখানে’ উল্লেখ রয়েছে,

> مسلم به أم ذمية أو أب ذمي، ليس للمسلم أن يقود إلى البيعة وله أن يقوده من البيعة إلى منزله، وهذا كما لا يحل للمسلم حمل الخمر إلى الخل للتخليل ولكن يحمل الخل إلى الخمر، ولا يحمل الجيفة إلى الهرة، وله أن يحمل الهرة إلى الجيفة. (فتاوى قاضي خان ۱۷۳/۳، فصل في أهل الذمة وما يؤخذ منهم من الجزية في كل سنة وما يفعل بهم)
>
> একজন মুসলিমের যদি জিম্মি মা কিংবা জিম্মি বাবা থাকে, তাহলে এমন মুসলিমের জন্য তার পিতা বা মাতাকে গির্জায় নিয়ে যাওয়া বৈধ নয়, তবে তার জন্য গির্জা থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা জায়েজ আছে। এই মাসআলাটি ওই মাসআলার মতোই যে, মুসলিমের জন্য সিরকা বানানোর উদ্দেশ্যে

তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু/অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু/অভিভাবক। আর যে তাদেরকে বন্ধু/অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

একজন কাফেরকে মুসলমানের ওপর শাসনভার অর্পণ করা মানে তাকে মুসলমানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া এবং শাসনের মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করা। যা শরিয়ত ও তার মূলনীতিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক। তাহরিরুল আহকাম, পৃ. ৪২৬

সিরকার কাছে মদ বহন করে নেওয়া বৈধ নয়, কিন্তু সিরকাকে মদের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া বৈধ। এমনইভাবে বিড়ালের কাছে মৃত প্রাণী বহন করে নিয়ে যেতে পারবে না, কিন্তু বিড়ালকে মৃত প্রাণীর কাছে নিয়ে যেতে পারবে। (অর্থাৎ, মৃত প্রাণী যদি আপনি বহন করেন তাহলে সরাসরি হারাম জিনিস আপনি বহন করে নিয়ে গেলেন। আর বিড়ালটাকে মৃত প্রাণীর সামনে গিয়ে ছেড়ে দিলে আপনি কোন হারাম জিনিস গ্রহণ করলেন না।) [১৪৬]

'তাকমিলায়ে বাহরুর রায়েকে' উল্লেখ হয়েছে,

ولا يسقي أباه الكافر خمرا ولا يناوله القدح ويأخذه منه ولا يذهب به إلى البيعة، ويرده منها. (تكملة البحر الرائق ٧٠٢/٨، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب)

কাফের পিতাকে মদ খাওয়ানো মুসলিম সন্তানের জন্য জায়েয নেই। এবং তাদেরকে মদের গ্লাস এগিয়ে দেওয়াও যাবে না। তবে তাদের হাত থেকে পাত্র নেওয়া যাবে। তাদের উপাসনালয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, তবে সেখান থেকে নিয়ে আসা যাবে।[১৪৭]

দ্বিতীয় শর্ত : এতে ইসলাম ও মুসলমানদের মানহানি বা ক্ষতি থাকতে পারবে না।

তৃতীয় শর্ত : তৃতীয় শর্তটি মূলত সেটিই যা এর আগে বহুবার বলা হয়েছে, অর্থাৎ এর কারণে তার প্রতি মুহাব্বত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা যেন না থাকে।

যদি কোনো চাকরিতে যুক্ত থাকার ফলে মুসলিমদের অন্তরে কুফর ও কাফেরদের প্রতি মুহাব্বত জাগে, তাহলে সে চাকরি করা জায়েজ নয়।

কাফেরদের দেশে গিয়ে বসবাস করা

যেকোনো মুসলমানের জন্য উত্তম হলো ইসলামি ভূখণ্ডে বসবাস করা এবং শরিয়তের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করা। কোনো কারণ ছাড়া কাফেরদের সাথে মিশ্রিত না হওয়া। বিশেষত তাদের দেশে গিয়ে স্থায়ী বসবাস করা কোনোভাবেই উচিত নয়। কিন্তু যদি সেখানে বাধ্য হয়ে যেতে হয়, তাহলে সেটি বৈধ হবে কি না? যদি বৈধ হয়, তাহলে এর জন্য কোনো শর্ত আছে কি না? মাসআলাটি বিস্তর আলোচনা ও গবেষণার দাবি রাখে। তবে এখানে কিছু বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করছি।

বেশ কয়েকটি হাদিসে কাফেরদের মাঝে অবস্থান করা, তাদের সাথে বসবাস করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, ইমাম তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

১৪৬. ফাতাওয়ায়ে কাজিখান, ৩/৩৭১

১৪৭. আল-বাহরুর রায়েক, ৮/২০৭

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَلِمَ؟ قَالَ : لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا. (جامع الترمذي برقم : ٤٠٦١، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين)

আমি সে সকল মুসলিমের দায়িত্ব থেকে মুক্ত, যারা মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেন? তিনি বললেন, (কারণ) তাদের মাঝে এতটাই দূরত্ব থাকা উচিত, যেন একে অপরের (চুলার) আগুন দেখতে না পারে।[১৪৮]

এরপর তিনি সামুরা রা. থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَرَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ. (جامع الترمذي برقم : ٤٠٦١، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين)

তোমরা কাফেরদের সাথে বসবাস করা এবং তাদের সাথে মিশ্রিত হওয়া থেকে বিরত থাকো, কারণ যে তাদের সাথে বসবাস করে বা মিশ্রিত হয় সে তাদেরই মতো।[১৪৯]

ইমাম হাকেম নিসাপুরি রহিমাহুল্লাহ সামুরা রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا». (المستدرك للحاكم برقم : ٣٢٦٢، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وقال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم..)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমরা কাফেরদের সাথে বসবাস করা এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকা থেকে বিরত থাকো, কারণ যে তাদের সাথে বসবাস করে বা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[১৫০]

আল্লামা বাযযার রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ২৯২ হি.) সামুরা রা.-এর হাদিসটি এই শব্দে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال : لَا تُسَاكِنُوا

১৪৮. সুনানে তিরমিজি, হাদিস ১৬০৪

১৪৯. প্রাগুক্ত

১৫০. মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস ২৬২৭

الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ.

সামুরা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কাফেরদের সাথে বাস করা থেকে বিরত থাকো, কারণ যে তাদের সাথে বসবাস করল, সে তাদেরই দলভুক্ত হলো।[১৫১]

এটি এবং এর অনুরূপ রেওয়ায়েতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, কাফেরদের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করা নিষিদ্ধ। যারা ইসলামি শিক্ষাদীক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করে, তাদের সেখানে বসবাসের কারণে নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। তার মধ্যে গুরুতর হলো, ধীরে ধীরে কাফেরদের সাথে সখ্য ও ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়, যা অনেক আয়াত-হাদিসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে 'কাফেরদের বন্ধু বানানো থেকে বিরত থাকার আদেশ' এমন এক সীমারেখা, যার মাধ্যমে মানুষের দ্বীন ও ইসলাম, চিন্তা-চেতনা, তার আদর্শ, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার সংরক্ষিত থাকে। মুসলিমদের সাথে বসবাস করলে এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সুদৃঢ় হয়। বিশেষ করে এই বস্তুবাদী যুগে কাফের দেশ ও তাদের সমাজে বসবাস করা নিজ ধর্ম ও বিশ্বাসকে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় ও অনিরাপদে ফেলার নামান্তর। এখানে খুব কম লোকই দৃঢ়ভাবে অটল থাকতে পারে।

আল্লামা আবদুর রউফ মুনাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১০৩১ হি.) এমন একটি হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন,

لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفران قال الزمخشري : وهذا أمر معقول فإن مولاة الولي وموالاة عدوه متنافيان...

وفيه إبرام وإلزام بالتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والتحرز عن مخالطتهم ومعاشرتهم {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} والمؤمن أولى بموالاة المؤمن وإذا والى الكافر جره ذلك إلى تداعي ضعف إيمانه فزجر الشارع عن مخالطته بهذا التغليظ العظيم حسما لمادة الفساد {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين}. (فيض القدير برقم : ٣١٦٨، ١١١/٦، حرف الميم، ط. المكتبة التجارية الكبرى)

আল্লাহর শত্রুদের সাথে মেশা ও বন্ধুত্ব রাখা আল্লাহর প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অনাগ্রহী হয়, শয়তান তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। ইমাম

---

১৫১. মুসনাদে বাযযার, বর্ণনা ন. ৪৫৬৯

যামাখশারি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৫৩৮ হি.) বলেন, যৌক্তিকভাবেই এটি স্বীকৃত, কারণ একসাথে নিজের বন্ধু এবং বন্ধুর শত্রুর প্রতি ভালোবাসা রাখা সম্ভব না।... উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহর শত্রুদের থেকে আলাদা থাকা, তাদের সাথে না মেশা এবং এড়িয়ে চলার প্রতি জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

মুমিনরা যেন মুমিনকে বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে।

এই আয়াতেও এটাই বলা হয়েছে যে, মুমিনই হলো মুমিনের বন্ধুত্বের অধিক উপযোগী। কেউ যখন কাফেরকে বন্ধু বানায়, তখন তার ঈমান দুর্বল হওয়ার সমূহ শঙ্কা থাকে। তাই শরিয়ত তাদের সাথে মেলামেশা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, যাতে বিশৃঙ্খলার মূলের অবসান হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَـٰسِرِينَ.

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য করো, তবে ওরা তোমাদেরকে তোমাদের পেছনের দিকে (অর্থাৎ কুফরের দিকে) ফিরিয়ে দেবে, ফলে তোমরা (চরম) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।[১৫২]

এরপর তিনি ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ থেকে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী কথা উদ্ধৃত করেন,

قال ابن تيمية : المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة والمشاركة في الهدى الظاهر توجب مناسبة وائتلافا وإن بعد المكان والزمان، وهذا أمر محسوس. فمرافقتهم ومساكنتهم ولو قليلا، سبب لوقوع ما مر واكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، ولما كان مظنة الفساد خفي غير منضبط، علق الحكم به وأدير التحريم عليه، فمساكنتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات فيصير مساكن الكفار مثله وأيضا المشاركة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة وهذا مما يشهد به الحس فإن الرجلين إذا كانا من بلد واجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم بموجب الطبع وإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والمولاة فكيف المشابهة في الأمور الدينية؟.(فيض القدير برقم : ٣١٦٨، ١١١/٦، حرف الميم، ط. المكتبة التجارية الكبرى)

---

১৫২. সুরা আলে ইমরান : ১৪৯

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) বলেন, বাহ্যিক কাজে সাদৃশ্য ও বেশভূষা গ্রহণ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে যার বাহ্যিক রূপ ও সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়, তার প্রতি ভালোবাসা ও একধরনের বন্ধন তৈরি হয়, যদিও সময় ও স্থান বিবেচনায় তার থেকে অনেক দূরে থাকে, এটি স্বভাবজাত বিষয়। তাই সাময়িক সময়ের জন্যও কাফেরদের সাথে ওঠাবসা করা, তাদের সাহচর্যে যাওয়ায় একটি অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও এমন চরিত্র অর্জিত হয়, যা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। কাজেই যেহেতু ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া একটি অজানা বিষয়, তাই হুকুম বাহ্যিকের সাথে সম্পর্কিত হবে, আর হারামের ক্ষেত্রটি কেবল বাহ্যিক মিলের ওপরই রাখা হয়েছে। তাই তাদের সাথে বসবাস করা বাহ্যিকভাবে তাদের চরিত্র, নিকৃষ্ট কর্ম, এমনকি আকিদা-বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্য বোঝায়, ফলত কাফেরদের সাথে বসবাসের কারণে সে তার মতো হয়ে যাবে।

আর বাহ্যিকভাবে সামঞ্জস্য হওয়া অভ্যন্তরীণ বিষয়ে একপ্রকারের ভালোবাসা ও বন্ধনের সম্পর্ক তৈরি করে। কারণ একই শহরের দুইজন যখন বাহিরের কোনো দেশে একত্র হয়, তখন তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধন থাকে। এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়। আর যদি দুনিয়ার বিষয়ে সামঞ্জস্যের ফলে এমন মুহাব্বত তৈরি হয়, তাহলে দ্বীনি বিষয়ে সাদৃশ্য কেমন ফল বয়ে আনবে?[১৫৩]

অমুসলিম দেশে যাওয়ার শরয়ি বিধান

ইসলামি দেশগুলোর অবস্থা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এতে পার্থক্য হবে। তাই মূল বিধান এভাবে ব্যাখ্যার সাথে হবে—

১. যদি কোনো ব্যক্তির অন্তরে কাফের অথবা কুফরি শাসন কিংবা কাফের সমাজ ও জীবনব্যবস্থার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকে এবং এই চেতনায় উদ্যত হয়ে সেখানে গিয়ে বসবাস করে, তাহলে এটি শরিয়তে হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই জিনিসগুলোর প্রতি মুহাব্বত এবং মুসলিম বা ইসলামি ব্যবস্থা অথবা প্রকৃতপক্ষে ইসলামি সমাজের চেয়ে ওপরের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া এমন একটি অপরাধ, যার পরে ঈমান ও ইসলাম নিরাপদ থাকা কঠিন।[১৫৪]

---

১৫৩. ফয়জুল কাদির, ৬/১১১

১৫৪. মুফতি তাকি উসমানি দা. বা. লেখেন, (১) কোনো ব্যক্তি যদি লোকসমাজে সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কিংবা অন্য মুসলমানের ওপর নিজের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে কিংবা (২) দারুল কুফরের নাগরিকত্ব ও জাতীয়তাকে দারুল ইসলামের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মনে করে তাদের ন্যাশনালিটি গ্রহণ করে থাকে অথবা (৩) তার পার্থিব জীবনের থাকা-খাওয়া ও চালচলনে তাদের নীতি গ্রহণ করে বাহ্যিক জীবনে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করার জন্য এবং তাদের ন্যায় হওয়ার জন্য বসবাস করে থাকে, তাহলে এ জাতীয় যেকোনো উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে

২. কাফের রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘু মুসলমানদের সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের জন্য সেখানে যাওয়া বা বসবাস করা শুধু জায়েজই নয়, বরং বিরাট প্রতিদান ও সওয়াব অর্জনের কারণও বটে। শর্ত হলো, এ কাজ করার সামর্থ্য থাকতে হবে এবং সেখানকার ফিতনা ও অনিষ্টতার সাথে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকতে হবে। তবে এমন গুণ আর কতজনের মাঝেই থাকে! এ কারণেই আলেম ও বুজুর্গদের পূর্ণ সাহচর্য অর্জন না করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা রয়েছে যে, অন্যের ইসলাহের নিয়তের উত্তম চেতনা নিয়ে সেখানে গিয়ে নিজের আকিদা-বিশ্বাস ও আমলের মাঝে বিভিন্ন গোমরাহির শিকার হয়ে যাবে!

৩. বাধ্য হয়ে সেখানে যাওয়া। যেমন, কোনো ব্যক্তি ইসলামি দেশের বাসিন্দা, কিন্তু সে বিনা কারণে এখানে নির্যাতিত হচ্ছে, তার জানমাল, সম্মান ও মর্যাদা লঙ্ঘন করা হয়েছে, আর এখানে বসবাস করা অবস্থায় এর কোনো কার্যকরী সমাধান সে পাচ্ছে না। অথবা কেউ নিজের ও তার পরিবারের জীবিকা ও খরচের জন্য চিন্তিত এবং ইসলামি দেশে থেকে কোনো জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারছে না, যার মাধ্যমে সে নিজে এবং তার পরিবার নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাবে। এমনসব বাধ্যতার শিকার হয়ে সে কাফের দেশে যেতে চায়।

তার হুকুম হলো, এ ধরনের বাধ্যবাধকতার কারণে কাফের দেশে যাওয়া বৈধ, তবে এর জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পালন করা আবশ্যক—

এক. সে দেশটি এমন হতে হবে, যেখানে মুসলমান তার ধর্মীয় কাজকর্ম ও দায়িত্ব নির্বিঘ্নে করতে পারে, এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ হতে কোনো বিধিনিষেধ থাকতে পারবে না। কাফের দেশগুলোর মধ্যেও 'কম ক্ষতি গ্রহণের' মূলনীতি অনুযায়ী এমন দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, যেখানে ফিতনা ও ফাসাদ তুলনামূলক কম। তাই দ্বীনের বিষয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে জরুরত পুরা হলে সেগুলোকেই প্রাধান্য দেবে।

দুই. কাফেরদের সাথে মুহাব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক একেবারেই রাখা যাবে না। তবে একেবারে বাধ্য হলে ভালো সম্পর্ক রেখে চলার অবকাশ রয়েছে, যার সীমানা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে।

তিন. তাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না।

চার. কুফরি শাসনের সাথে অন্তরের ভালোবাসা রাখবে না। বরং এই সমস্ত জিনিসের প্রতি ঘৃণা রাখবে এবং কর্মগত দিক থেকে যথাসম্ভব তাদের থেকে দূরে থাকবে।

পাঁচ. পরিবারের প্রতি সম্পূর্ণ এবং কঠোর নজরদারি রাখবে। তাদের সেখানে

বসবাস করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হিসাবে গণ্য হবে। এই বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট যে, এর জন্য কোনো দলিল পেশ করার প্রয়োজন নেই।

ফিকহি মাকালাত, ১/২৪৮, মুফতি তাইয়েব হোসাইন অনূদিত, বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স (আব্দুল্লাহ)

বসবাসের জন্যও উপরিউক্ত শর্তগুলো প্রযোজ্য।[১৫৫]

১৫৫. মুফতি উবাইদুর রহমান সাহেব লেখেন, মিশরের প্রসিদ্ধ মুফতি শায়েখ আতিয়্যাহ সকর রহিমাহুল্লাহ 'অমুসলিম দেশে ব্যবসার জন্য যাওয়া' সংক্রান্ত একটি ফাতাওয়া জারি করেন। সে ফাতাওয়াটি সামনে রাখলে আমাদের বলা বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে উপকারী হবে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন,

الهجرة من مكان إلى مكان آخر من أجل الكسب الحلال لامانع منها مطلقا، وقد هاجر المسلمون من جزيرة العرب وغيرها لنشر الإسلام وابتغاء الرزق فى مناطق عديدة من العالم، ولا يزال المسلمون يهاجرون من أوطانهم إلى أوطان أخرى من أجل ذلك قال تعالى {ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة} [النساء : ١٠٠] {فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه} [الملك : ١٥].

والشرط فى هذه الهجرة أن يأمن المهاجر على عقيدته وشرفه ويتمتع بحريته وكرامته فى حدود الدين، أما إذا خاف أن يفتن فى دينه عقيدة وسلوكا حرم عليه أن يهاجر إلى هذا البلد أو يستقر فيه وعليه أن يهاجر إلى بلد آخر يجد فيه الأمان، فإذا ضاقت به السبل عاد إلى وطنه قانعا بالرزق القليل ليحافظ على دينه، ومن الممكن جدا أن يخدم وطنه وأمته بوسائل كثيرة إذا فكّر وقدر واكتشف واستفاد من خيرات الأرض التى لا ينضب معينها أبدا فهى نعم المورد لكل من أقبل عليها بالفكر والعمل.

فالوجود فى البلاد غير الإسلامية مرهون بالأمن على الدين وعدمه... قال المحققون من العلماء : إذا وجد المسلم أن وجوده فى دار الكفر يفيد المسلمين الموجودين فى دار الإسلام أو المسلمين الموجودين فى دار الكفر 'الجاليات' بمثل تعليمهم وقضاء مصالحهم، أو يفيد الإسلام نفسه بنشر مبادئه والرد على الشبه الموجهة إليه كان وجوده فى هذا المجتمع أفضل من تركه، ويتطلب ذلك أن يكون قوى الإيمان والشخصية والنفوذ حتى يمكنه أن يقوم بهذه المهمة. (فتاوى دار الإفتاء المصرية ١٠/٣٧٣، من أحكام متفرقات، فصل الطيور المهاجرة)

চতুর্থ অধ্যায়

ইরতেদাদ ও জানদাকার বাস্তবতা ও সংশ্লিষ্ট বিধান

- ইরতেদাদ ও জানদাকার বাস্তবতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান
- জানদাকা ও জিন্দিকের পরিচয় ও মূল মর্ম
- মাওলানা কান্ধলবি রহ.-এর তাহকিক
- আল্লামা মুসা খান সাহেবের তাহকিক
- জিন্দিক ও মুরতাদের মাঝে পার্থক্য
- সাধারণ কাফের ও মুরতাদের মাঝে মৌলিক পার্থক্য
- মুরতাদ হত্যার হেকমত
- মুরতাদের সাথে বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্কের বিধান
- মুলহাদ ও জিন্দিক-সংক্রান্ত একটি সম্মিলিত ফাতাওয়ার বিশ্লেষণ
- জিন্দিকের বিধান
- আধুনিক জামানার ইলহাদ ও জানদাকা

ইরতেদাদ ও জানদাকার বাস্তবতা

ধর্মের দিক থেকে মানুষ দুই প্রকার। মুসলমান ও কাফের। কাফেরদের মাঝে যদিও বিভিন্ন প্রকার ও দল রয়েছে, কিন্তু মূলগতভাবে তা দুই প্রকার। এক. আসলি কাফের। দুই. মুরতাদ। আসলি কাফের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা জীবনের শুরু থেকেই কাফের। আর মুরতাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ইসলামধর্ম ছেড়ে কাফের হয়েছে। এর কাছাকাছি আরেকটি প্রকার রয়েছে, যাকে জিন্দিক বলা হয়। এটা একটি অনারবি শব্দ। কতক আলেমের নিকট শব্দটির মূলধাতু হলো زنده। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সকল লোক, যারা জীবনের চিরস্থায়িত্বের প্রবক্তা। অর্থাৎ কেয়ামত দিবসের অস্বীকারকারী। কিছু কিতাবে রয়েছে জানদাকা শব্দটির মূল হলো زند শব্দ। এটা মূলত মাজদেকিয়্যাহ ফিরকার বই। তার দিকে সম্পৃক্ত করে জিন্দিক বলা হয়।[১৫৬]

পারিভাষিক অর্থে জিন্দিক কী এটা নিয়েও বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো—

জানদাকা ও জিন্দিকের পরিচয় ও মর্ম

আল্লামা আবু হিলাল আসকারি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩৯৫ হি.) 'কুফর' ও 'ইলহাদ' (ইলহাদ জানদাকা শব্দের সমার্থবোধক বা কাছাকাছি অর্থেই ব্যবহার হয়) শব্দদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করে লেখেন, কুফর শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। তার অনেকগুলো সুরত রয়েছে, যার মধ্যে একটা সুরত হলো ইলহাদ। আর ইলহাদের সারকথা হলো, নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন কুফরি বিশ্বাস ও মতবাদের প্রবক্তা হওয়া।

> أن الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب فمنها الشرك بالله ومنها الجحد للنبوة ومنها استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد النبوة وغير ذلك مما يطول الكلام فيه واصله التغطية والإلحاد اسم خص به اعتقاد نفي التقديم مع إظهار الإسلام وليس ذلك كفر الإلحاد ألا ترى أن اليهودي لا يسمى ملحدا وأن كان كافرا وكذلك النصراني وأصل الإلحاد الميل ومنه سمي اللحد لأنه يحفر في جانب القبر. (الفروق اللغوية،الباب الثامن عشرفي الفرق بين الدين والملة والطاعة والعبادة والفرض والوجوب والحلال والمباح وما يجري مع ذلك)

কুফর শব্দের মূল অর্থ হলো 'লুকানো'। আর এই শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন গোনাহের ওপর হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো আল্লাহর সাথে শিরিক করা, নবুয়তকে অস্বীকার করা, আল্লাহর নির্ধারণ করা হারামকে

---

১৫৬. আল্লামা ইবনে কামাল পাশা রহিমাহুল্লাহ জিন্দিক শব্দের মূল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রিসালা লেখেন تصحيح لفظ الزنديق وتوضيح معناه الدقيق নামে। আগ্রহীগণ বিস্তারিত জানতে তা দেখে নিতে পারেন। রিসালাটি মাজমুয়ে রাসায়েলে ইবনে কামাল পাশার পঞ্চম খণ্ডে রয়েছে। (উবাইদুর রহমান)

হালাল মনে করা—এটাও মূলত নবুয়তকে অস্বীকার করাই—ইত্যাদি। এ ছাড়াও আরও অনেক অর্থেই ব্যবহার হয় যার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

আর ইলহাদ হলো নিজেকে মুসলিম বলে প্রকাশ করে আল্লাহ অবিনশ্বর তা অস্বীকার করা। একে কুফরে ইলহাদ বলা হয় না। লক্ষ করে দেখুন, ইহুদি ও খ্রিষ্টানকে মুলহিদ বলা হয় না, যদিও তারা কাফের। ইলহাদের মূল অর্থ হলো 'ঝোঁকা' আর লাহদি কবরকে এজন্যই লাহদি বলা হয়, কারণ তা কবরের এক কোনায় খোদা হয়।[১৫৭]

ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬৭১ হি.) ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ থেকে জানদাকার একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন,

قال مالك رحمه الله : النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم، فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة، وهو أحد قولي الشافعي. قال مالك : وإنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه، إذ لم يشهد على المنافقين. (الجامع لأحكام القرآن ٩٩١/١، تحت سورة البقرة : ٠١)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় যেটাকে নেফাক বলা হতো, আমাদের সময়ে সেটাকে জানদাকা বলা হয়। সুতরাং যদি তার বিপক্ষে কেউ সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাওবার সুযোগ ছাড়াই তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম শাফেয়ির একটি বক্তব্যও এমন রয়েছে। মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের হত্যা করা থেকে বিরত ছিলেন উম্মতের সামনে এটা স্পষ্ট করার জন্য, যতক্ষণ সাক্ষী প্রতিষ্ঠিত না হবে, বিচারক তার জ্ঞানের ভিত্তিতেই ফয়সালা করবে না।[১৫৮]

ইমাম আহমাদ রহ.-এর বক্তব্য ও ইজতেহাদগুলোর নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হলেন খাল্লাল রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩১১ হি.)। তিনি ইমাম আহমাদ থেকে জানদাকার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন,

قال الخلال : أخبرني عصمة قال : حدثنا حنبل قال : سمعت أبا عبد الله يقول : فأما الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم على دين غير ذلك فإن رجع وإلا قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ بدَل دينه فاقْتلوه. فالحكم فيهم القتل إذا ترك الإسلام وكان ممن ولد على الفطرة. (الجامع لعلوم الإمام أحمد -الفقه- ٠٣٣/٢١، كتب الحدود، باب أحكام الزنادقة)

---

১৫৭. আল-ফুরুকুল লুগাবিয়্যাহ পৃ. ২২৮

১৫৮. তাফসিরে কুরতুবি, ১/১৯৯

জিনদিক হলো যারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় দেয় অথচ তারা অন্যধর্মে বিশ্বাসী। যদি তারা তাওবা করে ফিরে আসে তাহলে ভালো, অন্যথায় তাদের হত্যা করা হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ইসলামধর্ম পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা করো।' এজন্য তাদের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হলো হত্যা করা, যখন তারা ইসলাম ত্যাগ করবে। অথচ তারা জন্মগ্রহণ করেছিল স্বভাবজাত ধর্মের ওপর।[১৫৯]

হাম্বলি মাজহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-মুগনি'-তে উল্লেখ রয়েছে,

والزنديق كالمرتد فيما ذكرنا. والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفر، وهو المنافق، كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، ويسمى اليوم زنديقا. قال أحمد : مال الزنديق في بيت المال. (المغني لابن قدامة ٠٧٣/٦، كتاب الفرائض، مسألة أسلم قبل قسم ميراث موروثه المسلم)

জিন্দিক ও মুরতাদের বিধান একই। জিন্দিক বলা হয়, যারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় দেয় আর ভেতরে কুফর গোপন রাখে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় তাদেরকে মুনাফিক বলা হতো। আর বর্তমান সময়ে বলা হয় জিন্দিক। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, জিন্দিকের সম্পদ বাইতুল মালে জমা করা হবে।[১৬০]

আরেক হাম্বলি ফকিহ আল্লামা মারদাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৮৮৫ হি.) তার লিখিত 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে লেখেন,

الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ويسمى منافقا في الصدر الأول. وأما من أظهر الخير، وأبطن الفسق، فكالزنديق في توبته، في قياس المذهب. قاله في «الفروع».(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٩٣١/٧٢، كتاب الحدود،باب حكم المرتد)

জিন্দিক হলো যে নিজেকে মুসলিম পরিচয় দেয় আর ভেতরে কুফর গোপন রাখে। ইসলামের শুরু জামানায় এদেরকে মুনাফিক বলা হতো। আর যারা বাহ্যত কল্যাণ প্রকাশ করে নিজেদের ফিসককে গোপন করে, তাওবা কবুলের বিষয়ে সে মূলত জিন্দিকের মতোই।[১৬১]

আল্লামা বাহুতি হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১০৫১ হি.) লেখেন,

(وزنديق وهو المنافق) الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. (شرح منتهى

---

১৫৯. আল-জামি লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ, ১২/৩৩০

১৬০. আল-মুগনি, ৬/৩৭০

১৬১. আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ, ১০/৩৩৪

الإرادات ٣٥٥/٢، كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل)

জিন্দিক তো হলো মুনাফিক, যারা বাহ্যত নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে আর অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে।[১৬২]

শাফেয়ি মাজহাবের বিখ্যাত আলেম ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৮৫২ হি.) জানদাকার বাস্তবতা, এর মূল মর্ম ও প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে লেখেন,

وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور وقام الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك الزندقة ما كان عليه المنافقون وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. (فتح الباري ١٧٢/٢١، كتاب الحدود، باب حكم المرتد والمرتدة)

কিসরার দাদা বাহরাম মানি নামক এক লোককে ধোঁকা দেয় এবং তাকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করে, আমি তোমার কথা মেনে নিয়েছি। এরপর মানি ও তার সকল সাথিকে হত্যা করে ফেলে। মানির সাথি যারা বেঁচে গিয়েছিল, তারা মাজদাক নামক আরেক ব্যক্তির অনুসরণ শুরু করে। এদের আকিদা-বিশ্বাস যারা লালন করে তাদের ওপর জিন্দিক শব্দের প্রয়োগ হয়। এদেরই একটি দল হত্যার ভয়ে নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। এরপর থেকে প্রত্যেক ওই ব্যক্তির ওপরই জিন্দিক শব্দের প্রয়োগ হতে থাকে, যারা নিজেদের কুফরকে গোপন করে বাহ্যত নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। এমনকি ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'জিন্দিক হলো তাই যার ওপর প্রথম যুগের মুনাফিকরা ছিল।' তেমনইভাবে শাফেয়ি আইনজ্ঞদের একদল ও অন্যদের মত হলো, জিন্দিক ওই ব্যক্তিকে বলে, যে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় আর কুফরকে গোপন রাখে।[১৬৩]

ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ অন্য আরেক স্থানে বলেন,

الزنادقة الزنديق من لا يعتقد ملة وينكر الشرائع ويطلق على المنافق. (فتح الباري ٧٢١/١، الفصل الخامس في سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف مشروحا، فصل : زج)

জিন্দিক হলো যারা কোনো ধর্মেই বিশ্বাসী নয় এবং আসমানি বিধিবিধানকে

---

১৬২. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, ২/৫৫৩

১৬৩. ফাতহুল বারি, ১২/২৭১

অস্বীকার করে। এ শব্দের প্রয়োগ মুনাফিকের ওপরও হয়।[১৬৪]

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) লেখেন,

> والزنديق : هو المنافق وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق قالوا : ولا تعلم توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر؛ وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق؛ ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. (الإيمان لابن تيمية ص ١٧١، ومجموع الفتاوى ٥١٢/٧، كتاب الإيمان الكبير)
>
> জিন্দিক মানিই হলো মুনাফিক। তাকে তখনই হত্যা করা হবে যখন এটা স্পষ্ট হবে যে, সে নেফাক গোপন করছে। ফকিহগণ বলেন, জিন্দিক তাওবা করেছে কি না এটা জানা যায় না। কেননা, সে তো ওই বিষয়টিই প্রকাশ করবে, এতদিন সে যা প্রকাশ করত। অথচ বাস্তবতা হলো সে ইসলাম প্রকাশ করত, কিন্তু ছিল মুনাফিক। এখন যদি তার তাওবা কবুল করে নেওয়া হয়, তাহলে তাকে হত্যার আর কোনো পথ থাকবে না। অথচ তাকে হত্যার ব্যাপারে কুরআনে ধমকি এসেছে।[১৬৫]

আল্লামা সুবকি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৫৬ হি.) লেখেন,

> أما من لم تقم قرائن على صدقه وقد أتى به إلى القاضي الذي لا يعلم باطن حاله ولا ما في قلبه فهذه فيها شبه من مسالة الزنديق من جهة أن سبه دل على خبث باطنه، فهو كمن علم منه أنه يخفي الكفر ويظهر الإيمان، وهو الزنديق. (السيف المسلول على من سب الرسول ص ٧٠٢، الفصل الثاني : المسألة الأولى)
>
> যে ব্যক্তির সততার ব্যাপারে কোনোরূপ প্রমাণ নেই আর তাকে বিচারকের দরবারে উপস্থিত করা হয়, যিনি তার অভ্যন্তরে কী আছে বা তার অন্তরে কী আছে তা জানতে পারবে না, তো এই বিষয়টি জিন্দিকের বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। এই দৃষ্টিতে যে, উক্ত ব্যক্তির গালি দেওয়া তার ভেতরের নিকৃষ্টতার প্রমাণ বহন করে। তাই সে ওই ব্যক্তির মতো হয়ে গেল, যার ব্যাপারে এটা জানা গিয়েছে যে, সে তার ভেতরের কুফরকে গোপন করে আর প্রকাশ্যে নিজেকে মুসলিম দাবি করে, আর এরাই হলো জিন্দিক।[১৬৬]

ইবনুল আরাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৫৪৩ হি.) রচিত 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

---

১৬৪. ফাতহুল বারি, ১/১২৮

১৬৫. আল-ঈমান, পৃ. ১৭১

১৬৬. আস-সাইফুল মাসলুল আলা মান সাব্বার রাসুল, পৃ. ২০৬

المسألة الثالثة : قوله : {فإن يتوبوا يك خيرا لهم} [التوبة : ٤٧] : فيه دليل على توبة الكافر الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان، وهو الذي يسميه الفقهاء الزنديق. (أحكام القرآن ٢/٥٤٥، سورة التوبة : ٩٢)

তৃতীয় বিষয় হলো, আল্লাহর বাণী,

فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ.

যদি তারা তাওবা করে, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম।

এই আয়াত ওই সকল কাফেরের তাওবা কবুল হওয়ার পক্ষে দলিল, যারা কুফর গোপন করে নিজেদের মুসলিম পরিচয় দেয়। আর ফকিহরা এদেরকে জিন্দিক নামে নামকরণ করেছে।[১৬৭]

আল্লামা তাফতাজানি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৯২ হি.) 'শরহুল মাকাসেদ' গ্রন্থে কাফেরের বিভিন্ন প্রকার এবং সেগুলোর মর্ম ও প্রয়োগ সম্পর্কে লেখেন,

وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناده الحوادث إليه، خص باسم الدهري، وإن كان لا يثبت الباري تعالى، خص باسم المعطل، وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله عليه و سلم وإظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هى كفر بالاتفاق، خص باسم الزنديق، وهو في الأصل منسوب إلى «زند»، اسم كتاب أظهره مزدك في أيام قباد، وزعم أنه تأويل كتاب المجوس الذي جاء به زرادشت الذي يزعم أنه نبيهم. (شرح المقاصد في علم الكلام ٢/٥٤٥)

যারা সময়কে অবিনশ্বর বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে দাহরিয়্যাহ বলা হয়। আর যারা আল্লাহর জন্য গুণবাচক বিষয়কে সাব্যস্ত না করে তাদেরকে মুয়াত্তিলা বলা হয়। আর যারা নবুয়তকে স্বীকার করে এবং ইসলামের শিয়ারগুলোও প্রকাশ করে, সাথে সাথে অন্তরে এমন বিশ্বাস লালন করে যেটা সর্বসম্মতিক্রমে কুফর, তাহলে তাদেরকে জিন্দিক বলা হবে। জিন্দিক মূলত زند নামক শব্দ থেকে, যা মূলত একটি কিতাবের নাম। তা মাজদাক নামক লোক কুব্বাদ নামক শাসকের সময়ে প্রকাশ করেছিল। সে ধারণা করত, এটা হলো অগ্নিপূজার ধর্মের প্রসিদ্ধ 'জরথুস্ত্র'-এর কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যাকে অগ্নিপূজকরা নিজেদের ধারণামতে নবী মনে করত।[১৬৮]

মোল্লা আলি কারি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১০১৪ হি.) লেখেন,

وفيه دليل على أن من أظهر الإسلام وأبطن الكفر يقبل إسلامه في الظاهر،

১৬৭. আহকামুল কুরআন, ২/৫৪৫

১৬৮. শরহুল মাকাসেদ, ২/২৬৯

وذهب مالك إلى أنه لا تقبل توبة الزنديق، وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ويعلم ذلك بأن يقر أو يطلع منه على كفر كان يخفيه، فقيل: لا تقبل ويتحتم قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه في الآخرة، وقيل: يقبل منه مرة فقط، وقيل: ما لم يكن تحت السيف، وقيل: ما لم يكن داعية للضلال. (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان)

আর এটা এই বিষয়ের দলিল যে, যারা প্রকাশ্যে নিজেদের মুসলিম দাবি করে আর অন্তরে কুফর গোপন করে, বাহ্যত তার ইসলামকে গ্রহণ করে নেওয়া হবে। ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব হলো, জিন্দিকের তাওবা কবুল করা হবে না। আর তারা হলো, যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে অথচ অন্তরে কুফর গোপন করে রাখে। আর তা জানা যাবে, হয় সে নিজে তা স্বীকার করবে অথবা তার এমন কোনো কুফরির বিষয়ে জানা যাবে যা সে গোপন করত।

কতক আলেমের নিকট জিন্দিকের তাওবা কবুল হবে না এবং এদেরকে সুনিশ্চিত হত্যা করতে হবে। তবে সে যদি অন্তর থেকেই তাওবা করে থাকে, তাহলে তা আখেরাতে কাজে আসবে। আবার কতক আলেমের নিকট, একবার তার তাওবা কবুল হবে। আর কারও নিকট গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত তার তাওবা কবুল হবে। আর কতক মত দিয়েছেন, যদি গোমরাহির দিকে আহ্বান না করে থাকে তাহলে তাওবা কবুল হবে (অন্যথায় নয়)।[১৬৯]

মোল্লা আলি কারি রহিমাহুল্লাহ তার আরেক গ্রন্থ 'শরহুশ শিফা'-তে জিন্দিকের বিভিন্ন সংজ্ঞা উল্লেখ করে লেখেন,

وقال ابن قرقول الزنادقة من لا تعتقد ملة من الملل المعروفة ثم استعمل في كل من عطل الأديان وأنكر الشرائع وفيمن أظهر الإسلام وأسر غيره وقال الرافعي هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر والأصح عند الشافعية أنه الذي لا ينتحل دينا وقيل هو المباحي الذي لا يتدين بدين ولا ينتمي إلى شريعة ولا يؤمن بالبعث والنشور. (شرح الشفا ٢/٢٩٣، القسم الرابع، الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص)

ইবনে করকুল বলেন, জিন্দিকরা হলো ওই সকল ব্যক্তি যারা প্রচলিত কোনো ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতঃপর এই শব্দটি প্রত্যেক ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ব্যবহার হতে থাকল, যারা সকল ধর্মকেই অকার্যকর মনে করে, সকল আসমানি বিধিবিধানকে অস্বীকার করে আর নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে ভেতরে কুফরি লালন করে। শাফেয়ি মাজহাবের আলেম রাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যারা মুখে

১৬৯. মিরকাতুল মাফাতিহ, ১/৮১

ইসলামের দাবি করে আর অন্তরে কুফর গোপন রাখে তারা হলো জিন্দিক।’ তবে শাফেয়িদের নিকট অধিক সঠিক বক্তব্য হলো, জিন্দিক ওই ব্যক্তি যে কোনো ধর্মই মানে না। আর কারও কারও মতে জিন্দিক হলো, যারা ইবাহি মতের অনুসারী। আর ইবাহি হলো, যারা কোনো ধর্মেরই অনুসরণ করে না, আসমানি কোনো আইনকে মেনে নেয় না এবং পুনরুত্থান ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না।[১৭০]

আবদুল হক দেহলবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১০৫২ হি.) লেখেন,

والمراد بالزنديق كل ملحد في الدين لا دين له والمنكر للآخرة والربوبية والدين جملة، وقيل: هو المبطن المظهر للإسلام في الظاهر كالمنافق. (لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح ٣٣٢/١، كتاب الإيمان، الفصل الأول)

জিন্দিক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ওই মুলহিদ, যে কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করে না, আখেরাত, আল্লাহর রুবিবিয়্যাত ও ধর্মকে পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। আর কারও কারও মতে, জিন্দিক হলো ওই ব্যক্তি যে মুনাফিকের মতো অন্তরে কুফর গোপন করে মুখে ইসলামের দাবি করে।[১৭১]

আল্লামা কাশ্মীরি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৩৫৩ হি.) লেখেন,

والزنديق من يحرف في معاني الألفاظ، مع إبقاء ألفاظ الإسلام كهذا اللعين في القاديان، يدعي أنه يؤمن بختم النبوة، ثم يخترع له معنى من عنده يصلح له بعده الختم دليلا على فتح باب النبوة، فهذا هو الزندقة حقا، أي التغيير في المصاديق، وتبديل المعاني على خلاف ما عرفت عند أهل الشرع، وصرفها إلى أهوائه مع إبقاء اللفظ على ظاهره، والعياذ بالله. (فيض الباري ١٠٤/٦، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة)

জিন্দিক হলো যারা ইসলামের পরিভাষাগুলো ঠিক রেখে তার অর্থ ও মর্মের মাঝে বিকৃতি করে। যেমন এই অভিশপ্ত কাদিয়ানিরা। তারা দাবি করে যে, তারা খতমে নবুয়তে বিশ্বাসী। অতঃপর নিজেদের পক্ষ থেকে তার এমন মর্ম উদঘাটন করে যার মাধ্যমে নবুয়তের দরজা খোলা আছে এটা প্রমাণিত হয়। নিঃসন্দেহে এটা জানদাকা। অর্থাৎ পরিভাষার মর্ম ও প্রয়োগক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন সাধন করা, যা শরিয়তের ধারক উলামায়ে কেরামের কাছে পরিচিত নয়। আর শব্দের বাহ্যিক অর্থ ঠিক রেখে মর্মকে নিজেদের মনমতো নির্ধারণ করা।[১৭২]

---

১৭০. শরহুশ শিফা, ২/৩৯২

১৭১. লামআতুন তানকিহ, ১/২৩৩

১৭২. ফাইজুল বারি, ৬/৪০১

হজরত ইদরিস কান্ধলবি রহিমাহুল্লাহর তাহকিক

হজরত ইদরিস কান্ধলবি রহিমাহুল্লাহ কাদিয়ানিদের ফিতনার খণ্ডনে 'আহসানুল বায়ান ফি তাহকিকি মাসআলাতিল কুফরি ওয়াল-ঈমান' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। যা 'মুসলমান কৌন আউর কাফের কৌন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি জানদাকা সম্পর্কে লেখেন, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ও অন্তরে ইসলামকে অস্বীকার করে সে কাফের। আর যে বাহ্যত ইসলামকে স্বীকার করে আর অন্তরে অস্বীকার করে, সে হলো মুনাফিক। আর যে অন্তর দিয়ে তো ইসলামকে স্বীকার করে, কিন্তু জরুরিয়াতে দ্বীনের মধ্যে এমন ব্যাখ্যা করে যার দ্বারা শরিয়তের মূল বাস্তবতা ও উদ্দেশ্য পালটে যায়, তাকে শরিয়তের পরিভাষায় মুলহিদ ও জিন্দিক বলা হবে। ইসলামে মুনাফিকের বিধান কাফের থেকেও কঠিন, আর ইলহাদ ও জানদাকা মূলত নিফাকেরই সর্বোচ্চ প্রকার। মুনাফিক যেমনইভাবে ধোঁকার মাধ্যমে তাদের কার্যসিদ্ধি করে, তেমনই মুলহিদ ও জিন্দিকও নিজেদের কুফরি বিশ্বাসকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামের আকৃতিতে ধোঁকা দিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। যেন মানুষেরা ইসলামের নামে ধোঁকা খেয়ে তাদের ভেতরের কুফরকে গ্রহণ করে নেয়।[১৭৩]

আল্লামা মুসা খান রহিমাহুল্লাহর তাহকিক

আল্লামা মুসা খান রুহানিবাজি রহিমাহুল্লাহ জিন্দিক বিষয়ে 'আত-তাহকিক ফিজ-জিন্দিক' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। হজরতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের মতো এই কিতাবটিও অনেক তালাশ করে পাওয়া যায়নি। কিন্তু হজরতের রচিত 'তাফসিরে বাইযাবি'র ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত কিতাবটির একটি সারসংক্ষেপ উল্লেখ রয়েছে। সেখানে তিনি প্রথমে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ব্যক্তিদের থেকে জিন্দিক ও জানদাকার চারটি সংজ্ঞা প্রদান করেন, এরপর নিজের পক্ষ থেকে একটি সংজ্ঞা দেন যা অন্য সকল সংজ্ঞার তুলনায় অধিক ব্যাপক ও উপযোগী হয়েছে। তিনি লেখেন, আমার গবেষণামতে জিন্দিক বলা হয়, যে বাহ্যত নিজেকে তো মুসলমান দাবি করে, কিন্তু জবান ও কর্ম দ্বারা ইসলামের মূলনীতিসমূহের ও মুসলমানের ক্ষতি করতে থাকে। চাই সে অন্তরে কুফর রাখুক বা না রাখুক।[১৭৪]

জানদাকা ও জিন্দিকের বাস্তবতা ও মর্মসংক্রান্ত শরিয়তবিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো। এই সকল বক্তব্যের সারকথা হলো, জিন্দিকের পরিচয় নিয়ে শাস্ত্রজ্ঞদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, যার সবগুলোর সারমর্ম হলো—

১. যারা কোনো ধর্মেরই প্রবক্তা নয় তাদেরকে জিন্দিক বলা হয়। কতক আহলে ইলম এদেরকে 'ইবাহি' বলেও ব্যক্ত করেছেন।

২. মুখে তো নিজেকে মুসলিম দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে কাফের। আর নিজের

---

১৭৩. আহসানুল বায়ান ফি তাহকিকি মাসায়েলিল কুফরি ওয়াল-ঈমান, পৃ. ২৯

১৭৪. ইসমারুত তাকমিল, ২/২৫৮

কুফরকে গোপন করে রাখে।

৩. মুনাফিককে জিন্দিক বলা হয়।

৪. ইসলামের নাম ব্যবহার করে, নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে ইসলামের পরিভাষাগুলোকে এমন অপব্যাখ্যা করা, যার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

৫. মুসলমান দাবি করা সত্ত্বেও ইসলামের মূলনীতিসমূহের ও মুসলমানদের ক্ষতি করতে থাকে।

উপরিউক্ত বক্তব্যগুলোয় বাহ্যত পার্থক্য দেখা গেলেও এই পার্থক্য তেমন ক্ষতিকর নয়। কেননা বাস্তবতা হলো ইলহাদ ও জানদাকার নির্দিষ্ট কোনো একটি রূপ নেই। এগুলোর রয়েছে অসংখ্য প্রকৃতি। একেক শতাব্দীতে এই ফিতনা একেকটি রূপে হাজির হয়েছে। সামগ্রিকভাবে জিন্দিক ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, 'যে নিজের কোনো কুফরি বিশ্বাসকে ইসলাম বলে মনে করে এবং এই বিশ্বাস লালন করার পরেও নিজেকে মুসলমান দাবি করে।' জিন্দিক না সাধারণ কাফেরদের মতো ইসলাম ছেড়ে দেয়, আর না ইসলামের সকল জরুরিয়াতের বিশ্বাস ধারণ করে। উপরিউক্ত সকল সংজ্ঞাকেই এভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

জিন্দিক ও মুরতাদের মাঝে পার্থক্য

জিন্দিকের মুরতাদ হওয়া জরুরি নয়। বরং একজন ব্যক্তির মাঝে ইরতেদাদ ও জানদাকা দুটি একসাথে জমা হতে পারে। যেমন, একজন মুসলমান (নাউজুবিল্লাহ) কাদিয়ানি হয়ে গেল। এমনও হতে পারে, কেউ মুরতাদ হলো, কিন্তু সে জিন্দিক নয়, যেমন কেউ ইসলামধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান বা ইহুদি হয়ে গেল, অথবা কোনো ধর্মই গ্রহণ করল না। সুতরাং একজন কাদিয়ানি পারিভাষিকভাবে শুধুই মুরতাদ নয়, বরং একজন জিন্দিক।

এই পার্থক্য উভয় শব্দের মর্ম ও প্রয়োগের বিচারে। শরিয়তের দৃষ্টিতে উভয় সমান। যেমনইভাবে রিদ্দার পরিবেশের কারণে দ্বীনের ব্যাপারে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি ছড়িয়ে যায়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে অনেক বড় ক্ষতির বিষয়। জিন্দিকের বিষয়টিও তেমনই। বিশেষত যখন সে নিজের জানদাকা ইলহাদের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয় ও উৎসাহিত করে, বরং যদি আরও গভীর থেকে বিষয়টি দেখা হয় তাহলে মুরতাদ থেকেও জিন্দিকের বিষয়টি আরও ভয়ংকর ও ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত হয়। কেননা মুরতাদকে তো মানুষ মুরতাদ হিসাবেই চিহ্নিত করে ফেলে, যার ফলে তাকে ও তার চিন্তাকে ইসলাম ও সত্য বলে আর স্বীকৃতি দেয় না। আর এটা নিয়ে বাড়াবাড়িও করে না। অপরদিকে জিন্দিক ও মুলহিদ বলাই হয় ওই ব্যক্তিকে, যে নিজেকে বাহ্যত মুসলমান ও সঠিক বলে দাবি করে, আবার সাথে কুফরি বিশ্বাস ও চিন্তা লালন করে। আর এটা স্পষ্ট যে, মুরতাদের তুলনায় এমন ব্যক্তির জালে মানুষের ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি।

সাধারণ কাফের ও মুরতাদের বিধানের মাঝে পার্থক্যের হেকমত

ইসলামি শরিয়তে সাধারণ কাফের ও মুরতাদের বিধান এক নয়। এই বিষয়ে সাধারণত একটি আপত্তি এই তোলা হয়, এই পার্থক্যের ভিত্তি কী? যেখানে উভয়ই কাফের, সেখানে বিধানগত পার্থক্য কেন? মুরতাদের হত্যার বিষয়টির আলোচনা উঠলে এই প্রশ্ন খুব চাউর হয় এবং একে বিশ্বাসের স্বাধীনতার সাথে সাংঘর্ষিক মনে করা হয়।

এই প্রশ্নগুলোর মৌলিক উত্তর হলো, একজন মুসলমান হিসাবে কুরআন-হাদিসের সকল শিক্ষাকে শর্তহীনভাবে মেনে নেওয়া আমার জন্য আবশ্যক। আর কুরআন ও হাদিসে কাফের ও মুরতাদের বিধান আলাদাভাবেই উল্লেখ হয়েছে। এইজন্য আমরাও পার্থক্যের কথা বলি। কুরআন-হাদিস আমাদের বিবেক অনুযায়ী হওয়া জরুরি নয়। এটাও জরুরি নয় যে, শরিয়তের প্রতিটি বিধানের কোনো বাহ্যত কারণ থাকবে আবার সেই কারণ আমাদের বিবেকপ্রসূত হবে। বরং ঈমানের দাবিই হলো যখন কোনো বিধান প্রমাণিত হবে, তখন কোনোরূপ আপত্তি ছাড়াই আমরা তা মেনে নেব।

মুরতাদ হত্যার হেকমত

এটাই হলো সকল আপত্তির মৌলিক জবাব। এ ছাড়া সাধারণ কাফের আর মুরতাদের বিধানের পার্থক্যের অন্যতম একটি হেকমত এটা বুঝে আসে যে, মুরতাদের সম্পর্ক একসময় ইসলামের সাথে ছিল। সে ইসলামধর্ম স্বীকার করত এবং তাকে নিজের ধর্ম জানত। কোনো বিষয়কে ধর্ম মানার অর্থই হলো তাকে জীবনের সবকিছু থেকে বেশি সম্মান করা। যার কারণে মানুষ নিজের জানমাল সবকিছু কুরবান করে দিতে পারে। এখন কোনো বিশ্বাসকে নিজের ধর্ম হিসাবে কবুল করে নেওয়ার পর তা ছেড়ে দিয়ে বিপরীত কোনো বিশ্বাস মেনে নেওয়ার একটি আবশ্যকীয় অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সম্ভবত তার আগের ধর্মে কোনো দুর্বলতা রয়েছে। নাহলে যে ধর্মের জন্য সে জীবন দিতে প্রস্তুত তা কেন ছেড়ে দেবে!

জ্ঞানী ও অনুসন্ধানী মানসিকতার মানুষদের কাছে কোনো ব্যক্তির এমন আচরণ তেমন প্রভাব সৃষ্টিকারী হবে না। কিন্তু জনসাধারণের জন্য এটা বড় ধরনের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে এমন সম্ভাবনাও তৈরি হয় যে, একজনের দেখাদেখি অন্যরাও কোনো দুনিয়ার লোভে পড়ে ঈমান বিক্রি করে বসবে। ইসলাম ত্যাগকারী ব্যক্তি সমাজে যত গ্রহণযোগ্য হবে, ততই তার অনিষ্টতা সমাজকে গ্রাস করতে থাকবে। আর এটা শুধুই ধারণাপ্রসূত বক্তব্য নয়। বরং সমাজের একটি চরম বাস্তবতা। তা ছাড়া ইসলামের শত্রুপক্ষ অতীত ও বর্তমানে এগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছে। ইসলামের নেয়ামত থেকে মানুষদের বিরত রাখতে ইহুদিরা যে-কয়টি অপকৌশল ও চক্রান্ত করেছে তার মধ্যে এটা অন্যতম। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এই বিষয়ে সতর্ক করে বলেন,

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

কিতাবিদের একদল অন্যদের বলছে, তোমরা দিনের শুরুতে তা মেনে নাও যা মুসলমানদের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান করো, হয়তো এতে মুসলমানরা স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে।[১৭৫]

এ থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ইরতেদাদ মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ। যদিও এই বিদ্রোহ বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো সশস্ত্র বিদ্রোহ নয়, কিন্তু ক্ষতির প্রভাবের দিক থেকে এটি সশস্ত্র বিদ্রোহের থেকেও বেশি ভয়ংকর। এর মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপারে অন্তরে সংশয় তৈরি হয়। এজন্য পুরো দুনিয়ায় বিদ্রোহের শাস্তি যেমন মৃত্যুদণ্ড, বিদ্রোহী ব্যক্তি যদি নিজ থেকে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তো মাফ পায়, অন্যথায় তাকে হত্যা করে রাষ্ট্রকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয়, তেমনই ইসলামধর্মেও ইরতেদাদের এটাই শাস্তি—হয়তো সে পুনরায় ইসলামধর্মে ফিরে আসবে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। তবে ইসলামের মহানুভবতা হলো তার ওপর অতিরিক্ত এই অনুগ্রহ করা হবে যে, তাকে সাথে সাথে হত্যা করা হবে না, বরং প্রয়োজনানুযায়ী চিন্তা-ফিকির করার সময় দেওয়া হবে এবং ইসলামের ব্যাপারে কোনো সংশয়ের কারণে যদি সে ধর্ম ত্যাগ করে থাকে তাহলে তা দূর করার চেষ্টা করা হবে।

মুরতাদের সাথে বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্ক ও তার হুকুম

কাফেরদের সাথে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ককে আমরা তিন প্রকারে ভাগ করেছিলাম।

১. ধর্মীয় সম্পর্ক। অর্থাৎ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখা, বিয়েশাদি করা ইত্যাদি।

২. সামাজিকতা প্রদর্শন। যার মাঝে দাওয়াত, মেহমানদারি, পরস্পরকে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করা, হাদিয়া-তোহফার আদান-প্রদান করা ইত্যাদি সামাজিক বিভিন্ন বিষয়।

৩. ব্যবসায়িক লেনদেন।

প্রথম প্রকারের সম্পর্ক তো কাফেরদের সাথে নাজায়েজ। তবে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে আহলে কিতাব নারীদের বিবাহের অনুমতি রয়েছে। যা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সৌজন্যমূলক আচরণেরও বিভিন্ন শর্তের সাথে অনুমতি আছে। বাকি ব্যবসায়ী বিষয়ে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে মূলগত তেমন পার্থক্য নেই। তবে কখনো বহিরাগত কারণে কিছু শর্ত আরোপ হয়, যার আলোচনাও গত হয়েছে।

এটা তো সাধারণ কাফেরদের সাথে বিধান। আর মুরতাদের সাথে বিধানের কিছু

১৭৫. সুরা আলে ইমরান : ৭২

মূলনীতি হলো—

ক. প্রথম প্রকার সম্পর্ক অন্য কাফেরদের মতো তার সাথেও নাজায়েজ।

খ. দ্বিতীয় প্রকারের সম্পর্ক সাধারণ কাফেরদের সাথে শর্তসাপেক্ষে জায়েয হলেও হারবি কাফেরদের সাথে জায়েয নয়। আর মুরতাদ মূলত হারবি কাফেরের হুকুমে। একজন হারবির জানমাল যেমন অনিরাপদ, তেমনই একজন মুরতাদের জানমালও অনিরাপদ। এইজন্য সাধারণ অবস্থায় মুরতাদের সাথে কোনোরকম সম্পর্ক রাখা, তাদের সাহায্য করা, তাদের দাওয়াত কবুল করা বা মেহমানদারি করা শরিয়তে নিষিদ্ধ।

ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩৭০ হি.) লেখেন,

> وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لا يجوز على الله تعالى إذا لم يمكننا إنكاره وكنا في تقية من تغييره باليد أو اللسان. (أحكام القرآن ٦٦١/٤، تحت سورة الأنعام، باب النهي عن مجالسة الظالمين)
>
> মুলহিদ আর সকল কাফের—যখন তারা বিভিন্ন শিরকে লিপ্ত হয়, তাদের সাথে ওঠাবসা করা থেকে বিরত থাকা আমাদের জন্য আবশ্যক। যখন আমাদের পক্ষে হাত ও জবান দিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিরোধ সম্ভব নয়।[১৭৬]

‘উরানিয়্যিনবাসীর’ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬৭৬ হি.) লেখেন,

> قلت قد ذكر في هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا الرعاة وارتدوا عن الإسلام وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء ولا غيره وقد قال أصحابنا لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمم ولو كان ذميا أو بهيمة وجب سقيه ولم يجز الوضوء به حينئذ والله أعلم. (شرح مسلم للنووي ٣٤١/١١، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات)
>
> সহিহ হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, যখন উরানিয়্যিনবাসী মেষপালকদের হত্যা করে এবং ইসলামধর্ম ত্যাগ করে, তখন আর তাদেরকে পানি পান করানো বা ইত্যাদি কিছুর বৈধতা বাকি থাকে না। আমাদের শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, কোনো ব্যক্তির কাছে যদি পবিত্রতা অর্জন পরিমাণ পানি থাকে আর এমতাবস্থায় সে কোনো মুরতাদকে পানির পিপাসায় মৃত্যুবরণ করতে দেখে, তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম করে সে পানি মুরতাদকে পান করানো জায়েয নেই। অথচ যদি জিম্মি হয় বা কোনো চতুষ্পদ জানোয়ারের এমন অবস্থা হয়,

---

১৭৬. আহকামুল কুরআন, ৪/১৬৬

তাহলে তখন তাদেরকে পানি পান না করিয়ে অজু করা জায়েয হবে না।[১৭৭]

মুরতাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক

গ. মুরতাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি যত লেনদেন আছে এগুলো যদি কেউ করে, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে তা স্থগিত থাকবে। যদি মুরতাদ ইসলাম পুনরায় কবুল করে নেয়, তাহলে এ সকল বিষয় কার্যকর হবে, অন্যথায় নয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের নিকট এ সকল লেনদেন কার্যকর হবে। ইমাম আবু হানিফার কথাই অগ্রগণ্য।

মনে রাখতে হবে, এখানে যে মতানৈক্য তা শুধুই মুরতাদের তাসাররুফাত (অর্থাৎ যত ধরনের লেনদেন ইত্যাদি রয়েছে) কার্যকর হওয়া নিয়ে, জায়েয হওয়া নিয়ে নয়। কোনো চুক্তি শরিয়তের দৃষ্টিতে স্থগিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তা নাজায়েজ। এ থেকে বোঝা গেল মুরতাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় মূলগতভাবে নাজায়েয কিছু নয়। কিন্তু ধর্মত্যাগের কারণে সে যেহেতু বিদ্রোহ করেছে আর ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক এমন ব্যক্তিকে তিন দিনের বেশি জীবিত রাখা যায় না, তাই দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধ ও ইসলামের দাবি এটাই যে, এমন ব্যক্তির সাথে কোনো ধরনের লেনদেনের সম্পর্ক না রাখা। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের এই দুশমনকে নিজের দুশমন মনে করা। তাই এমন ব্যক্তির সাথে লেনদেন করা দ্বীনি আত্মমর্যাদার পরিপন্থী।

এ থেকে এটাও স্পষ্ট যে, এই হুকুম সে সময়ের সাথে প্রযোজ্য হবে, যখন এই লেনদেন শুধুই ব্যবসায়ের পর্যায়ে থাকে। যদি এই ব্যবসায়ের সম্পর্কের কারণে এমন কোনো আশঙ্কা দেখা দেয়—

ক. ব্যবসায়ের সম্পর্ক রাখা মুসলমান মুরতাদের বাহ্যিক আচরণ দেখে নিজেও ধর্মত্যাগের দিকে ঝুঁকে যাবে।

খ. অথবা ইসলামের বিষয়ে কোনো সংশয়ে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গ. মুসলিম ব্যবসায়ী নিজের ব্যাপারে এমন হবে না, কিন্তু তার কারণে অন্য মুসলিমদের উপরিউক্ত ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

ঘ. অথবা মুরতাদ এ সকল লেনদেনের কারণে নিজের নাজায়েয পদক্ষেপে আরও দৃঢ় হবে। এ সকল সুরতে মুসলমানদের জন্য মুরতাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখাও জায়েয হবে না। বরং বিরত থাকাই জরুরি।

ইমাম সারাখসি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৪৮৩ হি.) বলেন,

ولا يمنع التجار من دخول دار الحرب بالتجارات ما خلا الكراع، والسلاح، فإنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين فيمنعون من حمله إليهم، وكذلك

---

১৭৭. শরহে মুসলিম, ১১/১৪৩

الحديد، فإنه أصل السلاح قال الله تعالى {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} [الحديد : ٥٢].(المبسوط ٩٨/٠١، كتاب السير، باب صلح الملوك والموادعة)

ব্যবসায়ীদের ব্যবসার জন্য দারুল হারবে প্রবেশে নিষেধ করা হবে না। তবে ঘোড়া ও অস্ত্রের ব্যবসাতে তাদের নিষেধ করা হবে। কেননা এগুলোর দ্বারা দারুল হারববাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তিশালী হবে। তাই সেখানে এগুলোর ব্যবসা করতে বাধা দেওয়া হবে। তেমনইভাবে লোহাও। কেননা, এটাই অস্ত্রের মূল। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, 'আমি নাজিল করেছি লোহা। তাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি।'[১৭৮]

শরহুস সিয়ার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك، إلا السلاح والكراع، والسبي سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان. لأنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين، ولا يحل للمسلمين اكتساب سبب تقويتهم على قتال المسلمين، وهذا المعنى لا يوجد في سائر الأمتعة. ثم هذا الحكم إذا لم يحاصروا من حصونهم، فأما إذا حاصروا حصنا من حصونهم فلا ينبغي لهم أن يبيعوا من أهل الحصن طعاما ولا شرابا ولا شيئا يقويهم على المقام. لأنهم إنما حاصروهم لينفذ طعامهم وشرابهم حتى يعطوا بأيديهم ويخرجوا على حكم الله تعالى، ففي بيع الطعام وغيره منهم اكتساب سبب تقويتهم على المقام في حصنهم، بخلاف ما سبق، فإن أهل الحرب في دارهم يتمكنون من اكتساب ما يتقوون به على المقام، لا بطريق الشراء من المسلمين، فأما أهل الحصن لا يتمكنون من ذلك بعد ما أحاط المسلمون بهم، فلا يحل لأحد من المسلمين أن يبيعهم شيئا من ذلك. ومن فعله فعلم به الإمام أدبه على ذلك لارتكابه ما لا يحل. (شرح السير الكبير،كتاب سهمان الخيل والرجالة في الغنائم، باب هدية أهل الحرب)

মুসলমানরা মুশরিকদের সাথে কাপড়, খাদ্যজাত বস্তু ইত্যাদির ব্যবসা করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে ঘোড়া, অস্ত্র ও গোলাম বিক্রি করতে পারবে না। চাই মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করুক বা নিরাপত্তা ছাড়া। কেননা এতে দারুল হারববাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তিশালী হবে। কোনো মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয়, মুসলমানের বিরুদ্ধে তারা কাফেরদের শক্তি অর্জনের কারণ হবে। আর এই বিষয়টি অন্যান্য বিষয়ে পাওয়া যায় না। (তাই সেগুলো বিক্রিতে কোনো সমস্যা নেই) আর যদি

১৭৮. আল-মাবসুত, ১০/৮৯

মুসলমানরা কাফেরদের কোনো দুর্গ অবরোধ করে, তাহলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেননা অবরোধ চলাকালে তাদের নিকট খাবারদাবার ইত্যাদি এমন কোনোকিছুই বিক্রি করা জায়েয হবে না, যার মাধ্যমে তারা দৃঢ় থাকবে। কেননা মুসলমানরা তাদের অবরোধ এজন্যই করেছে যে, তাদের খাদ্যদ্রব্য শেষ হয়ে যাবে এবং তারা বাধ্য হয়ে আল্লাহর বিধানের সামনে বের হয়ে আসবে। আর খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদের কাছে তখন বিক্রি করার দ্বারা তারা দুর্গে অবিচল থাকার শক্তি জোগাবে। এর বিপরীতে যখন মুসলিমদের অবরোধ থাকবে না, তখন কাফেররা নিজেরাই মুসলিমদের থেকে ক্রয় ছাড়াই নিজেদের খাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে শক্তি অর্জনে সক্ষম। (তাই তখন আর যুদ্ধের শক্তি জোগায় না এমন যেকোনোকিছু বিক্রিতে কোনো সমস্যা নেই।) আর মুসলমানরা দুর্গ অবরোধের পর তখন আর তাদের পক্ষে এমনটা সম্ভব নয়। তাই তখন কোনো মুসলমানের জন্য তাদের কাছে কিছুই বিক্রি করা জায়েয হবে না। সুতরাং কোনো মুসলমান যদি কিছু বিক্রি করে, তাহলে শাসক জানতে পারলে তাকে নিষিদ্ধ কাজের জন্য শাস্তি দেবে।[১৭৯]

'শরহে মুখতাসারুত তহাবি' গ্রন্থে রয়েছে,

قال : (وكره بيع السلاح من أهل الفتنة، وفي عساكر الفتنة، ولا بأس ببيعه في الأمصار، وممن لا نعرفه من أهل الفتنة). وكل ذلك لأن في بيعه من أهل الفتنة معونة لهم عليها، كما يكره بيع السلاح من أهل الحرب. (شرح مختصر القدوري ٠٦٥/٨، كتاب الكراهية)

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও তাদের ফৌজের নিকট অস্ত্র বিক্রি করা জায়েয নেই। তবে শহর অঞ্চলে অস্ত্র বিক্রয় করতে কোনো সমস্যা নেই এবং এমন ব্যক্তির কাছেও বিক্রয় করতে কোনো সমস্যা নেই, যাদেরকে আমরা বিশৃঙ্খলাকারী হিসাবে চিনি না। আর এটা এজন্য যে, তাদের কাছে কিছু বিক্রি করা তাদেরকে সাহায্য করার নামান্তর।[১৮০]

হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে,

ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك وكذا الكراع لما بينا وكذا الحديد لأنه أصل السلاح وكذا بعد الموادعة لأنها على شرف النقض أو الانقض فكانا حربا علينا. (الهداية، كتاب السير، باب الموادعة ومن يجوز أمانه، مدخل)

---

১৭৯. শরহুস সিয়ারিল কাবির পৃ. ১২৪২

১৮০. শরহে মুখতাসারুত তহাবি, ৮/৫৬০

দারুল হারবের বাসিন্দাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা বা তার বন্দোবস্ত করে দেওয়া জায়েয নেই। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারুল হারবীর কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে ও তাদের কাছে তা নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তিশালী হয়। ফলে তা থেকে নিষেধ করা হবে। পূর্বোক্ত কারণে ঘোড়ার বিধানও একই হবে। তেমনই লোহার বিধানও, কেননা তাই অস্ত্র তৈরির মূল। সন্ধিবদ্ধ কাফেরের (ব্যক্তি হোক বা রাষ্ট্র) সাথেও একই বিধান (অর্থাৎ, সন্ধি অবস্থায়ও তাদের কাছে অস্ত্র বা যুদ্ধের কোনো সামান বিক্রি জায়েয হবে না।—অনুবাদক)। কেননা সন্ধি তো শেষ হবে, আর সন্ধি শেষ হলেই তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।[১৮১]

মুলহিদ ও জিন্দিক বিষয়ে একটি সম্মিলিত ফাতাওয়া বিশ্লেষণ

এটা স্পষ্ট থাকা দরকার যে, মুলহিদ ও জিন্দিকের সাথে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের যে বিধান এখানে বলা হয়েছে, এটাই হলো শরিয়তের মূল বিধান। এখন চাই রিদ্দা ও জানদাকায় একজন ব্যক্তি লিপ্ত হোক বা পুরো সমাজ, বিধান তাই হবে যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আজ থেকে ৪৫ বছর পূর্বে জামিয়া ইসলামিয়া বানুরি টাউনের প্রধান মুফতি ওয়ালি হাসান খান টুনকি রহিমাহুল্লাহ 'আকাবারে মাজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত' থেকে প্রেরিত এক প্রশ্নের জবাবে বিস্তারিত একটি ফাতাওয়া লেখেন। যা সে সময়ের উপমহাদেশের নির্ভরযোগ্য সুপ্রসিদ্ধ আলেমদের কাছে পাঠানো হয়। অধিকাংশ আলেম ফাতাওয়াটিকে সত্যায়িত করেন এবং সঠিক বলে মত ব্যক্ত করেন। সেখানে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয় যে, কাদিয়ানিদের সাথে সবরকম লেনদেন করা নাজায়েজ।

কিছু ঘরানা থেকে এখন এই ফাতাওয়ার ওপর আপত্তি তোলা হচ্ছে যে, ফিকহের কিতাবে মুরতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে বিধান রয়েছে তা থেকে সম্মিলিত ফাতাওয়া ভিন্ন এবং এই ফাতাওয়া ভুল। আর কিছু ঘরানা থেকে একটি ব্যাপক মূলনীতি এটাও বলা হচ্ছে যে, মুলহিদ ও জিন্দিকের সাথে সকল ধরনের সম্পর্ক—ব্যবসা, লেনদেন ইত্যাদি অকাট্য হারাম!

বাস্তবতা হলো, এই উভয় কথাই সঠিক নয়। বরং সঠিক কথা হলো তাই, যা আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি। ব্যবসায়িক লেনদেনের বিষয়ে আমাদের হানাফি আলেমদের দুটি মত রয়েছে, এক বক্তব্যমতে এদের সকল হস্তক্ষেপ বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। আরেক মত অনুযায়ী তা স্থগিত থাকবে। কিন্তু তাদের সাথে লেনদেন—যা ওপরে উল্লেখ হয়েছে—সত্তাগতভাবে হারাম নয়। বরং আনুষঙ্গিক কারণে তাতে নিষেধাজ্ঞা এসে যায়। আর সে আনুষঙ্গিক বিষয়টি যত বৃদ্ধি পাবে, হুকুমের কঠোরতাও ততটাই বৃদ্ধি পাবে। সে ফাতাওয়াতে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেই বলা আছে। অতিরিক্ত ফায়েদার

১৮১. হিদায়া ২/৩৮২

জন্য উক্ত ফাতাওয়ার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ এখানে নকল করছি।

প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি বা দল যদি কোনো নবুয়তের মিথ্যা দাবিদারের ওপর ঈমান আনে, তাহলে উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। তার কুফরির বিষয়টি কোনো ধরনের সন্দেহ ছাড়া সুনিশ্চিত। এ ছাড়া যদি তার ভেতরে নিম্নোক্ত কারণগুলোও বিদ্যমান থাকে—

১. তারা ইসলামের লেবাস পরে মুসলিমদের ঈমানের ওপর হামলা চালায় এবং পুরো মুসলিমজাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে।

২. মুসলিমদের শারীরিক, আর্থিক এবং সকলপ্রকার ক্ষতি করতে তারা দ্বিধা করে না।

৩. তাদের বস্তুগত শক্তি ও সম্পদের উন্নতি নির্ভর করে মুসলিমদের শোষণের ওপর, তাদের কলকারখানা ও ইন্ডাস্ট্রিগুলো মুসলমানদের দ্বারাই পরিচালিত হয়, তারা ইসলামি দেশের বড় বড় পদে উত্তীর্ণ হওয়ার এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

৪. ইসলামবিরোধী বহিরাগত শক্তি; ইহুদি ও খ্রিষ্টান এবং ভারতের ইসলামবিদ্বেষী শাসকদের সাথে তাদের যোগসূত্র রয়েছে। মূলত তাদের উদ্দেশ্য হলো, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পারস্পরিক সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া। বরং একটি ইসলামি রাজ্যকে বিদ্রোহের এবং বিপ্লবের ক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্মুখীন করে দেওয়া।

৫. এই ফিতনা থেকে রাষ্ট্র ও ধর্মকে বাঁচানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে শাসক বা শাসকের তরফ থেকে কোনো প্রত্যাশা নেই এবং তাদের অপরাধের ক্ষেত্রে শরিয়তের নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হবে বলেও আশা করা যায় না।

এ সকল পরিস্থিতিতে ফিতনা নির্মূল করতে হলে মুসলিমদের করণীয় কী? এবং এ ব্যাপারে শরয়ি জিম্মাদারিই-বা কী?

এ সকল পরিস্থিতিতে এমন দল বা ব্যক্তির অবৈধ আগ্রাসন দমন করতে নিম্নোক্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া জায়েয বা আবশ্যক হবে? যেমন—

ক. মুসলিম উম্মাহ সে ব্যক্তি বা দলের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করবে।

খ. তাদের সাথে সালাম-মোসাফাহা, ওঠাবসা, এমনকি বিয়েশাদিতেও অংশগ্রহণ করবে না। বরং সামাজিকভাবে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে।

গ. তাদের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন বৈধ হবে কি না?

ঘ. তাদের ফ্যাক্টরি থেকে কি পণ্য ক্রয় করা যাবে? নাকি পরিপূর্ণরূপে অর্থনৈতিক বয়কট করতে হবে?

ঙ. তাদের বিদ্যালয়, হোটেল এবং রিসোর্টগুলোতে যাওয়া বৈধ হবে কি না?

চ. তাদের সাথে কি সম্প্রীতি বজায় রাখা যাবে?

ছ. তাদের কলকারখানায় প্রস্তুতকৃত পণ্য ব্যবহার করা যাবে কি না? মোটকথা, তাদেরকে পরিপূর্ণরূপে সামাজিক বয়কট করা বৈধ নাকি অবৈধ? তাদেরকে সরল পথে আনার জন্য কি সকল মুসলমানের ওপর বয়কটের হুকুম আরোপ হবে? যেহেতু এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা বাকি নেই।

উত্তর : কুরআন, হাদিস ও উম্মতের অকাট্য ইজমা দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর প্রত্যেক নবুয়তের দাবিদার সুনিশ্চিত কাফের।

আর যারা নবুয়তের দাবিদারদের সত্য মনে করবে এবং তাদের অনুসরণীয় মনে করবে তারাও কাফের ও মুরতাদ হয়ে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। এই ধরনের লোকের কুফর ও ইরতেদাদের সাথে যদি প্রশ্নে উল্লেখিত কারণসমূহের কোনো একটি কারণও পাওয়া যায়, তাহলে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামি অনুযায়ী এরা ইসলামি সহমর্মিতা পাওয়ারও উপযুক্ত নয়। মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হলো এদের সাথে সবধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা—কথা বলা, ওঠাবসা করা, লেনদেন করা ইত্যাদি ত্যাগ করা। এমন কোনো সম্পর্ক তাদের সাথে রাখা যার দ্বারা তাদের ইজ্জত-সম্মান প্রকাশ পায়, অথবা তাদের শক্তি ও প্রভাব অর্জন হয় তা মুসলমানদের জন্য জায়েয নেই। হারবি কাফের ও ইসলামের শত্রুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের বিষয়ে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ফিকহে ইসলামিতে যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

এই কথা স্পষ্ট জেনে রাখা দরকার যে, যে-সকল হারবি কাফের মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, মুসলমানদের কষ্ট দেয়, ইসলামি পরিভাষাগুলোকে বিকৃত করে ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা করে এবং বন্ধুরূপী শত্রু হয়ে মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তির মাঝে ফাটল ধরানোর কাজ করে, ইসলাম তাদের সাথে কঠিন থেকে কঠিন আচরণের আদেশ দেয়। উত্তম আচরণের অনুমতি তো শুধু ওই সকল কাফেরের ক্ষেত্রে, যারা মুসলমানদের কষ্ট দেয় না ও হারবি নয়। অন্যথায় যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে তো কঠোর আচরণের আদেশ রয়েছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের তো বহু দূরের বিষয়, যদি মুসলমানের মধ্যেই কোনো নিকৃষ্ট পাপীর আবির্ভাব হয়, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি সম্পর্ক ছিন্ন করা, কথাবার্তা, লেনদেন বন্ধ করে দিয়ে সর্বদিক থেকে তাকে একঘরে করে দেওয়ার আদেশও সুন্নত ও শরিয়তে রয়েছে।

এই বিষয়ে প্রথম দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রের ওপরই আসে, আর তা হলো, এমন

ফিতনাবাজ মুরতাদদের ওপর শরিয়তের বিধান 'যারা ইসলামধর্ম ত্যাগ করবে তাদের হত্যা করো' কার্যকর করে শিকড়সহ উপড়ে ফেলে মুসলিম উম্মাহকে এই ফিতনা থেকে রক্ষা করা। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদিন বিশৃঙ্খলাকারী ফিতনাবাজ ও মুরতাদদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন তা কারও কাছে অজানা নয়। আর পরবর্তী মুসলিম শাসকরাও এই ফরজ দায়িত্বের বিষয়ে ছাড় দেয়নি।

কিন্তু যদি মুসলিম শাসকরা এ ধরনের লোকদেরকে প্রাপ্য শাস্তি না দেয় বা তাদের ব্যাপারে কোনো আশাও না থাকে, তাহলে এই ফরজ দায়িত্ব মুসলমানের ওপর আরোপিত হবে। তারা তাদের দায়িত্বের মধ্যে থেকে এই ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। মোটকথা, বিদ্রোহ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, নেফাকি, মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া, মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা এবং মুরতাদ, যুদ্ধরত কাফের, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের সাথে জোট গঠন করার কারণে প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি ও দলকে সবধরনের বয়কট করা শুধু জায়েজই নয়, বরং ওয়াজিব। যদি মুসলমানদের কোনো দল বা সমাজ এই ফিতনাকে দূর করার এই বয়কটে ত্রুটি করে, তাহলে তাদের আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।[১৮২]

মুরতাদ হত্যার বিধান

এই বিষয়ে সকল মুসলমান একমত যে, (আল্লাহর কাছে পানাহ চাই) কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তাকে হত্যা করা আবশ্যক হয়ে যায়। আমাদের নিকট এটার মুসতাহাব পদ্ধতি হলো, এমন ব্যক্তিকে প্রথমে বন্দি করা হবে এবং পুনরায় ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে। যদি তার মনে ইসলাম নিয়ে কোনো সংশয় থেকে থাকে, যার ফলে সে ইসলাম ত্যাগ করেছে, সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা হবে। এতে যদি সে ইসলাম কবুল করে নেয় তাহলে উত্তম হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। এই বিধান শুধু মুরতাদ পুরুষের সাথে প্রযোজ্য। যদি ধর্মত্যাগী কোনো নারী হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না, বরং বন্দি করে রাখা হবে। যতক্ষণ না সে পুনরায় ইসলাম কবুল করে নেয়। হানাফি ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-ইখতিয়ারে' বলা হয়েছে,

(وإذا ارتد المسلم والعياذ بالله) عن الإسلام (يحبس ويعرض عليه الإسلام

১৮২. অলি হাসান খান টুনকি রহ.-এর ফাতাওয়ার এই অংশটুকু নেওয়া হয়েছে 'কাদিয়ানিয়ো কে সাত মুওয়ালাত', পৃষ্ঠা ৬৪-৮৩ থেকে। আরও দেখুন, ফাতাওয়ায়ে বাইয়িনাত, ১/২১৮-২৪১
এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে, এটা হজরতের ফাতাওয়ার প্রথম অংশ। পুরো ফাতাওয়া প্রায় ২০ পৃষ্ঠার। পরে এই ফাতাওয়া উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণ করা হয়। অধিকাংশ আলেম ও প্রতিষ্ঠানই এই ফাতাওয়ার সাথে একমত হন ও একে সত্যায়িত করেন। এই ফাতাওয়া এবং আলেমদের সত্যায়নসহ এক খণ্ডে স্বতন্ত্র বই আকারে প্রকাশ করে মারকাজে সিরিজিয়া, লাহোর। যার নাম দেওয়া হয় 'কাদিয়ানিয়ো কে মুকাম্মাল বায়ক্যাট প্যার মুত্তাফিকা ফাতাওয়া' (কাদিয়ানিদের পূর্ণ বয়কটবিষয়ক সম্মিলিত ফাতাওয়া)। (মুফতি উবাইদুর রহমান)

وتكشف شبهته، فإن أسلم وإلا قتل)، أما حبسه وعرض الإسلام عليه فليس بواجب لأنه بلغته الدعوة؛ والكافر إذا بلغته الدعوة لا تجب أن تعاد عليه فهذا أولى، لكن يستحب ذلك لأن الظاهر إنما ارتد لشبهة دخلت عليه أو ضيم أصابه فيكشف ذلك عنه ليعود إلى الإسلام وهو أهون من القتل. (الاختيار لتعليل المختار ٥٤١/٤، كتاب السير، فصل المرتد، ط. دار الكتب العلمية)

আল্লাহর পানাহ! যখন কোনো মুসলমান মুরতাদ হয়ে যাবে, তখন তাকে বন্দি করে তার সামনে ইসলাম পেশ করা হবে এবং তার সংশয় দূর করার চেষ্টা করা হবে, এতে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তাহলে ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। আর তাকে বন্দি করা বা তার সামনে ইসলাম পেশ করা ওয়াজিব নয়। কারণ তার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে। যেখানে কাফেরের নিকট একবার দাওয়াত পৌঁছার পর দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব নয়, সেখানে মুরতাদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়তা থাকবে না এটা স্পষ্টই। কিন্তু তাকে দাওয়াত দেওয়া মুসতাহাব, কেননা বাহ্যত তার ধর্মত্যাগের কারণ এটাই যে, তার অন্তরে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে অথবা সে কোনো নিপীড়নের শিকার হয়েছে, তাই এখন তার সংশয় দূর করতে হবে, যাতে সে ইসলামে ফিরে আসে। আর এটা তাকে হত্যা করার চেয়ে সহজ।[১৮৩]

আরেক গ্রন্থ 'তুহফাতুল ফুকাহা'-তে রয়েছে,

وأما حكم أهل الردة فنقول لهم أحكام من ذلك أن الرجل المرتد يقتل لا محالة إذا لم يسلم ولا يسترق لكن المستحب أن يعرض عليه الإسلام أولا فإن أسلم وإلا فيقتل من ساعته إذا لم يطلب التأجيل فأما إذا طلب التأجيل إلى ثلاثة أيام لينظر في أمره فإنه يؤجل ولا يزاد عليه ولكن مشايخنا قالوا الأولى أن يؤجل ثلاثة أيام ويحبس ويعرض عليه الإسلام فإذا وقع اليأس فحينئذ يقتل فأما المرأة فلا تقتل عندنا.(تحفة الفقهاء ٨٠٣/٣، كتاب السير، باب أخذ الجزية، ط. دار الكتب العلمية)

আমাদের নিকট মুরতাদদের বিধান হলো, যদি পুরুষ হয় তাকে হত্যা করা হবে, এতে ভিন্ন কোনো অবকাশ নেই, যদি না সে ইসলাম গ্রহণ করে। তাকে গোলাম বানানো যাবে না। তবে মুসতাহাব হলো, তার সামনে ইসলাম পেশ করা হবে, যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তো ভালোই। আর যদি চিন্তাভাবনা করার জন্য সময় না চায়, তাহলে সাথে সাথে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি চিন্তা-ফিকির করার জন্য সময় চায়, তাহলে তাকে সর্বোচ্চ

১৮৩. আল-ইখতিয়ার লি-তালিলিল মুখতার, ৪/১৪৫

তিন দিন সুযোগ দেওয়া হবে। আমাদের অনেক মাশায়েখের মত হলো, প্রথমে তিন দিন তাকে বন্দি করে রাখা হবে এবং তার সামনে ইসলাম পেশ করা হবে, আর যখন তার ইসলাম কবুল না করার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন আর দেরি না করে তাকে হত্যা করা হবে। আর মহিলার ক্ষেত্রে আমাদের মাজহাব হলো, তাকে হত্যা করা হবে না।[১৮৪]

মুরতাদের সম্পদ ও মালিকানার বস্তুর বিধান

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনটি মাসায়েল—

১. মুরতাদের সম্পদের বিধান।

২. মুরতাদের ওয়ারিস হওয়ার বিধান।

৩. মুরতাদের ঋণের হুকুম।

সম্পদের বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার রায় হলো, যেহেতু মুরতাদকে হত্যাই করে ফেলা হবে, তাই তার সকল সম্পদ থেকে তার মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে। সে আর তার সম্পদের মালিক থাকবে না। তবে যেহেতু তার ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুরও সম্ভাবনা রয়েছে, তাই মালিকানা বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্থগিত থাকবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে পূর্বের মতোই সকল সম্পদের মালিক থেকে যাবে। আর যদি মুরতাদ অবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেলা হয়, তাহলে তার সম্পদ ওয়ারিসদের হয়ে যাবে। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর নিকট শুধু মুরতাদ হওয়ার মাধ্যমেই তার মালিকানা বাতিল হবে না। যখন তাকে এই অপরাধে হত্যা করা হবে বা সে মুরতাদ হয়ে কোনো দারুল হারবে স্থায়ীভাবে চলে যাবে তখন বাতিল হবে। তুহফাতুল ফুকাহা গ্রন্থে রয়েছে,

> ومنها حكم مال المرتد وتصرفاته قال أبو حنيفة إنه موقوف فإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب بطل جميع ذلك إلا أن يدعي ولد جارية له فيثبت نسبه وتصير الجارية أم ولد له، وإن أسلم صح ذلك كله لأن ماله موقوف عنده بين أن يصير لورثته من وقت الردة وبين أن يبقى له إذا أسلم فالتصرفات المبنية عليه كذلك، وعند أبي يوسف تصرفاته صحيحة مثل تصرف الصحيح، وعند محمد تصرفاته مثل تصرف المريض لا تصح تبرعاته إلا من الثلث لأن عندهما ملكه باق بعد الردة وإنما يزول بالموت والقتل وإلحاق بدار الحرب.
> (تحفة الفقهاء ٣/٣١٠، كتاب السير، باب أخذ الجزية، ط. دار الكتب العلمية)

অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফার মতে, মুরতাদের সম্পদ ও সকল ধরনের হস্তক্ষেপ স্থগিত থাকবে। যদি মুরতাদ অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয় অথবা

---

১৮৪. তুহফাতুল ফুকাহা, ৩/৩০৮

সে দারুল হারবে চলে যায়, তাহলে এ সবকিছু বাতিল হয়ে যাবে। আর মুসলমান হলে মালিকানাও থাকবে এবং তার হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতোই মুরতাদ ব্যক্তির সকল হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদের মতে এমন ব্যক্তির সম্পদ ও তার হস্তক্ষেপ মুমূর্ষু ব্যক্তির হুকুমে। অর্থাৎ তার সকল বিষয় সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যেই কার্যকর হবে। মোটকথা, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের নিকট মুরতাদ হওয়ার পরেও ব্যক্তির মালিকানা বাকি থাকবে। তবে এই অবস্থায় তাকে হত্যা করা হলে বা দারুল হারবে চলে গেলে মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে।[১৮৫]

মুরতাদের ওয়ারিসের হুকুম

কোনো ব্যক্তি যদি মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার সম্পদের দুটি অবস্থা হয়।

ক. ওই সকল সম্পদ যা সে ইসলামে থাকাবস্থায় কামাই করেছে। সর্বসম্মতিক্রমে এই সম্পদ মুরতাদের ওয়ারিসগণ পাবে।

খ. ওই সকল সম্পদ যা সে মুরতাদ অবস্থায় কামাই করেছে। এ নিয়ে ইমাম আবু হানিফা আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফার মতে এই সম্পদ 'মালে ফাই'[১৮৬] বলে গণ্য হবে। আর সাহেবাইনের নিকট এই সম্পদগুলোও ওয়ারিসরা পাবে। 'আল-জামিউস সগির' গ্রন্থে রয়েছে,

مُرْتَد لَهُ مَال اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام وَمَال اكْتَسبهُ فِي حَال الرِّدَّة فَأسلم فَهُوَ لَهُ وَإِن لحق بدار الْحَرْب أَو مَاتَ على ردته فَمَا كَانَ لَهُ حَال الْإِسْلَام فَهُوَ لورثته وَمَا كَانَ فِي حَال الرِّدَّة فَهُوَ فَيْء وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهما الله) جَمِيع ذَلِك لورثته. (الجامع الصغير ص ٦٠٤، كتاب السير، باب الارتداد و اللحاق بدار الإسلام، ط. دار الأيمان سهارنبور)

মুরতাদ ব্যক্তি মুসলমান থাকাবস্থায় অথবা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর যে সম্পদ অর্জন করেছে, সবগুলোই তার মালিকানাধীন হবে, যদি সে ইসলাম কবুল করে নেয়। তবে মুরতাদ হওয়ার পর সে যদি কোনো দারুল হারবে চলে যায়, তাহলে মুসলমান থাকাবস্থায় যা কামিয়েছে তা ওয়ারিসরা পাবে আর মুরতাদ অবস্থায় যা কামিয়েছে তা 'মালে ফাই' বলে গণ্য হবে। এটা ইমাম আবু হানিফার মত। আর সাহেবাইনের (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) নিকট ব্যক্তির উভয় অবস্থার কামানো সব মালই তার ওয়ারিসরা পাবে।[১৮৭]

---

১৮৫. তুহফাতুল ফুকাহা, ৩/৩১০

১৮৬. কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার পরে যদি যুদ্ধ ছাড়াই তাদের সম্পদ হস্তগত হয়, তাহলে সেটাকে মালে ফাই বলা হয়। (আব্দুল্লাহ)

১৮৭. আল-জামিউস সগির, পৃ. ৪০৬

ইমাম মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ রচিত 'কিতাবুল আসল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

قلت : أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا في ردته أيكون ميراثا بين ورثته؟ قال : لا، ولكن يكون فيئا في بيت المال. قلت : ولم؟ قال : لأنه اكتسبه وهو مرتد حلال دمه بمنزلة أهل الحرب. وقال أبو يوسف ومحمد : نرى أن ما اكتسبه في ردته ميراث لورثته، ونرى عتقه في ردته جائزا، ولا يكون شيء مما اكتسبه في دار الإسلام فيئا، إلا أن محمدا قال في ذلك : هو فيما أعتق أو باع أو اشترى بمنزلة المريض... قلت : فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى؟ قال : نعم. قلت : فهل بلغك في هذا أثر؟ قال : نعم، بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قتل مرتدا وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى. وبلغنا نحو من ذلك عن علي وعبد الله بن مسعود.

قلت : أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل تقسم ماله بين ورثته وهو مقيم في الدار قبل أن تقتله؟ قال : لا. قلت : فإن لحق بأرض الحرب ثم رفع ذلك إلى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته؟ قال : نعم. قلت : وتعد هذا بمنزلته لو مات؟ قال : نعم. (الأصل ٥٩٤/٧، باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام، تـ د محمد بوينوكالن)

অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিকট মুরতাদ অবস্থায় অর্জিত সম্পদ 'মালে ফাই' বলে গণ্য হবে। তা ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন হবে না। কেননা ইরতেদাদের কারণে সে হত্যাযোগ্য হয়ে হারবিদের হুকুমে হয়ে গেছে। আর সাহেবাইনের নিকট ইরতেদাদ অবস্থায় অর্জিত সম্পদ ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন হবে। কেননা দারুল ইসলামে অর্জিত সম্পদ 'মালে ফাই' হয় না। তবে ইমাম মুহাম্মাদের নিকট মুরতাদ অবস্থায় নেককাজে খরচ করা, যেমন গোলাম আজাদ ইত্যাদিতে সে মুমূর্ষু ব্যক্তির হুকুমে হবে। অর্থাৎ, এ সকলকিছু তার এক-তৃতীয়াংশের মাঝেই কার্যকর হবে।... মুরতাদ দ্বিতীয়বার ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত থাকার ফলে যদি ইমাম তাকে হত্যা করে, তাহলে তার মাল ওয়ারিসদের মাঝে ইসলাম অনুযায়ী বণ্টন হবে। এর দলিল হলো হজরত আলি রা.-এর আমল, তিনি এক মুরতাদকে হত্যা করে তার সম্পদ ইসলাম অনুযায়ী ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন করেছেন। তেমনইভাবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকেও এমন বর্ণনা রয়েছে। হ্যাঁ, হত্যার পূর্বে যতক্ষণ সে দারুল ইসলামে আছে তার সম্পদ ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন করা হবে না। যদি মুরতাদ হয়ে সে কোনো দারুল হারবে চলে যায়, তাহলে সে মৃত ব্যক্তির হুকুমে চলে যাবে আর তার সম্পদ ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন করা

হবে।[১৮৮]

আল-ইখতিয়ার গ্রন্থে রয়েছে,

ويزول ملكه عن أمواله زوالا مراعى، فإن أسلم عادت إلى حالها، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت الديون التي عليه ونقلت أكسابه في الإسلام إلى ورثته المسلمين، وأكساب الردة فيء. (الاختيار لتعليل المختار ٦٤١/٤، كتاب السير، فصل المرتد)

মুরতাদের মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে তবে তা রক্ষিত থাকবে। যদি সে ইসলাম কবুল করে, তাহলে তার মালিকানা পূর্বের মতো থাকবে। আর যদি মারা যায় বা তাকে হত্যা করা হয় অথবা সে কোনো দারুল হারবে চলে যায় এবং কাজির পক্ষ থেকে তাকে দারুল হারবে সম্পৃক্ত হওয়ার হুকুম লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার ওপর যে মেয়াদী ঋণ ছিল তা তৎক্ষণাৎ আদায় করা হবে। ইসলাম অবস্থায় সে যা সম্পদ কামিয়েছে তা ওয়ারিসদের হয়ে যাবে আর মুরতাদ অবস্থায় যা কামিয়েছে তা 'মালে ফাই' বলে গণ্য হবে।[১৮৯]

মুরতাদের ঋণের হুকুম

যদি মুরতাদ ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সাহেবাইনের নিকট তার রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করা হবে, চাই তা ইসলামে থাকা অবস্থার কামাই হোক বা মুরতাদ হওয়ার পরের। ইমাম আবু হানিফা থেকে এই বিষয়ে একাধিক বক্তব্য বর্ণনা করা হয়। একটি বর্ণনা হলো, মুসলমান থাকা অবস্থায় যে ঋণ তা সে অবস্থার কামাই থেকে পরিশোধ করা হবে। আর মুরতাদ অবস্থার ঋণ মুরতাদ অবস্থার কামাই দিয়ে পূরণ করা হবে। তবে গ্রহণযোগ্য বর্ণনা হলো, প্রথমত মুসলমান থাকা অবস্থার সম্পদ দিয়েই ঋণ আদায় করার চেষ্টা করা হবে। তবে ঋণ যদি এত বেশি হয় যা মুসলমান অবস্থার সম্পদ দিয়ে পূরণ সম্ভব না, তখন মুরতাদ অবস্থার সম্পদ দিয়ে ঋণ পূরণ করা হবে।[১৯০]

আল-ইখতিয়ার গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে,

وحلت الديون التي عليه ونقلت أكسابه في الإسلام إلى ورثته المسلمين، وأكساب الردة فيء (سم)، وتقضى ديون الإسلام من كسب الإسلام، وديون الردة من كسبها (سم)، فإن عاد مسلما فما وجده في يد وارثه من ماله أخذه. (الاختيار لتعليل المختار ٦٤١/٤، كتاب السير، فصل المرتد)

---

১৮৮. আল-আসল, ইমাম মুহাম্মদ, ৭/৪৯৫

১৮৯. আল-ইখতিয়ার, ৪/১৪৬

১৯০. বাদায়েউস সানায়ে, ৭/১৩৯, কিতাবুস সিয়ার, বায়ানু আহকামিল মুরতাদ্দিন

মুরতাদের মেয়াদী ঋণ তৎক্ষণাৎ আদায় করা হবে। ইসলাম অবস্থায় সে যা কামিয়েছে তা ওয়ারিসরা পাবে আর মুরতাদ অবস্থার সম্পদ 'মালে ফাই' বলে গণ্য হবে। মুসলমান থাকা অবস্থায় সে যে ঋণগ্রস্ত হয়েছিল তা মুসলমান অবস্থার সম্পদ থেকে আদায় করা হবে। আর মুরতাদ অবস্থারটা সে অবস্থার সম্পদ থেকে। মুরতাদ ব্যক্তি যদি পুনরায় ইসলাম কবুল করে দারুল হারব থেকে চলে আসে, তখন ওয়ারিসদের কাছে তার যে সম্পদ তখন থাকবে সে ফিরিয়ে নিতে পারবে।[১৯১]

মুরতাদের হস্তক্ষেপের বিধান

মুরতাদের হস্তক্ষেপ চার প্রকারের।

১. ওই সকল হস্তক্ষেপ যা সর্বসম্মতিক্রমে কার্যকর হবে। সেগুলো হলো যার জন্য কোনো ধর্ম শর্ত নয়। যেমন তালাক।

২. ওই সকল হস্তক্ষেপ যা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল। সেগুলো হলো যার জন্য আসমানি ধর্ম শর্ত। যেমন বিবাহ, জবাইকৃত পশু হালাল হওয়া।

৩. সে সমস্ত হস্তক্ষেপ যা সর্বসম্মতিক্রমে স্থগিত থাকবে। যেমন শিরকতে মুফাওয়াজা।[১৯২] কেননা শিরকতে মুফাওয়াজা সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো উভয় শরিক সকল ধরনের অধিকারে সমান হওয়া। আর মুরতাদ অনেক অধিকারেই মুসলমানের সমান নয়।

৪. ওই সকল হস্তক্ষেপ যা কার্যকর হওয়া আর না হওয়ার বিষয়টি ফকিহদের মাঝে মতানৈক্যপূর্ণ। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ইত্যাদি। ইমাম আবু হানিফার নিকট এ সকল হস্তক্ষেপ স্থগিত থাকবে। যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে কার্যকর হবে, অন্যথায় নয়। আর সাহেবাইনের নিকট এ সকল হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে। বাকি ইমাম মুহাম্মাদের নিকট এমন ব্যক্তির হুকুম মুমূর্ষু ব্যক্তির মতো। তার সকল হস্তক্ষেপ শুধু সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মাঝে কার্যকর হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফের নিকট স্বাভাবিক মানুষের মতো পুরো সম্পদের মাঝেই তার হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে।

জামিউস সগির গ্রন্থে আছে,

> مرتد أعتق أو وهب أو باع أو اشترى ثم أسلم جاز ما صنع وإن لحق أو مات على ردته بطل ذلك كله وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يجوز ما صنع في الوجهين وقال محمد رحمه الله هو في ذلك بمنزلة المريض. (الجامع الصغير ص ٦٠٤، كتاب السير، باب الارتداد و اللحاق بدار الإسلام، ط. دار الأيمان

---

১৯১. আল-ইখতিয়ার, ৪/১৪৭

১৯২. শিরকতে মুফাওয়াজা বলা হয়, এমন শিরকত যেখানে শরিকদের সবকিছুতেই একরকম হতে হয়, এমনকি উভয়ের ধর্মও এক হতে হয়।

سهارنبور. وليراجع للاستزادة : الهداية في شرح بداية المبتدي، شرح السير الكبير، باب ما يوافق من أمر المرتدين و مالا يوقف من ذلك)

মুরতাদ যদি গোলাম আজাদ করে বা কোনো হাদিয়া দেয় অথবা কোনো ক্রয়-বিক্রয় করে, এ সকল লেনদেনের বিধান হলো, সে যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে কার্যকর হবে। আর যদি এই অবস্থায় সে মারা যায় বা দারুল হারবে চলে যায়, তাহলে এসব হস্তক্ষেপ বাতিল বলে গণ্য হবে।[১৯৩]

ফায়েদা : এই মতানৈক্য মুরতাদ পুরুষের সাথে প্রযোজ্য। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো নারী মুরতাদ হয়, তাহলে হানাফিদের নিকট যেহেতু তাকে হত্যা করা ওয়াজিব নয়, তাই তার এ সকল হস্তক্ষেপ কার্যকর হয়ে যাবে।

জিন্দিকের বিধান

কোনো মুসলমান যদি জিন্দিক হয়ে যায়, তাহলে তার হুকুম ওটাই যা মুরতাদের হুকুম। পেছনে যা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যদি কোনো অমুসলিম জানদাকার পথ অবলম্বন করে, চাই সে হারবি হোক বা জিম্মি, তার কী হুকুম? আল্লামা ইবনে কামাল পাশা রহিমাহুল্লাহ এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার বক্তব্যের খোলাসা হলো, যদি এমন ব্যক্তি নিজের জানদাকা ও ইলহাদের প্রতি দাওয়াত না দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। এই ব্যক্তি হলো অনেকটা এমন, যে একটি কুফর থেকে অন্য আরেকটি কুফর গ্রহণ করেছে। যেমন কেউ খ্রিষ্টান বা মাজুসি ছিল, পরে সে হিন্দু অথবা ইহুদি হয়েছে। আর যদি সে তার এই জানদাকা আর ইলহাদের দিকে দাওয়াত দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা জরুরি। যদি গ্রেফতার করার পূর্বে সে নিজে থেকে তাওবা করে এবং জানদাকা থেকে ফিরে এসেছে এটার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে, তাহলে এমন সুরতে তাকে হত্যা করা হবে না। 'ফাতাওয়ায়ে শামি'-তে উল্লেখ হয়েছে,

اعلم أنه لا يخلو، إما أن يكون معروفا داعيا إلى الضلال أو لا. والثاني ما ذكره صاحب الهداية في التجنيس من أنه على ثلاثة أوجه : إما أن يكون زنديقا من الأصل على الشرك، أو يكون مسلما فيتزندق، أو يكون ذميا فيتزندق، فالأول يترك على شركه إن كان من العجم، أي بخلاف مشرك العرب، فإنه لا يترك. والثاني يقتل إن لم يسلم لأنه مرتد. وفي الثالث يترك على حاله لأن الكفر ملة واحدة اهوالأول أي المعروف الداعي لا يخلو من أن يتوب بالاختيار ويرجع عما فيه قبل أن يؤخذ أولا، والثاني يقتل دون الأول اه. (حاشية ابن عابدين ١٤٢/٤، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب في الفرق بين الزنديق والمنافق و الدهري والملحد)

১৯৩. আল-জামিউস সগির

জিন্দিকের দুই সূরত; হয় সে তার মতাদর্শের দিকে অন্যকে দাওয়াত দেয় অথবা দেয় না। নিজের জানদাকার মতাদর্শ অন্যের কাছে প্রচার করে না, এর আবার তিন সুরত হতে পারে। ১. জন্মগত মুশরিক থেকে জিন্দিক হয়েছে। ২. মুসলমান থেকে জিন্দিক হয়েছে। ৩. জিম্মি থেকে জিন্দিক হয়েছে। প্রথম সুরতে যদি সে অনারবি মুশরিক হয়, তাহলে তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে। যেহেতু আরবে মুশরিকদের হত্যা ছাড়া অন্য বিধান নেই। দ্বিতীয় প্রকারের জিন্দিক যেহেতু মূলত মুরতাদ, তাই সে ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে। আর তৃতীয় প্রকারের জিন্দিককেও তার অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে। কেননা সকল কাফেরের বিধান একই। আর জিন্দিক যদি নিজ মতাদর্শের প্রচারক হয়, আর গ্রেফতারের পূর্বে নিজ ইচ্ছাতে তাওবা করে নেয়, তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে অন্যথায় হত্যা করা হবে।[১৯৪]

জিন্দিকের তাওবা কবুল হবে কি না এই নিয়ে হানাফি ফকিহদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কাজি খান রহ.-সহ অন্যান্য ফকিহ এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, যদি গ্রেফতারের পূর্বে সে তাওবা করে নেয়, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে এবং হত্যার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। আর গ্রেফতারের পর তাওবা করলে দুনিয়ার বিবেচনায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে,

(و) كذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له، وجعله في الفتح ظاهر المذهب، لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه (إذا أخذ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي (قبل توبته) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت. (الدر المختار مع رد المحتار ١٤٢/٤، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب في الفرق بين الزنديق والمنافق و الدهري والملحد)

যে ব্যক্তি জানদাকার মাধ্যমে কাফের হয় তার তাওবা কবুল হয় না। তবে ফাতাওয়ায়ে কাজিখানে উল্লেখ হয়েছে যে, ফাতাওয়া হলো এই কথার ওপরে যে, জিন্দিক যে নিজ মতাদর্শের প্রচার করে, যদি তাওবা করার পূর্বে গ্রেফতার হয়, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে না। তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি গ্রেফতারের পূর্বেই তাওবা করে নেয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।[১৯৫]

আধুনিক ইলহাদ ও জানদাকা

বর্তমান জামানায় ইলহাদ ও জানদাকার তুফান চলছে যা শেষ হওয়ার কোনো

১৯৪. ফাতাওয়ায়ে শামি, ৪/২৪১

১৯৫. ফাতাওয়ায়ে শাম, ৪/২৪১

সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না! নিত্যদিন নতুন নতুন ফিতনা ও রংবেরঙের পথভ্রষ্টতা সমাজে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ এগুলো দ্রুত শেষ করে দিন। আমিন। বড় দুঃখজনক বিষয় হলো, অতীতের তুলনায় বর্তমানে ইলহাদ ও জানদাকার আসবাব ও উপকরণ ও সেগুলোর উপযোগী পরিবেশ অনেক বেশি। যার কারণে অসংখ্য রূপে সেগুলো প্রকাশিত হচ্ছে। মৌলিকভাবে ইলহাদ ও জানদাকার দুটি বাহ্যিক সুরত রয়েছে। এক. দ্বীনের আকৃতি ধারণ করা জানদাকা। দুই. দুনিয়ার শিরোনামে ছড়ানো জানদাকা।

প্রথম সুরত কাদিয়ানি, আগাখানি, রাফেজি, মুনকিরিনে হাদিস ইত্যাদি দলগুলোর রূপে প্রকাশ হয়। এরা নিজেদের কাজগুলোকে ইসলামের নামে প্রকাশ করে, কিন্তু কুফরি বিশ্বাস ও মতবাদ নিজেদের মাঝে পোষণ করে। নিজেদের খুব জোরেশোরে মুসলমান বলে প্রকাশ করে। সাথে দ্বীনের বহু অকাট্য বিষয় অস্বীকার করে। আবার মানুষকেও নিজেদের এই সকল গোমরাহি ও কুফরের জালে ফাঁসানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়। উম্মতের একটি বড় অংশ এদের ফিতনার জালে আটকা পড়ে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহির অতল সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছে।

আর দ্বিতীয় সুরত যা দুনিয়ার শিরোনামে প্রকাশ হয়। সেটা হলো ইসলামের বিপরীত বিভিন্ন জীবনব্যবস্থাকে নিজেদের জন্য বেছে নেয় এবং সেগুলোকে অনেকটা ধর্মের মতোই গ্রহণ করে থাকে। এই মতাদর্শের ফিতনা বোঝার জন্য আবুল হাসান আলি নদবির ছোট্ট পুস্তিকা ردة ولا أبا بكر لها (চারদিকে রিদ্দাহের ফিতনা, নেই কোনো আবু বকর) পড়া যেতে পারে। যার উর্দু অনুবাদও রয়েছে।[১৯৬]

মনে রাখা দরকার, সাধারণ কুফর থেকেও উম্মাহর জন্য জানদাকা বেশি ক্ষতিকর। কেননা তা আস্তিনের ভেতরে থেকে মুসলিমদের মাঝে দ্বীনের নামে কুফর ছড়িয়ে দেয়। ইসলামের নামে তাদের পথভ্রষ্টতা প্রচার করতে থাকে, যার কারণে ইসলামের ঐক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়। তাদের কথার ধোঁকায় পড়ে কত মুসলমান মনের অজান্তেই ইসলামের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা আল্লাহই ভালো জানেন! কিন্তু একজন সাধারণ কাফেরের দ্বারা এমন ক্ষতি হয় না। এজন্য উম্মতের রাহবারগণের ও কল্যাণকামীদের উচিত এ সকল জিন্দিক থেকে নিশ্চিন্ত না হয়ে যাওয়া, বরং তাদের ব্যাপারে যে শরয়ি বিধান আছে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে যাওয়া। আর যেখানে তা সম্ভব নয়, সেখানে এই গোমরাহি থেকে উম্মাহর ঈমানের সম্পদ বাঁচানোর জন্য নিজেদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করে যাওয়া।

---

১৯৬. বইটির চমৎকার বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা হাসান আজিজ হাফিজাহুল্লাহ 'ধর্মহীনতার ভয়াল স্রোত; নেই কোনো আবু বকর' নামে। প্রকাশ করেছে সঞ্জীবন প্রকাশনী।

পঞ্চম অধ্যায়

বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কিছু আপত্তি ও তার জবাব

- বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আপত্তি ও তার জবাব
- কুরআন-হাদিস থেকে দলিল দেওয়ার ক্ষেত্রে উসুলে ফিকহের গুরুত্ব
- ব্যাপকভাবে বর্ণিত নসকে নির্দিষ্ট যুগের সাথে খাস করা
- মুওয়ালাত শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ভুল ধারণা
- শেষকথা ও কিছু নিবেদন

এ পর্যন্ত তো মুসলিম-অমুসলিম সংক্রান্ত মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ, তার বিভিন্ন স্তর এবং সেগুলোর ফিকহি বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বর্তমান যুগে 'মুসলিম-অমুসলিমের' সম্পর্ক নিয়ে যে সংশয় ও সন্দেহ উত্থাপিত হয় অথবা মুখলিস মুসলিম শ্রেণি এ সম্পর্কে যে-সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়, সেগুলোকেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম আপত্তি : মুসলমান ও কাফের এই পার্থক্য কেন?

সাধারণত এই আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে বিধিবিধান এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য ইনসাফ ও মানবতা পরিপন্থী। সকল মানুষের প্রতি একই আচরণ দেখানো উচিত। এটা কেমন ন্যায্যতা যে, নিজ অনুসারীদের জন্য সবকিছু সহজ হয়, অথচ অন্য লোকদেরকে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক থেকেও বঞ্চিত করা হয়?

জবাব

এই আপত্তির ওপর আমরা যতই চিন্তাভাবনা করব, ততই এই সত্যটি ফুটে উঠবে যে, প্রকৃতপক্ষে এই আপত্তির মৌলিক উৎস হলো কুফর ও ইসলামের বৈশিষ্ট্য, উভয়ের প্রকৃত অবস্থান, কুফরের অস্বাভাবিক ক্ষতি এবং ইসলামের বিবিধ উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞতা, বা সেগুলো স্মরণে না রাখা। কুফর অর্থ অকৃতজ্ঞতা, অসম্মান, অবাধ্যতা এবং উপকারকারীর অকৃতজ্ঞ হওয়া। অথচ ইসলাম হলো আনুগত্য ও অনুসরণের সমষ্টি। কুফর গ্রহণ করার কারণে ব্যক্তি যে বেইনসাফি, বরং বিদ্রোহ ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তার প্রতিকার স্বরূপ তার প্রতিও এই আচরণ করা হয়, তাহলে আপত্তি আসবে কেন?

ইসলামি শরিয়তের মহানুভবতা ও পরম অনুগ্রহ যে, কুফরের মতো বিশাল অপরাধের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে সর্বাবস্থায় বিদ্রোহকে সমর্থন করে না, বরং জিম্মি হয়ে ও শান্তিচুক্তির মাধ্যম বেঁচে থাকার সুযোগ দেয় এবং মুসলিমদের অনুরূপ তাদের জীবন ও মর্যাদা রক্ষিত ও নিরাপদ বলে ঘোষণা করে। শুধু নির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিষিদ্ধ, যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

কাফেরদের সাথে সম্পর্কের এই সীমারেখা কাফেরদের নিজেদের জন্যও খুব উপকারী এবং সমস্ত দূরত্ব বাদ দিয়ে মুসলমানরা তাদের সাথে মেশা তাদের জন্যও ক্ষতিকর। এর কারণে তাদের মৌলিক দুর্বলতার অনুভূতি হবে।

অন্যদিকে এই বিভাজনরেখা ইসলামি সমাজ ও মুসলিম ব্যক্তিবর্গের জন্যও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কুফর ও ইসলামের মধ্যে যদি দূরত্ব ও কার্যত পার্থক্য না থাকে, তাহলে আশঙ্কা রয়েছে শয়তানের অনুসারীরা মুসলিমদের বিশাল অংশকে ইরতেদাদ ও ধর্মত্যাগের দিকে নিয়ে যাবে।

এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত, মুসলিম-কাফেরের বিভেদরেখা ঠিক রাখার অর্থ এই নয় যে, কাফেরের সাথে অন্যায় আচরণ করা হবে এবং তার জানমাল বা ইজ্জত বিনা কারণে লঙ্ঘিত হবে, বরং শরিয়ত এই নৃশংসতার দরজাকেও বন্ধ করে দিয়েছে। ভালোবাসা ও মুহাব্বত না থাকা এক জিনিস, আর জুলুম ও অন্যায় করা ভিন্ন জিনিস। শরিয়ত প্রথম মতকে সমর্থন দেয়। জুলুম ও অন্যায়ের প্রতি মোটেও প্রশ্রয় দেয় না।

দ্বিতীয় আপত্তি : আহলে কিতাবদের নারীদের বিবাহ জায়েজ

কাফেরদের সাথে সম্পর্কের এই সীমারেখার ব্যাপারে একটি আপত্তি হলো, শরিয়ত আহলে কিতাব নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। আর বিয়ে স্নেহ-ভালোবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই শরিয়তের দৃষ্টিতে কাফেরদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখাতে কোনো সমস্যা নেই। নইলে আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ে করা বৈধ হতো না। আল্লামা ইউসুফ কারজাবি সাহেব আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ জায়েজ, এই বিষয়টি উল্লেখ করে লেখেন,

> وهذا يدل على أن مودة المسلم لغير المسلم لا حرج فيها، وكيف لا يواد الرجل زوجته إذا كانت كتابية؟ وكيف لا يواد الرجل جده وجدته وخاله وخالته إذا كانت أمه ذمية؟ .(غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص ٥٧)

> এটা এই বিষয়ের দলিল যে, অমুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা রাখা জায়েজ। স্ত্রী আহলে কিতাব হলে একজন পুরুষ কীভাবে তার স্ত্রীকে ভালো না বেসে থাকবে? মা যখন জিম্মি, তাহলে একজন লোক কীভাবে তার নানা-নানি, মামা-খালাকে ভালো না বেসে পারবে?

জবাব

একদিকে লেখার শুরুতে যেসব সুস্পষ্ট নস উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে কাফেরদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা স্পষ্ট ও কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এগুলো অস্পষ্ট দলিল। 'ভালোবাসা' বিবাহের এমন অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, যা তা থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। এজন্যই বিবাহের অনুমতি আর ভালোবাসার সম্পর্ক না রাখার নসগুলো সাংঘর্ষিক নয়। বিপরীত কথা তখন হতো, একদিকে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতে স্পষ্ট নিষেধ করা হচ্ছে, আবার অন্যদিকে স্পষ্ট অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আসলে বিষয়টি এমন নয়।

আল্লামা জাসসাস রহিমাহুল্লাহ লেখেন,

> الآية إنما اقتضت النهي عن الوداد، والتحاب، فأما نفس عقد النكاح فلم تتناوله الآية، وإن كان قد يصير سببا للموادة، والتحاب، فنفس العقد ليس هو الموادة، والتحاب إلا أنه يؤدي إلى ذلك فاستحسنوا له غيرهن. (أحكام القرآن

١١٤/١، مطلب : الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به بغير الأكل ويجوز بيعه بشرط بيان عيبه)

> আয়াতের ভাষ্য হলো, কাফেরদের সাথে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা রাখা অবৈধ, তবে তাদের সাথে কেবল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে উল্লিখিত আয়াত (এ বিষয়ে নীরব) অন্তর্ভুক্ত করে না, যদিও বিবাহের এই চুক্তিটি কখনো কখনো গভীর ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতার মাধ্যম হয়ে থাকে, কিন্তু বিবাহের চুক্তিটিই ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতাকে আবশ্যক করে না। তবে যেহেতু এটি সেদিকে মানুষকে ধাবিত করে, তাই ফকিহগণ আহলে কিতাব মহিলাদের বিবাহ না করে মুসলিম মহিলাদের বিবাহ করাকেই উত্তম বলেছেন।[১৯৭]

মনে রাখা চাই যে, স্বভাবজাত মুহাব্বত যা মনের অজান্তেই আসে এমন ভালোবাসা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে মানুষ মুকাল্লাফ নয়, তাই যদি আহলে কিতাব স্ত্রীর প্রতি স্বভাবজাত ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার কিছু নেই।

তৃতীয় আপত্তি : এটা তো পূর্বের যুগের বিধান

এ মাসআলায় তৃতীয় বড় আপত্তি হলো, যেসব আয়াতে মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের ঘৃণা, তাদের প্রতারণা ও কূটচাল ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে, এবং এর ওপর ভিত্তি করে তাদের সাথে ভালোবাসা ও মুহাব্বতের সম্পর্ক না রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে—মূলত তা পূর্বযুগের কাফেরদের সাথে সম্পর্কিত। তখনকার কাফেরদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও তখনকার সাময়িক বিবেচনায় মুসলমানদেরকে কুরআন-হাদিসে এই বিধানাবলি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন যেহেতু কাফেরদের আর সেই অবস্থা নেই, তাই এ সকল বিধান পালন আবশ্যক নয়। বরং মানুষ হিসাবে সবার সাথে ভালো ব্যবহার এবং বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখার স্বাধীনতা রয়েছে, কেবল ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা ভুল।

জবাব

আসল বিষয়টি হলো, এটি আধুনিক সময়ের এমন একটি মৌলিক আপত্তি যা কেবল আলোচ্য মাসআলার ওপরই করা হচ্ছে এমন নয়, বরং এর পরিধি খুব প্রশস্ত ও বিস্তৃত। আপাত দেখতে নিষ্পাপ এই আপত্তি মেনে নেওয়া হলে ইসলামের অধিকাংশ বিধানকেই সংশোধন এবং সংযোজন করা জরুরি হয়ে পড়বে। আর তার পরিণতি হবে তাই, যা আজ আমরা ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় ঐক্যের স্লোগানে দেখতে পাচ্ছি।

এই আপত্তির খণ্ডনে একটি মূলনীতি আলোচনাই এখানে যথেষ্ট মনে করছি। তা হলো, যে নসগুলোতে 'কাফেরদের প্রতি ভালোবাসা নিষিদ্ধ' হুকুম দেওয়া হয়েছে, সেখানে الذين آمنوا (যারা ঈমান এনেছে) ও المؤمنون (মুমিনগণ) ইত্যাদি

---

১৯৭. আহকামুল কুরআন, ২/১৮

শব্দসমূহ দিয়ে মুসলিমদের সম্বোধন করা হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট প্রকারের মুসলিম বা কাফেরের উল্লেখ সেগুলোতে নেই। বরং সব স্থানেই এমন ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা অর্থের দিক থেকে সকল প্রকারের মুসলিম ও কাফেরকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ছাড়া কুরআন-হাদিসের নসসমূহে সময় ও স্থানের কোনো শর্ত নেই। তাই এই বিধান সবসময় এবং সব স্থানে প্রযোজ্য।

উসুলে ফিকহের মূলনীতির আলোকেও এই সকল নস নির্দিষ্ট সময়ের সাথে শর্তযুক্ত (মুকাইয়াদ) নয়। বরং সময় ও স্থানের সকল শর্তমুক্ত। যাকে উসুলে ফিকহের পরিভাষায় 'মুতলাক' বলা হয়। আর মুতলাক নসের (শর্তহীন বর্ণিত নসসমূহের) বিধান হলো, সেগুলোকে শর্তমুক্তই রাখতে হবে। শরয়ি কোনো দলিল ছাড়া সেগুলোকে শর্তযুক্ত করার অধিকার কারও নেই। বরং শরয়ি দলিল ছাড়া নিজেদের মনমতো শরিয়তের শর্তহীন নসকে শর্তযুক্ত করা বা শর্তযুক্ত নসকে শর্তহীন করা শরিয়তপ্রণেতা ও বিধানদাতার অধিকার নিজের হাতে নেওয়ার নামান্তর। যা অসংখ্য বিদআতের শিকড়।

আরেকটি দিক হলো, নুসুসের মধ্যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার আসল কারণ বলা হয়েছে 'কুফর', অন্য কোনো সাময়িক মাসলাহাত নয়। তাই যেখানে, যখনই এবং যার মধ্যে নিষেধের মূল কারণ 'কুফর' পাওয়া যাবে, সেখানেই এই বিধান হবে।

কিছু কিছু নস থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম ও ঈমানের একমাত্র দাবি হলো কুফর ও আহলে কুফরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা পরিহার করা। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি বাস্তব অর্থে ইসলাম এবং ঈমানের সৌভাগ্যে দীক্ষিত হয়, তাহলে সে কুফর ও আহলে কুফরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। কুফর ও ঈমান বিপরীতমুখী দুই জিনিস, যেখানে একটির প্রতি ভালোবাসা অন্যটির প্রতি ঘৃণা জন্মায়।

সুরা মায়েদার ৮১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের একটি দোষের কথা এটাও উল্লেখ করেছেন যে, তারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

> تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ.
>
> আপনি ওদের অনেককে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখছেন। কতই-না নিকৃষ্ট সেই বস্তু, যা ওরা নিজেরা নিজেদের জন্য অগ্রে পাঠিয়েছে, তা হচ্ছে ওদের প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি। আর ওরা আজাবে চিরকাল থাকবে।

> ওরা যদি আল্লাহ ও নবীর প্রতি এবং যা নবীর প্রতি নাজিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখত, তবে কাফেরদের বন্ধু বানাত না; কিন্তু ওদের অনেকেই নাফরমান।[১৯৮]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ঈমানের দাবি হলো কাফেরদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক না রাখা, বরং জরুরি হলো 'কুফর'—এই অপরাধের কারণে তার সাথে ঘৃণা ও সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেওয়া। যদি নির্দিষ্ট কাফেরদের ওপর হুকুমের মূল মানদণ্ড হতো, তাহলে বনি ইসরাইলকে এই হুকুম দেওয়া হতো না, হজরত ইবরাহিম আ. পুরো কুফফারগোষ্ঠীর সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতার ঘোষণা দিতেন না।

যদি 'সাময়িক বিবেচনাই' মাসআলার মূল কারণ হতো, তাহলে কোনো একটি নসে হলেও তা স্পষ্ট থাকত। এই সাময়িক বিবেচনা শেষ হওয়ার দ্বারা বিধানটিও রহিত হয়ে যেত। অথচ আমরা দেখতে পাই ইবরাহিম আ.-এর এই ঘোষণা,

> إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

> আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য প্রকাশ্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।[১৯৯]

এর মাধ্যমে এটাই স্পষ্ট করতে চাচ্ছেন যে, কাফেরদের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ না তারা ঈমান কবুল করে। এর শেষ সীমা কোনো 'সাময়িক বিবেচনা' উদ্ধার হওয়া পর্যন্ত নয়, বরং কুফরের অস্তিত্ব বিনাশ করাই এর শেষ সীমা। এটি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এই হুকুমের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কুফর।

কুরআন-হাদিস থেকে দলিল পেশ করার ক্ষেত্রে উসুলে ফিকহের গুরুত্ব

কুরআন ও সুন্নাহর নসসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার নিরাপদ রাস্তা হলো উসুলে ফিকহের পূর্ণ অনুসরণ করে নিজের মতের পক্ষে কুরআন ও হাদিসকে দলিল হিসাবে পেশ করা। যদি এই বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া হয়, অথবা কার্যতক্ষেত্রে তাতে সচেতন না হওয়া যায়, তাহলে এর মাধ্যমে নিত্যনতুন বিকৃতির আবির্ভাব ঘটতেই থাকবে। আর বিকৃতির দরজা আরও প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হবে। এর ফলে এই পবিত্র দ্বীন একটি খেলনার বস্তুতে পরিণত হবে। 'দ্বীনের বিকৃতি' থেকে বেঁচে থাকার নিরাপদ রাস্তা হলো উসুলে ফিকহের পূর্ণ অনুসরণ করে কুরআন-হাদিস থেকে দলিল পেশ

---

১৯৮. সুরা মায়েদা : ৮০-৮১

১৯৯. সুরা মুমতাহিনা : ৪

করা ও বিধান আহরণ করা।

ব্যাপকভাবে বর্ণিত নসকে নির্দিষ্ট যুগের সাথে খাস করা

যে-সকল নসে কাফেরদের সাথে ভালোবাসা ও মৈত্রীর সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে বা এ জাতীয় যত নস রয়েছে সবগুলোই 'আম' (ব্যাপক অর্থবোধক)। সেগুলোকে নির্দিষ্ট করে শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সাথে খাস করার পক্ষে মজবুত কোনো ভিত্তি নেই। নসের মধ্যে 'কাফের' শব্দ রয়েছে। যা একটি 'আম' শব্দ। যা তার সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে, অর্থাৎ সকল যুগে যারাই কাফের বলে বিবেচিত হবে, তারাই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এখন কোন দলিলের ভিত্তিতে কোনো নির্দিষ্ট যুগের কাফেরকে এই আম হুকুম থেকে তাখসিস (নির্দিষ্টকরণ) করা হচ্ছে?

প্রসিদ্ধ কালামশাস্ত্রবিদ আল্লামা বাকিল্লানি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৪০৩ হি.) লেখেন,

> فصل : القول في أنه لا يجوز تخصيص العام بعادة المخاطبين وإنما لم يجب ذلك، لأن الشرع لم يوضع فيما ورد به من تحليل وتحريم، وغير ذلك على عادة المكلفين، وإنما وضعه سبحانه على ما بينا من تديين عباده... ولا فرق بين أن تكون العادة المتقررة بينهم عادة شرعية أو مألوفة منهم بغير شرع. فإذا جاء الخطاب العام يمنع ذلك وجب منع جميعه.
>
> وهذا نحو أن يقول : قد حرمت عليكم الطعام والشراب في يومكم هذا، أو يقول قد حرمت عليكم البيع، وهم معتادون لأكل طعام مخصوص وشرب شراب مخصوص وبيع أجناس مخصوصة. وعلى صفات مخصوصة. فليس لأحد أن يقول هذا الإطلاق محمول على ما عادتهم أكله وشربه وتبايعه لأجل أن الاسم عام مطلق. ويمكن أن يكون من مصلحتهم تحريم أكل شيء وشربه، مما هو عادة لهم بشرع/ متقدم أو عادة توافت على اعتيادها هممهم والحكم متعلق بقول صاحب الشرع ومقتضاه لا بعادتهم. (التقريب و الإرشاد (الصغير) ٣٥٢/٣، باب الكلام في فصول النهي وأحكامه)

এই পরিচ্ছেদটি এ আলোচনাসংক্রান্ত যে, সম্বোধিত ব্যক্তিদের আদত বা অভ্যাসের ভিত্তিতে (কুরআন-সুন্নাহর) কোনো আম (ব্যাপক) বক্তব্যকে খাস করা যাবে না। আর তা আবশ্যকও নয়। কেননা হালাল, হারাম বা অন্য যেসব বিধান শরীয়ত নির্ধারণ করেছে, সেসব ব্যাপারে মুকাল্লাফদের (যাদের ওপর শরিয়তের বিধিবিধান প্রযোজ্য হয় তাদের) আদত-অভ্যাসের ভিত্তিতে করেনি। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের পক্ষ থেকে তার বান্দাদেরকে দ্বীনের ওপরে ওঠানোর জন্য নির্ধারণ করেছেন, যেমনটা আমরা পূর্বে বলেছি... এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার নির্ধারিত আদত-অভ্যাস

চাই তা শরিয়তসম্মত হোক অথবা শরিয়ত ছাড়া তাদের নিজেদের মাঝে পরিচিত হোক, তাতে এই মূলনীতিতে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। সুতরাং যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সেসবের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কোনো ব্যাপক সম্বোধন আসবে, তখন সকলেই তা মেনে নিতে হবে।

এটার উদাহরণ এভাবে দেওয়া যায় যে, (ধরে নেই) আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি তোমাদের ওপরে আজকের এই দিনে পানাহার হারাম করে দিলাম, অথবা বললেন, আমি তোমাদের ওপর ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করলাম, এমতাবস্থায় যে তারা বিশেষ খাবার খেতে, বিশেষ পানীয় পান করতে এবং বিশেষ কিছু জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় বিশেষ কিছু পদ্ধতিতে করতে অভ্যস্ত। তাহলে এ ক্ষেত্রে কারও জন্যই এমনটি বলার সুযোগ নেই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞাটি তাদের পানাহার এবং ক্রয়-বিক্রয়ের অভ্যাসের ওপর প্রয়োগ হবে (অর্থাৎ সে নিষেধাজ্ঞা শুধু ওইসব জিনিসের সাথেই খাস হবে)। কেননা, এখানে শব্দগুলো মুতলাক (শর্তবিহীন) এবং আম (ব্যাপক)। এটা অসম্ভব নয় যে, পূর্ববর্তী শরীয়ত কিংবা অভ্যাস অনুযায়ী তারা যেসব পানাহারে অভ্যস্ত সেগুলো হারাম করার মাঝেই তাদের কল্যাণ। অতপর মূল হুকুম শরিয়তপ্রণেতার বক্তব্য ও সেই বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী হবে, তাদের অভ্যাস অনুযায়ী হবে না।[২০০]

চতুর্থ আপত্তি : সুরা মুমতাহিনার আয়াতে তো ভালো সম্পর্ক রাখার আদেশ দেওয়া আছে

এই মাসআলার ওপর আরেকটি মৌলিক আপত্তি উত্থাপন করা হয়, যা অনেক আলেম ও মুখলিস মানুষদেরও থেকেও হয়েছে, তা হলো, সুরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তাআলা 'হারবি নয়' এমন কাফেরদের সাথে সদয় ও ভালো কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন এবং 'হারবি' কাফেরদের সাথে তা থেকে নিষেধ করেছেন। এ থেকে বোধগম্য হয়, যদি কোনো কাফের 'হারবি' না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত নসগুলো প্রযোজ্য হবে না। তার সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে শরিয়তে কোনো বাধা নেই।

সুরা মুমতাহিনার আয়াতটি হলো,

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ.

---

২০০. আত-তাকরিব ওয়াল-ইরশাদ, ৩/২৫৩

> যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কারও করেনি, আল্লাহ তোমাদের তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ তো তোমাদের কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কারকরণে সহযোগিতা করেছে। আর যারা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই পাপী।[২০১]

এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করে সমকালীন কিছু আলেমের মত হলো, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার নিষেধাজ্ঞামূলক যত নস বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোর সম্পর্ক হারবি কাফেরদের সাথে। যদি কোনো ব্যক্তি কাফের হওয়া সত্ত্বেও জিম্মা চুক্তিতে মুসলিমদের সাথে বসবাস করতে চায়, তাহলে সে সাধারণ মুসলিমের মতো নাগরিক হবে এবং একই দেশের জনগণ হওয়ার কারণে সে একজন মুসলমানের মতো সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পাবে। কিছু কিছু হাদিসেও এর ইঙ্গিত রয়েছে যে, জিম্মি কাফেরদের অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে তা সাধারণ মুসলিম নাগরিকদের মতো হবে।

বর্তমান আধুনিকতাবাদীরা কেবল এই একটি আয়াতকে ভিত্তি বানিয়ে সে সকল নসকে পেছনে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে, যেগুলো কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যার অল্প কয়েকটি কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত তাদের এই ভ্রান্ত মত খণ্ডনের প্রয়োজন বোধ করি না। আর তাদের এই সকল মূলনীতিহীন ও অবাস্তব যুক্তির খণ্ডন করেও কোনো লাভ নেই।

কতিপয় আহলে ইলমের মত

কিন্তু দুঃখজনক হলো, আস্থাভাজন কিছু আলেমও এই আয়াত থেকে এই মত গ্রহণ করেছেন যে, 'কাফেরদের সাথে ভালোবাসায় নিষেধাজ্ঞা'র হুকুম ব্যাপক নয়। বরং তা শুধু হারবি কাফেরের সাথে খাস। মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি হাফিজাহুল্লাহ এই সংক্রান্ত তার একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় লেখেন, দ্বিতীয় ভুল, যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, তা হচ্ছে ইসলাম অমুসলিমদেরকে বন্ধু বানাতে নিষেধ করেছে, যার দলিল আল্লাহ তাআলার বাণী...। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ আয়াতে কি ওই মুশরিকরা উদ্দেশ্য যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় মুসলিমদের কষ্ট দিয়েছে, না কেয়ামত পর্যন্ত আসন্ন সকল কাফের এর অন্তর্ভুক্ত? কুরআনের উপস্থাপনাভঙ্গি এবং আয়াতের পূর্বাপর থেকে উপলব্ধি হয় যে, এখানে রাসুলের যুগের সেসব অমুসলিম উদ্দেশ্য, যারা মুসলিমদের

---

২০১. সুরা মুমতাহিনা : ৮-৯

প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে।[২০২]

এরপর তিনি সুরা মুমতাহিনার উক্ত আয়াতকেও দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন, অতঃপর أولياء এবং من دون المؤمنين শব্দদ্বয়-সংক্রান্ত নিজের কিছু তাহকিক (গবেষণা) উল্লেখ করে শেষে এই সমাধান পেশ করেন, বন্ধু বানানোর নিষেধাজ্ঞার সম্পর্কটা শুধু সেসব কাফেরের ক্ষেত্রে হবে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ অবস্থান রাখে। আর আয়াতে যে বন্ধুত্বের কথা বলা হয়েছে, সে বন্ধুত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে বন্ধুত্বের কারণে মুসলিমদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অমুসলিমরা জেনে যায়, অথবা তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতিগুলো গ্রহণ করার উপক্রম হয়। (এ ছাড়া) সাধারণ বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও সম্পর্ক, যেগুলো স্বাভাবিকভাবে সমাজে একের প্রতি অপরের হয়ে থাকে, এগুলোতে কোনো সমস্যা নেই।[২০৩]

পর্যালোচনা

যাইহোক, বাস্তবতা হলো এই আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কারণ—

প্রথমত : হজরতের উল্লেখিত এই আয়াতের সাথে পূর্বে বর্ণিত আয়াতগুলোর কোনো বৈপরীত্য নেই, যেখানে মৈত্রী স্থাপন, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। তা ছাড়া পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো দ্বীনি মাসলাহাত উদ্ধার করতে বা ক্ষতি দূর করার জন্য সৌজন্য দেখিয়ে সুসম্পর্ক (মুদারাত) রাখার সুযোগ আছে, এই সুযোগ স্বয়ং এ নসগুলো দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর যে আয়াতে ভালো ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা সুসম্পর্কেরই (মুদারাতেরই) অংশ। কাজেই এ দুপ্রকার আয়াতগুলোতে কোনো বৈপরীত্য নেই। 'ভালো আচরণের অনুমতি' আর 'বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞা'—প্রত্যেকের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রত্যেক আয়াত আপন স্থানে সঠিক ও আমলযোগ্য। বিশেষ করে, সুরা মুমতাহিনার শুরু-শেষে এবং মাঝের আয়াতগুলোতে স্পষ্ট করেই কাফেরদের প্রতি বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, যেন সুরাটির মূল অংশই হলো, মুসলমানরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালো সম্পর্ক রাখা থেকে বিরত থাকবে, তাদের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধন একেবারেই রাখবে না, কেননা ঈমান ও কুফরের কারণে উভয় দিকেই প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব রয়েছে।

যে-সকল মুফাসসিরের এই রুচি ছিল যে, তারা কোনো আয়াতের তাফসির করার পূর্বে শিরোনাম উল্লেখ করতেন, তারাও সুরা মুমতাহিনার ব্যাখ্যার শুরুতে ব্যাপক অর্থবোধক শিরোনামই ব্যবহার করেছেন—কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। উদাহরণস্বরূপ নিকট অতীতের প্রখ্যাত বুজুর্গ ও তাফসিরবিদ হজরত মাওলানা আহমাদ আলি লাহোরি রহিমাহুল্লাহ সুরা মুমতাহিনার পাদটীকায় শিরোনাম দেন

২০২. মুসলমানো আওর গায়রে মুসলিমো কে দরমিয়ান রওয়াবেত, পৃ. ৩৭

২০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

‘কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ’।

আল্লামা বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন,

> قال الشافعي رحمه الله : وكانت الصلة بالمال، والبر، والإقساط، ولين الكلام، والمراسلة، بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته، مع المظاهرة على المسلمين. وذلك : أنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين، والإقساط إليهم، ولم يحرم ذلك إلى من أظهر عليهم، بل ذكر الذين ظاهروا عليهم، فنهاهم عن ولايتهم، وكانت الولاية : غير البر والإقساط. (أحكام القرآن للشافعي -جمع البيهقي- ط. دار الذخائر الطبعة : الأولى، ١٤٣٩ هـ-٢٠١٨ م)

> সম্পদের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা, সদাচরণ করা, ন্যায় আচরণ করা, কোমল কথা বলা এবং পত্র আদান-প্রদান করা, এগুলো বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞার আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা শত্রুতা প্রকাশ করে না এবং সদাচরণ করে, তাদের প্রতি এই আয়াতে ভালো আচরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর যারা শত্রুতা প্রকাশ করে, তাদের প্রতি ভালো আচরণকে আয়াতে হারাম করা হয়নি। বরং এমন ব্যক্তিদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কাফেরদেরকে মুসলিমদের বের করার জন্য সহায়তা করেছে, এজন্য তাদেরকে বন্ধু বানাতে নিষেধ করা হয়েছে আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং সদাচার ও ইনসাফ এক জিনিস নয়।[২০৪]

মালেকি মাজহাবের ফকিহদের অন্যতম ইমাম কারাফি রহিমাহুল্লাহ তার ‘আল ফুরুক’ নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় কায়েম করেছেন যে, সুরা মুমতাহিনার এই আয়াতে জিম্মিদের সাথে সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যদিও অন্যান্য অনেক নসে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তো এই দুটি কথার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা কী যার দরুন একটি অনুমোদিত এবং অন্যটি নিষিদ্ধ? অতঃপর তিনি এ দুটির পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। আল্লামা বাকুরি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭০৭ হি.) এই কথাকে আরেকটু গুছিয়ে ও সংক্ষিপ্ত করে উল্লেখ করেন,

> القاعدة الثالثة : ما الفرق بين البِر والتودد. حتى أُمِرْنا بِبِرّهم، ونُهِينا عن التودد لهم؟ فنقول إنا لمّا عاهدناهم حسُن بنا أن لا نضيعهم، وأن نلطُف بهم، وأن نوقع معهم الأخلاق الجميلة لا خوفا منهم ولا تعظيما لهم، ثم نستحضر مع ذلك في قلوبنا عداوتهم لنا ولنبينا حتى لا نودهم ضرورةً، ... ورُوي عن عمر

২০৪. আহকামুল কুরআন লিশ-শাফেয়ি, ২/১৯৩

رضي الله عنه أنه كان يقول في أهل الذمة : أعينوهم ولا تظلموهم، فظهر أن الاحسان إليهم لا يخالف بغضهم، وأن ودَّهمْ غيْرُ بِرِّهِم. (ترتيب الفروق و اختصارها ١/٠٣٤، كتاب الجهاد ط.وزارة الأوقاف-المملكة المغربية-)

তৃতীয় মূলনীতি : সদাচরণ করা ও বন্ধু বানানোর মাঝে পার্থক্যটা কী যার দরুন আমরা তাদের সাথে সদাচরণ করার ব্যাপারে আদিষ্ট হই এবং বন্ধুত্ব গড়তে আমাদের নিষেধ করা হয়? এ ক্ষেত্রে আমি বলব, আমরা যখন তাদের সাথে চুক্তি করব, তখন আমাদের জন্য উচিত হলো, তাদের সাথে চুক্তিভঙ্গ না করা, তাদের প্রতি কোমল হওয়া এবং তাদের সাথে সুন্দর নৈতিকতার স্বাক্ষর রাখা—এটি তাদের ভয়ে বা তাদের প্রতি সম্মানের কারণে নয়। সাথে অন্তরে এই কথা সর্বদা উপস্থিত রাখতে হবে যে, তারা আমাদের নবীর প্রতি ও আমাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, যাতে তাদের সাথে কোনো অবস্থায় ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি না হয়।... উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি জিম্মিদের ব্যাপারে বলতেন, 'তোমরা তাদের সহায়তা করো, তাদের ওপর অত্যাচার করো না।' অতএব বোধগম্য হলো যে, সদয় হওয়া ঘৃণা রাখার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং ভালোবাসা ও উত্তম আচরণ এক নয়।[২০৫]

দ্বিতীয়ত : অনেক মুফাসসিরের মতে সুরা মুমতাহিনার এই আয়াতটি মানসুখ (রহিত) বা মাখসুস (নির্দিষ্ট), আর এর কারণ হচ্ছে অন্য আয়াতের সাথে বাহ্যত স্ববিরোধিতা, যদিও অধিকাংশ মুফাসসির এই আয়াতটিকে রহিত মনে করেন না, বরং মুহকাম (দ্ব্যর্থহীন) বলেই স্বীকৃতি দেন। কিন্তু এই স্ববিরোধিতার কারণে কতক মুফাসসিরের পক্ষ থেকে মানসুখ হওয়ার দাবি করা এ কথার প্রমাণ যে, এই আয়াত থেকে হজরত যে অর্থ নিয়েছেন তা নেওয়া ঠিক নয়।

আল্লামা কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬৭১ হি.) লেখেন,

قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْمُوَادَعَةِ وَتَرْكِ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَ. قَالَ قَتَادَةُ : نَسَخَتْهَا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة : ٥]. وَقِيلَ : كَانَ هَذَا الْحُكْمُ لِعِلَّةٍ وَهُوَ الصُّلْحُ، فَلَمَّا زَالَ الصُّلْحُ بِفَتْحِ مَكَّةَ نُسِخَ الْحُكْمُ وَبَقِيَ الرَّسْمُ يُتْلَى. وَقِيلَ : هِيَ مَخْصُوصَةٌ فِي حُلَفَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَهْدٌ لَمْ يَنْقُضْهُ، قَالَهُ الْحَسَنُ. الْكَلْبِيُّ : هُمْ خُزَاعَةُ وَبَنُو الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ. وَقَالَهُ أَبُو صَالِحٍ، وَقَالَ : هُمْ خُزَاعَةُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هِيَ مَخْصُوصَةٌ فِي الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا. وَقِيلَ : يَعْنِي بِهِ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ لِأَنَّهُمْ مِمَّنْ لَا يُقَاتِلُ، فَأَذِنَ اللهُ فِي بِرِّهِمْ. حَكَاهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ. وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ : هِيَ مُحْكَمَةٌ.

---

২০৫. তারতিবুল ফুরুক ওয়াখতিসারুহা, ১/৪৩০

ইবনে যায়েদ বলেন, এই বিধান ইসলামের শুরুযুগে যখন মুসলমানরা দুর্বল ছিল ও জিহাদের আয়াত নাজিল হয়নি, তখনকার। এরপর এটি রহিত হয়ে যায়। কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হুকুমটি فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে) আয়াতের মাধ্যমে মানসুখ হয়ে যায়। আর কেউ কেউ বলেন, এই বিধানটি একটি কারণে হয়েছিল, তা হলো সন্ধিচুক্তি। অতঃপর যখন মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সন্ধিচুক্তি শেষ হয়ে যায়, তখন এই বিধানটি রহিত হয়ে যায় এবং তার তেলাওয়াত বাকি থাকে। আবার কেউ বলেন, এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে-সকল কাফের চুক্তি করেছে এবং তা ভঙ্গ করেনি, তাদের সাথেই নির্দিষ্ট।... মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা তাদের জন্য ছিল যারা ঈমান এনেছে, তবে হিজরত করেনি। তবে অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন যে, এটি মুহকাম (যার হুকুম এখনো বলবৎ আছে) আয়াত, মানসুখ নয়।[২০৬]

তৃতীয়ত : সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহিন বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞার নসগুলো থেকে অনেক মাসআলা ও ঘটনায় দলিল গ্রহণ করেছেন, অথচ শরিয়তের কোনো বিধানের ব্যাপারে মানসুখ আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করা জায়েয নয়। অতএব সুরা মুমতাহিনার একটি আয়াতকে ভিত্তি করে সে সকল নসকে মানসুখ বলে দেওয়া ঠিক হবে না, যেগুলোতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার নিষিদ্ধতা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ : এটাও বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, অসংখ্য নসের মধ্যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্য রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে, বস্তুত সেগুলোর মৌলিক কারণ ও হেতু কী? কী এমন নেপথ্য কারণ ছিল যার দরুন এত গুরুত্বসহ কাফেরের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে এক দুটি নয়, অসংখ্য নসে হুকুম দেওয়া হয়েছে? তা ছাড়া সে কারণগুলো কেবল হারবি কাফেরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, নাকি জিম্মি কাফেরের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম?

এই বিষয়ের সমস্ত দলিল, তার পটভূমি এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ সেগুলো থেকে যা বুঝে আমল করেছেন, এসব আলোচনা সামনে রাখলে স্পষ্ট হয় যে, এই বিধানের মৌলিক কারণ হলো কাফেরের 'কুফর'। কাফের ব্যক্তি মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা বা যুদ্ধে সহযোগী হওয়া হুকুমের ক্ষেত্রকে আরও কঠোর বানায়, তবে হুকুমের মূল কারণ (ইল্লত) 'হারব' (যুদ্ধ) নয়, বরং 'কুফর'।

'কাফের', 'কুফফার', 'শত্রু' এবং 'তাদের ওপর আল্লাহর গজব' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা হুকুম প্রদান করা এই কথার নিদর্শন যে, তাদের কুফরই এই হুকুমের ভিত্তি। এর একটি অন্যতম দলিল এটাও যে, অধিকাংশ ইহুদি তখন হারবি ছিল না। বরং তাদের অনেকেই মদিনা ও তার আশপাশে চুক্তি করে বসবাস করত, কিন্তু তা সত্ত্বেও

২০৬. তাফসিরে কুরতুবি, ১৮/৫৯

তারা এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হজরত উমর রা. তার খেলাফতকালে বহু ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞার নসকে জিম্মিদের ওপর প্রয়োগ করেছিলেন।

চিন্তা করলে দেখা যাবে, আল্লাহ তাআলা, ইসলামধর্ম ও আহলে ইসলামের প্রতি ভালোবাসার একমাত্র দাবি হলো কুফরি বিষয়াদি এবং আহলে কুফরের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা রাখা। কুফর ও ইসলাম, কাফের ও মুসলিম পরস্পর বিরোধী। অনুরূপ শয়তান আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য শত্রু। এখন কোনো একদিকে অন্তরের ঝোঁক অপরদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সমর্থক। কুফরের প্রতি ভালোবাসার অর্থ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ, কুফরের প্রতি বন্ধুত্ব রাখা মানে হলো ইসলামের প্রতি শত্রুতা। অনুরূপ কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের খারাবির সাথে এটিও অনেক সময় যুক্ত হয়ে যায়, তা একজন মুসলমানকে অপর মুসলমানের প্রতি ঘৃণা ও দূরত্বের কারণ হয়।

উপসংহার

বাস্তব কথা হলো, উল্লেখিত দুই প্রকার আয়াতের মধ্যে পারস্পরিক কোনো বৈপরীত্য নেই, যার কারণে একটি আয়াতকে মানসুখ বলার প্রয়োজন হবে। কারণ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে সখ্য ও বন্ধুত্ব রাখার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, আর এখানে সুরা মুমতাহিনার আয়াতে সততা ও ন্যায়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সখ্য ও ভালোবাসা এক জিনিস, আর সততা ও ন্যায়বিচার অন্য জিনিস, প্রথমটির সম্পর্ক দিল ও আকলের সাথে, আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক বাহ্যিক আচরণ ও কর্মের সাথে। যখন দুটি বিষয়ের অর্থ ও প্রয়োগক্ষেত্র আলাদা, তখন দ্বন্দ্ব, এরপর একটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত বা মানসুখ—এই বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

হাফেজ ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৮৫২ হি.)-ও উভয়প্রকার নসগুলোকে এমনভাবে একত্র করেছেন যে, এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। এক স্থানে সখ্য ও ভালোবাসা রাখাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অন্য স্থানে উত্তম আচরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ভালো ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করার জন্য সখ্য ও ভালোবাসা থাকা আবশ্যক নয়, তাই দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

তিনি লেখেন,

> ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل والله أعلم. (فتح الباري ٣٣٢/٥، قوله باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ط. دار المعرفة)

ভালো ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা এবং সদয় হওয়ার কারণে

সে সখ্য ও ভালোবাসা তৈরি হয় না, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ.

আপনি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে এমন পাবেন না যে, তারা ওইসব লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত।[২০৭]

আয়াতটি সকল কাফেরের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে এসেছে, যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত বা লিপ্ত নয়।[২০৮]

এই আলোচনায় স্পষ্টভাবে এই দাবি করা হয়েছে যে, 'বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ' বিষয়ে যে-সমস্ত নস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হারবি ও অহারবি সকল কাফেরের ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ, কারণ হুকুমের ভিত্তি কাফেরের 'কুফর'। হারবি বা সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নয়।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬০৬ হি.) লেখেন,

والمعنى : لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء، وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء، وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة، وقال أهل التأويل : هذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة. (مفاتيح الغيب ٩٢/١٢٥، ط. دار إحياء التراث)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কাফেরদের সাথে সদাচরণ করতে নিষেধ করেন না। তিনি নিষেধ করেন তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে। আর শত্রুতাতে তারা চরমপন্থী হলেও এটা মূলত তাদের জন্য রহমতস্বরূপ। মুফাসসিরগণ বলেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধ হলেও আয়াতটি তাদের সাথে সদাচরণের অনুমতি দেয়।[২০৯]

কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১২২৫ হি.)-ও একই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, দুই ধরনের আয়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

তাফসিরে মাজহারিতে উল্লেখ রয়েছে,

ومن هاهنا يظهر : أن المنهي عنه إنما هو موالاة أهل الحرب دون مبرتهم، بشرط أن لا يضرب المومنين وقد قال الله تعالى فى الأسارى من أهل الحرب : إما منا بعد وإما فداء، والمن نوع من البر... فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ولا مفهوم لهذه

২০৭. সুরা মুজাদালা : ২২

২০৮. ফাতহুল বারি, ৫/২৩৩

২০৯. তাফসিরে কাবির, ২৯/৫২১

الآية فإنه لا يجوز موالاة أهل الذمة أيضا لعموم قوله تعالى : لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء، وقوله تعالى : لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء.

এ থেকে জানা যায় যে, নিষেধ হলো হারবিদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, তাদের সাথে সদাচরণ করা ও সদয় হওয়া নিষিদ্ধ নয়। তবে শর্ত হলো এর কারণে মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা হারবি বন্দিদের ব্যাপারে বলেন, 'তুমি চাইলে তাকে মুক্তিপণ না নিয়ে ছেড়ে দিতে পারো, কিংবা মুক্তিপণ নিয়েই ছেড়ে দাও।' আর মুক্তিপণ না নিয়ে ছেড়ে দেওয়া একধরনের সৎ ও সদয় ব্যবহার।... মুসলিমরা জিম্মিদের সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে পারবে না, কারণ আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী ব্যাপক।

لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ.

তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

এবং,

لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ.

তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।[২১০]

মুওয়ালাত শব্দটি সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি

تولي ও موالات-এর মূলধাতু হলো ولي এবং এই মূলধাতুটি আরবি ভাষায় একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা রাগিব আসফাহানি রহিমাহুল্লাহ এবং অন্য ভাষাবিদরা এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। আপত্তি ওঠে, যে নসগুলোতে ইহুদি ও খ্রিষ্টান কিংবা অন্য কাফেরদের সাথে تولي বা موالات নিষিদ্ধ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেগুলোতে কোন অর্থটি বোঝানো হয়েছে। তাদের বন্ধু ও প্রিয়তম বানানোও কি হারাম, না তাদের আস্থাভাজন বানানো এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা উদ্দেশ্য?

উম্মাহর জমহুর আলেমগণ এই নসগুলোর মধ্যে موالات শব্দের প্রথম অর্থটিকেই গ্রহণ করেছেন, বিপরীতে কিছু সামসময়িক আলেম এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এই জাতীয় নসগুলো কাফেরদেরকে আস্থাভাজন বানানো বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার নিষিদ্ধতা ঘোষণা দেওয়ার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। তাদেরকে বন্ধু বানানো বা তাদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখার নিষিদ্ধতা আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। যেমনটি খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানি হাফিজাহুল্লাহ লিখেছেন, তাহলে এটিও লক্ষণীয় বিষয় যে, 'অলি' বানানো দ্বারা উদ্দেশ্য কী। একজন সাধারণ বন্ধুকে 'অলি' বলা হয় না। 'অলি' বলা হয় নিকটতম ব্যক্তিকে

---

২১০. তাফসিরে মাজহারি, ৯/২৬২

যার সাথে এমন ঘনিষ্ঠতা রয়েছে যে, তার কাছে কোনো বিষয় গোপন রাখা হয় না। এজন্যই পিতা, দাদা ও প্রিয়জনদের 'অলি' বলা হয়, কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের গোপনীয়তা যেন অমুসলিমদের কাছে না যায়, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর এটা সুস্পষ্ট বিষয় যে, প্রত্যেক দেশেরই নিজেদের গোপনীয়তা এমনভাবে রক্ষা করা উচিত, যাতে শত্রুরা এ থেকে কোনো ফায়দা লুটাতে না পারে, এখানে স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বোঝানো উদ্দেশ্য নয়।[২১১]

মিশরের প্রসিদ্ধ আলেম শায়েখ আবু যুহরা রহ.-ও তার তাফসির ও অন্যান্য কিছু গ্রন্থে موالات-এর প্রায় একই ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ আলেমের মতই গ্রহণযোগ্য এবং موالات ও تولي-কে এই অর্থের ওপর সীমাবদ্ধ মনে করা ভুল, যার কিছু কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে—

১. সালাফদের বুঝ অধিক গ্রহণযোগ্য এবং আস্থাযোগ্য। এই গ্রন্থের শুরুতে বহুসংখ্যক মুফাসসির ও ফকিহের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এই আয়াত থেকে 'কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা নিষেধ' এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। বরং অনেকেই একে কবিরা গোনাহের তালিকায় যুক্ত করেছেন। হজরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, যে موالات كفار (কাফেরদের বন্ধু বানানো) কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে হারাম, তার উদ্দেশ্য হলো বন্ধুত্ব।[২১২]

মাওলানা মুফতি কিফায়াতুল্লাহ রহ.-কে—

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَ

আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে লেখেন—

উত্তর : এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, এর অর্থ হলো কাফেরদের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা প্রকাশ করা নাজায়েয এবং হারাম।[২১৩]

২. বহু নসে বিভিন্ন আঙ্গিকে ঈমান এবং কাফেরদের বন্ধু বানানোর মাঝে সংগতি দেখানো হয়েছে, এই সংগতির মূল দাবি হলো, বন্ধু বানানোর নিষেধাজ্ঞা স্বয়ং ঈমানের দাবি আর এই দাবি ততদিন থাকবে, যতদিন কাফের ঈমান গ্রহণ না করবে।

এর দ্বারা এই বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত হয় যে, কাফেরদের সাথে موالات ও تولي নিষিদ্ধ হওয়ার মৌলিক কারণ কী? মুসলমানদের গোপন রহস্য তাদের কাছে পৌঁছানো,

---

২১১. মুসলমানো আওর গায়রে মুসলিমো কে দরমিয়ান রওয়াবেত, পৃ. ৩৮

২১২. ফাতাওয়া মাযাহিরুল উলুম, পৃ. ২৪৯

২১৩. কিফায়াতুল মুফতি, ১১/১২৩, ইদারাতুল ফারুক, করাচি

নাকি মুসলমানের ঈমান ও ইসলামই কুফরের প্রতি ঘৃণা রাখার দাবি করে? এ ছাড়াও এ দিকটিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা কি শুধুই একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক মাসআলা, না শরিয়তের অন্য বিধানাবলির মতো এটিও একটি শরয়ি বিধান?

৩. সুরা মুজাদালাসহ আরো অন্য নসগুলোতে সরাসরি মাওয়াদ্দাত (ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা) শব্দ উল্লেখ করেই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ مودت (মাওয়াদ্দাত) শব্দটি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

> لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٢٢

> আপনি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে এমন পাবেন না যে, তারা ওইসব লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত, হোক না ওরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা জাতি-গোষ্ঠী। এমন লোকদেরই অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং নিজের রুহ (তথা অদৃশ্য ফয়েজ) দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন। তিনি তাদের এমন উদ্যানরাজিতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। শুনে রাখো! আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।[২১৪]

৪. অনুরূপভাবে কিছু কিছু নসের মধ্যে موالات শব্দ নেই, বরং কাফেরদের দিকে ঝুঁকে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। যা সাধারণত বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

> وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

> এবং তোমরা জালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, তা হলে তোমাদের স্পর্শ করবে আগুন। এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না। অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।[২১৫]

৫. কয়েকটি নসের মধ্যে মুওয়ালাত শব্দটি এমন কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে 'মুওয়ালাত'-এর অর্থ গোপন তথ্য সরবরাহ করা বা হারবি কাফেরের সাথে খাস, এই অর্থ গ্রহণ করা কঠিন এবং এটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতা

---

২১৪. সুরা মুজাদালা : ২২

২১৫. সুরা হুদ : ১১৩

বিবর্জিত। যেমন শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُتِبَ عَلَيۡهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ

যার ব্যাপারে এ কথা লিখে দেওয়া হয়েছে—যে ওকে বন্ধু বানাবে, তাকে সে গোমরাহ করবে এবং তাকে দোজখের আজাবের দিকে নিয়ে যাবে।[২১৬]

শেষ কিছু নিবেদন

১। অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের ধরন কেমন হবে? এই বিষয়ে শরিয়তের দিকনির্দেশনা কী? এটি বর্তমান সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার মতো জরুরি একটি মাসআলা।

২. কুফরের অনেক প্রকার রয়েছে। কেউ জন্মগত কাফের আর কেউ ইসলামের নেয়ামত পাওয়ার পর কুফর গ্রহণ করে নেয়। কুফরের আরেকটি প্রকার হলো, যে নিজেকে কাফের বলে, অথবা কাফের না বললেও নিজের অবস্থানকে ইসলাম বা মুসলিম বলে দাবি করে না। এর বিপরীত হলো নিজের কুফরকে ইসলাম বলে চালিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জোরাজুরি করা। এই দৃষ্টিতে কুফরের অসংখ্য প্রকার হয় এবং প্রতি প্রকারের কাফেরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রও একরকম নয়, বরং প্রতিটির বিশ্লেষণ রয়েছে যা এই কিতাবে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩। শরিয়ত ও সুস্থ বিবেকের দৃষ্টিতে কুফর নিজেই একটি অপরাধ আর কাফের একজন অপরাধী। বস্তুবাদের এই যুগে মানুষ এটাকে যে নামে ও শিরোনামেই ব্যক্ত করুক অথবা যে রং ও ঢঙেই উপস্থাপন করুক, শরিয়তের দৃষ্টিতে কুফর সাধারণ কোনো অপরাধ নয়, বরং সবচেয়ে জঘণ্য অপরাধ এবং অসংখ্য অপরাধের গোড়া। দুনিয়ার সকল আইনেই অপরাধী ও নিরপরাধ নির্ণয়ের নিজস্ব মাপকাঠি ও প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে। সে বিবেচনায় অপরাধী ও নিরপরাধীর সাথে আচরণে পার্থক্য করা হয়। সকলের সাথে সমান আচরণ করা হয় না। ইসলামেও কাফের ও মুসলমানের সাথে একরকম আচরণ রাখা হয়নি। বড় আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমানে মানুষ চুরি, ডাকাতি, জিনা ও গুম-খুনকে অপরাধ মনে করে কিন্তু এটাকে অপরাধই মনে করে না। অথচ কুফর হলো এই সকল অপরাধ থেকেও আরও বড় অন্যায় ও সকল অপরাধের মূল!

৪। মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক নিয়ে যারা লিখেছে, তাদের পদস্খলনের দুটি বড় কারণ রয়েছে—

ক. শরিয়তের নুসুস ও ফুকাহায়ে কেরামের গবেষণার ব্যাপারে উদাসীনতা। অনেক আলেম তো এই বিষয়ে লেখার সময় শরিয়তের টেক্সটের দিকেও তেমন ভ্রুক্ষেপ করেন না। অথবা এক-দুটি বিক্ষিপ্ত ও আংশিক নস সামনে রেখে লিখে ফেলেন।

২১৬. সুরা হজ : ৪

জানি না কোন উদ্দেশ্যে তারা এই কাজটি করেন। যাইহোক, এটা অনেক বড় ভুল এবং বহু পথভ্রষ্টতার রাস্তা। সঠিক পদ্ধতি তো হলো, শরিয়তের সকল নসকে সামনে রেখে দ্বীনের মূলনীতির অধীনে থেকে মাসআলা সমাধানের চিন্তাভাবনা করা।

কিছু মানুষ তো এমন আছে শরিয়তের নস তো সামনে রাখে, কিন্তু ফুকাহায়ে কেরামের গবেষণার সাথে উদাসীনতার পরিচয় দেয় ও সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। এটাও একটি ভুল পদ্ধতি এবং বহু পদস্খলের কারণ। যার মাঝে ইজতেহাদ করার কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততা না থাকে—বর্তমানে সে অবস্থাই বিরাজমান—তাদের জন্য ফুকাহায়ে কেরামের গবেষণা ও সিদ্ধান্তের বাহিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কেননা এ ছাড়া মাসআলার সঠিক সমাধান ও প্রকৃত শরয়ি বিধান পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

খ. এই মাসআলায় অসংখ্য ভুল ও পদস্খলনের দ্বিতীয় কারণ হলো কুফরকে অপরাধ মনে না করা। অথচ কুফরই হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ।

পরিশিষ্ট : এক

অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ ও তাতে শুভেচ্ছা বিনিময়

শরিয়তের দৃষ্টিতে ঈদ শুধুই সামাজিক প্রথা নয়, বরং তা প্রত্যেক ধর্মের শিয়ার বা প্রতীকী। এ ছাড়া সেই দিনগুলো উৎযাপনে থাকে বিভিন্ন ধর্মীয় বিধিনিষেধ। মুসলিমদের দুটি ঈদের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই দুই ঈদে মুসলমানদের জন্য ধর্মের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। একটি মৌলিক বিধান তো হলো উভয় ঈদেই একজন মুমিনের জন্য রোজা রাখা নাজায়েজ। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দিনে উত্তম খাবার খাওয়া ও খাওয়ানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। ঈদুল ফিতর যেটাকে আমরা রোজার ঈদ বলি, এ দিনকে কেন্দ্র করেও রয়েছে অসংখ্য বিধান, ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে সদকাতুল ফিতর, একটি বিশেষ পদ্ধতিতে ঈদের নামাজ পড়া, খুতবা শোনা, উত্তম পোশাক পড়া ইত্যাদি। অপরদিকে ঈদুল ফিতর যাকে কুরবানির ঈদ বলা হয়, সেদিনের তো রয়েছে তাওহিদের অন্যতম শিক্ষা আল্লাহর মহিমায় পশু জবাইয়ের বিধান। এখন মুসলিমদের দীর্ঘ এই চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসের কালপরিক্রমায় যদি মুসলিমরা এই দিনদুটিকে শুধুই সামাজিক প্রথা হিসাবে পালন করে, তাহলে এটাকে শুধুই সামাজিক প্রথা বলার কোনো সুযোগ কি রয়েছে? কস্মিনকালেও নয়।

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) বড় চমৎকার কথা বলেছেন,

«أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك، التي قال الله سبحانه {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ} [الحج : ٧٦] كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد، موافقة في الكفر. والموافقة في بعض فروعه : موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر، وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه». (اقتضاء الصراط المستقيم في أصحاب الجحيم ٨٢٥/١، فصل في الأعياد، النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالاعتبار)

ঈদ (বা ধর্মীয় উৎসব পালন করা) ধর্মীয় বিধিবিধান ও ধর্ম পালনের মৌলিক পদ্ধতি ও রীতিনীতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি ইবাদতের একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করে

দিয়েছি যার অনুসরণ তারা করে।[২১৭] এটারই বিভিন্ন রূপ হলো, কিবলা, নামাজ, রোজা ইত্যাদি। সুতরাং, কাফেরদের ঈদ-উৎসবসমূহে অংশগ্রহণ করা এবং তাদের অন্যান্য ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিধানাবলিতে অংশগ্রহণের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এজন্য, অমুসলিমদের ঈদের (উৎসবের) সকল বিষয়ে একাত্মতা প্রকাশ করার অর্থ হলো তাদের পুরো কুফরির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা, আর তাদের ঈদের (উৎসবের) কিছু বিষয়ে একাত্মতা প্রকাশ করা মানে কুফরের কিছু শাখার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা। বরং বাস্তবতা হলো, ঈদ বা উৎসব হলো বিভিন্ন ধর্ম ও শরিয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে এক ধর্ম আরেক ধর্ম থেকে পৃথক হয় এবং তা বিভিন্ন ধর্মের অন্যতম বড় বাহ্যিক ও সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা শেষ পর্যন্ত (শর্তসাপেক্ষে) ব্যক্তিকে কুফরের দিকেই নিয়ে যায়।[২১৮]

অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে এ দেশে প্রসিদ্ধ দুর্গা পূজার উদাহরণ আমরা দেখতে পারি। নওমুসলিম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য লেখেন, স্কন্দ পুরাণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধের নিমিত্ত শরৎকালে দুর্গা দেবীর অর্চনা করেছিলেন। এ থেকে শরৎকালে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দেবী ভাগবতের বর্ণনায় প্রকাশ, রম্ভ নামক অসুরের পুত্র মহিষাসুর পর্বতে অযুত বর্ষকাল কঠোর তপস্যায় রত হয় এবং 'পুরুষজাতীয় কোনো জীব মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে না'—ব্রহ্মার নিকট থেকে এ বর লাভ করে। এ বর লাভের পরে সে ভীষণভাবে দুর্মদ হয়ে ওঠে এবং দেবতাদের স্বর্গরাজ্য দখল করে নেয়। অনন্যোপায় হয়ে দেবতারা সাহায্যের জন্য বিষ্ণু ও শিবের নিকটে সমবেত হয়। তখন দেবতাদের তেজ থেকে দেবী ভগবতী (দুর্গা) উৎপন্ন হয়ে মহিষাসুরকে বধ করে।...[২১৯]

দুর্গা পূজার সূচনাই শুধু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে নয়, বরং এই পূজার যাবতীয় কার্যক্রম ও তা পালনের রীতিও রয়েছে। দুর্গা পূজা কয়েকদিনে হয়, একেকদিনে রয়েছে ধর্ম পালনের একেকটি রীতি এবং সে রীতিগুলোকেই কেন্দ্র করে হয় একেকটি অনুষ্ঠান। একদিন পালন হয় কুমারী পূজা, সর্বশেষ প্রতিমা বিসর্জন। দুর্গা পূজা মোট পাঁচদিন হয়। একেকদিন তাদের একেকটি ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করেই পালন হয়। যেমন, দুর্গা পূজা শুরু হয় ষষ্ঠীর দিন থেকে। মনে করা হয় যে, শরৎকালে দুর্গা পূজার সূচনা করেছিলেন রাম। রাবণকে পরাজিত করার জন্য দশভূজার আশীর্বাদের কামনায় তিনিই এ সময় দুর্গা পূজা করেন। বোধনের মাধ্যমেই দুর্গাকে আবাহন করা হয়। ষষ্ঠীর দিনে এ ছাড়াও আরও অন্যান্য অনেক নিয়ম-আচার পালিত হয় ও সকলকে রীতিনীতি মেনে দুর্গার আরাধনার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হন। অষ্টমীর সমাপ্তি

---

২১৭. সুরা হজ : ৬৭

২১৮. ইকতাদাউস সিরাতিল মুসতাকিম, ১/৫২৮

২১৯. মূর্তিপূজার গোড়ার কথা, আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, পৃ. ৫৪

ও নবমীর সূচনার সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা হয়। এই সময় দুর্গা চণ্ড-মুণ্ড বধের জন্য তার চামুণ্ডা স্বরূপ ধারণ করেন। এ সময় ১০৮টি প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়। এককালে এ দিন পশুবলি দেওয়া হতো, তবে বর্তমানে সবজি বলি দেওয়া হয়। অঞ্জলি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে দুর্গার প্রতি নিজের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন ভক্তরা। সাধারণত সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিনই পুষ্পাঞ্জলি হয়, তবে অষ্টমীর অঞ্জলিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের পর হাতে ধরে থাকা ফুল-পাতা মহিষাসুরমর্দিনীর চরণে অর্পণ করার রেওয়াজ আছে।[২২০]

উৎসবের একেকটি বিষয় আর পালনের একেকটি রীতি ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও পদ্ধতি অনুযায়ী চলছে। সুতরাং কেউ যদি বলে অমুসলিমদের ঈদগুলো তাদের ধর্মীয় প্রতীক নয়, বরং এগুলো একটি সামাজিক কালচার, তাহলে তার কথা বাস্তবতা বিবর্জিত হবে। কেননা, প্রত্যেক ধর্মে ঈদ স্বয়ং সে ধর্মের ধর্মীয় বিধিনিষেধ অনুসারে একটি শিয়ার বা প্রতীক হয়ে থাকে, যা আমরা সংক্ষেপে ওপরে আলোচনা থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তাই তা সামাজিক দৃষ্টিতে পালন করুক বা কালচার হিসাবে, এসব ধোঁকাপূর্ণ কথা ধর্তব্য নয়। ধরুন, কোনো ইউরোপিয়ান গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে এসে বলল সে তা ধর্মীয় কারণে পড়েনি, বরং ফ্যাশন হিসাবে পড়েছে, তাহলে তা কি কোনো মুসলিমের জন্য ব্যবহার করা জায়েয হয়ে যাবে? হবে না, কারণ ক্রুশ সত্তাগতভাবেই কুফরের একটি প্রতীক। চাই তা যে উদ্দেশ্যেই পড়া হোক তা এখানে বিবেচ্য হবে না।

পূজা বা অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও তাতে শুভেচ্ছা জানানো থেকে বিরত থাকার জন্য একজন মুমিনের এতটুকু জানাই যথেষ্ট ছিল, এসব কুফরের শিয়ার বা প্রতীক। কিন্তু বড় দুঃখজনক এক সময় আমরা অতিবাহিত করছি। ঈমান-কুফরের স্পষ্ট সীমারেখা থাকার পরেও আজ পশ্চিমের তৈরি উদারতার সবক আমাদের মাথায় এমনভাবে ঢুকেছে যে, উদারতার নামে আমরা সে সীমানা অতিক্রম করছি। আজ হাজারো মুসলিম সন্তান অমুসলিমদের মূর্তি-প্রতিমা ও সেগুলোর উৎসবে অংশগ্রহণ করছে। কুফরি শব্দ দিয়ে একে অপরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে! এমন দুঃখভরা দৃশ্য যখন একজন নবীর ওয়ারিসের অন্তর বিদীর্ণ করে দেয়, মুসলমানদের এমন ধ্বংসের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা করবে সে চিন্তায় বিভোর হতে হয়, তখন একদল আলেম শ্রেণি কুফরের এই সয়লাব থেকে উম্মাহকে রক্ষার বদলে বলে বেড়াচ্ছে, এ সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও এতে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানোয় ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই। এগুলো মূলত সামাজিকতার একটি অংশ। আর ইসলাম তো সবচেয়ে বেশি সামাজিক ধর্ম![২২১]

---

২২০. হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা (অনলাইন) লিংক : https://shorturl.at/agrzC

২২১. মিশরের শায়েখ ইউসুফ কারজাবি, শামের মুতাজ আল-খতিবসহ এই শ্রেণির আলেমের লিস্ট বড় দীর্ঘ! আল্লাহ আমাদের এ সকল আলেমের অনিষ্টতা থেকে হেফাজত করুক। আমিন।

একদিকে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার ফলে আমাদের মুসলিম মনে উদারতার নামে কুফরের বিষ রোপণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে এ সকল আলেম শ্রেণির এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্যে বহু দ্বীন পালনে সচেষ্ট মানুষও বিভ্রান্ত হচ্ছে। তার থেকেও বড়, ইসলামের একটি স্পষ্ট বিধানে বিকৃতি সাধন হচ্ছে যা বড় ভয়ংকর রূপ ধারণ করে মানুষের ঈমানকে প্রতিনিয়ত নষ্ট করে যাচ্ছে। তাই এ বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে উম্মতের বক্তব্যের আলোকে স্পষ্ট করে বোঝা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ইসলামের স্পষ্ট বিধানটির দলিলগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

কুরআনের নির্দেশনা

কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঈমান ও কুফরের পূর্ণ পার্থক্য করে দিয়েছেন স্পষ্ট ভাষায় এবং মুমিনকে এই আদেশ করেছেন যেন সব কুফর ও তার ইবাদত থেকে নিজেকে মুক্ত থাকার ঘোষণা দেয়। আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিমের ভাষায় মুমিনকে ঈমানের শিক্ষা দিচ্ছেন এভাবে,

> قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ.
>
> নিশ্চয় তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যখন তারা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।[২২২]

আল্লাহ ছাড়া অন্য যারই ইবাদত করা হয় তা বাতিল, এই ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছেন।

> ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ.
>
> ওরা আল্লাহ ছাড়া যেসব বস্তুকে ডাকে, তা সম্পূর্ণ অসার। আর আল্লাহই মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ।[২২৩]

কুফর থেকেই শুধু বেঁচে থাকা নয়, বরং যারা এই কুফরের ধারকবাহক তাদের থেকেও পূর্ণভাবে বেঁচে থাকার আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলে দিয়েছেন, তাদেরকে যেন একজন মুমিন বন্ধু না বানায়।

আল্লাহ তাআলা সুরা মায়েদায় উল্লেখ করেন,

> يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ.

---

২২২. সুরা মুমতাহিনা : ৪

২২৩. সুরা হজ : ৬২

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু বানিয়ো না। ওরা পরস্পর একে অন্যের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে-কেউ ওদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে ওদেরই মধ্যে (গণ্য) হবে। নিশ্চয় আল্লাহ জালেমদের হেদায়েত দান করেন না।[২২৪]

বন্ধু বানানোর একটি দিক হলো তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা ও তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলোতে আনন্দ প্রকাশ করা। হাফেজ যাহাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৪৮ হি.) লেখেন,

قال العلماء : ومن موالاتهم التشبه بهم، وإظهار أعيادهم.

আলেমগণ বলেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার একটি চিত্র হলো, তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা এবং তাদের উৎসব পালন করা।[২২৫]

আর একজন শিরক থেকে মুক্ত মুমিনের গুণাবলিই হলো সে কখনোই শিরক ও মিথ্যার সংমিশ্রণ হয়ে যায় এমন স্থানে যাবে না। শিরক আর মিথ্যার সবচেয়ে বড় প্রকাশস্থল হলো অমুসলিমদের ধর্মীয় একেকটি উৎসব। আল্লাহ তাআলা মুমিনের এই বৈশিষ্ট্যটি এভাবে উল্লেখ করেন,

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ.

এবং যারা 'যুরে' উপস্থিত হয় না।[২২৬]

উক্ত আয়াতের 'যুর' শব্দের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., প্রখ্যাত তাবেয়ি মুফাসসির মুজাহিদ, মুহাম্মাদ বিন সিরিন এবং যাহহাক রহ.-সহ একদল সালাফ থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে 'যুর' শব্দের অর্থ হলো মুশরিকদের উৎসব। মুফাসসির ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৭৪ হি.) লেখেন,

وقال أبو العالية، وطاوس، ومحمد بن سيرين، والضحاك، والربيع بن أنس، وغيرهم : هي أعياد المشركين.

আবুল আলিয়া, তাউস, মুহাম্মাদ বিন সিরিন, যাহহাক, রবি ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহ এবং অন্য উলামায়ে কেরাম বলেন, 'যুর' অর্থ হলো মুশরিকদের উৎসব।[২২৭]

---

২২৪. সুরা মায়েদা : ৫১

২২৫. তাশাব্বুহুল খাসিস বি-আহলিল খামিস ফি রদ্দিত তাশাব্বুহি বিল মুশরিকিন, পৃ. ৩৪

২২৬. সুরা ফুরকান : ৭২

২২৭. তাফসিরে ইবনে কাসির, ৬/১৩০। ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদ রহ.-এর বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত জানতে পড়ুন, ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকিম, ১/৪৭৯-৪৮১; তাশাব্বুহুল খাসিস, পৃ. ২৬; আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ২/৩৪৬

হাফেজ যাহাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৪৮ হি.) বলেন,

وقد مدح الله من لا يشهد أعياد الكفار ولا يحضرها، قال تعالى : وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ... [الفرقان : ٢٧]، فمفهومه أن من يشهدُها ويحضرها يكون مذموماً ممقوتاً، لأنه يشهد المنكر ولا يُمكنه أن يُنكره، وقد قال النبي ﷺ : ومن رأى منكم مُنْكَراً فَلْيُغَيره بيده، فإن لم يَسْتَطِعْ فبلسانه، فإن لم يَسْتَطِعْ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

যারা কাফেরদের উৎসব প্রত্যক্ষ করে না, তাতে উপস্থিত হয় না, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ.

এবং যারা 'যুরে' উপস্থিত হয় না।[২২৮]

এর অর্থ হলো, যে-কেউ এটি প্রত্যক্ষ করবে এবং এতে উপস্থিত থাকবে, সে নিন্দনীয় এবং ঘৃণার পাত্র হবে, কারণ সে মন্দকে প্রত্যক্ষ করছে এবং তাতে আপত্তি করতে বা বাধা দিতে পারছে না। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো অন্যায় কাজ দেখবে, তখন যদি তার সামর্থ্য থাকে তাহলে হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, আর যদি তা না থাকে, তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, আর যদি সে শক্তিটুকুও না থাকে, তাহলে অন্তর দ্বারা তা ঘৃণা করবে, আর এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।[২২৯]

হাদিসের শিক্ষা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবন যদি আমরা দেখি, তাহলে তিনি মুসলমানদেরকে কুফরের বিষ থেকে দূরে রাখতে সাধারণ থেকে সাধারণ বিষয়ে পর্যন্ত কাফেরদের বিপরীত কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। কুফরের সামান্য রেশও যেন মুমিনদের জীবনে না পড়ে তাই রাসুলের স্পষ্ট ঘোষণা ছিল,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

যেকোনো দলের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ওই দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৩০]

শুধু তাই নয়, অন্য হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও স্পষ্ট করে বলেছেন,

---

২২৮. সুরা ফুরকান : ৭২

২২৯. তাশাব্বুহুল খাসিস, পৃ. ৩৪-৩৫

২৩০. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৪০৩১

: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ : وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.

> তোমরা মুশরিকদের সাথে বৈসাদৃশ্য অবলম্বন করো। দাড়ি না কেটে রেখে দাও এবং গোঁফ খাটো করো।[২৩১]

মুশরিকদের উৎসবে অংশগ্রহণ তো পরের কথা, বাহ্যিক বেশভূষায়ও যেন কোনো মিল না থাকে, এই বিষয়েও নবীজি নির্দেশ দিয়েছেন।

শুধু মুশরিকই নয়, আহলে কিতাব ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথেও বৈসাদৃশ্য অবলম্বন করার জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، وَلَا بِالنَّصَارَى.

> যে অন্যদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদি এবং নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।[২৩২]

অমুসলিমদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার মূল কারণই হলো তাদের কুফর থেকে বেঁচে থাকা। এখন তাদের কুফরের সবচেয়ে বড় প্রকাশস্থল—দেব-দেবীর অর্চনা, শিরকি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত উৎসব, যেখানে সরাসরি কুফরি বিশ্বাস ও আকিদার সর্বোচ্চ প্রকাশ হয়, সেখানকার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিকা কেমন হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য বিষয় থেকেও অমুসলিমদের ঈদ ও উৎসবের দিনগুলোতে মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাখার বিষয়ে ছিলেন আরও বেশি সতর্ক ও কঠোর। আমরা যদি রাসুলের সিরাতের কিছু ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে এর উজ্জ্বল কিছু উদাহরণ দেখতে পাব।

ঘটনা এক

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় আসেন, তখন মদিনায় মুশরিকদের দুটি উৎসব পালিত হতো নাইরোজ আর মেহেরজান নামে।[২৩৩] রাসুল তা দেখে স্পষ্ট নিষেধ করলেন এবং জানিয়ে দিলেন, এ সকল ঈদ মুসলমানের জন্য নয়। এর চেয়ে আরও উত্তম ও তাওহিদে পূর্ণ দুটি দিন মুসলমানদের দেওয়া হলো। হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত,

عن أنس قال : «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون

---

২৩১. সহিহ বুখারি, হাদিস ৫৮৯২

২৩২. সুনানে তিরমিজি, হাদিস ২৬৯৫

২৩৩. আল্লামা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৩৪৬ হি.) লেখেন, ব্যাখ্যাকাররা হাদিসে উল্লেখিত 'দুই দিনের' ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সে দুটি দিন হলো, নাইরোজ ও মেহেরজানের দিবস। (যা মুশরিকদের দুটি ঈদ ছিল।) বাজলুল মাজহুদ, ৫/২০২

فيهما، فقال : ما هذان اليومان؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى، ويوم الفطر».

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় এসে দেখলেন, দুটি বিশেষ দিন তারা আনন্দ-উৎসব করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, এই দিনদুটি আসলে কী? তারা উত্তর দেন, জাহেলিয়াতে আমরা এই দুটি দিনে আনন্দ-উৎসব করতাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা এই দুটি দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন; ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা।[২৩৪]

ঘটনা দুই

মদিনায় এসে অমুসলিমদের পালিত ঈদ থেকে মুসলিমদের নিষেধ করার পর অন্য আরেকটি ঈদের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলে দেন। ঈদ প্রত্যেক ধর্মের আলাদা আলাদা বিষয়। প্রত্যেক ধর্মেরই রয়েছে নিজেদের স্বতন্ত্র ঈদ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বললেন,

يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا.

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঈদ রয়েছে আর এটি আমাদের ঈদ।[২৩৫]

ঘটনা তিন

মুসলিমদের ঈদ আর আনন্দের দিনগুলোকে চিহ্নিত করে দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দেন,

يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام.

আরাফা, কুরবানি আর তাশরিকের দিন হলো আমাদের মুসলিমদের ঈদ।[২৩৬]

---

২৩৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১১৩৪; সুনানে নাসায়ি, হাদিস ১৫৫৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ১২০০৬
খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৩৪৬ হি.) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন,

قال المظهر : فيه دليل على أن تعظيم النيروز والمهرجان وغيرهما من أعياد الكفار منهي عنه.

মাজহার রহিমাহুল্লাহ বলেন, নাইরোজ ও মেহেরজানসহ কাফেরদের অন্যান্য উৎসবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য হাদিসটি অন্যতম একটি দলিল।

বাজলুল মাজহুদ, ৫/২০২, বাবু সালাতিল ঈদাইন

২৩৫. সহিহ মুসলিম, হাদিস ৮৯৬

২৩৬. জামে তিরমিজি, হাদিস ৭৭৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ২৪১৯

ঘটনা চার

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় একজন মানত করল, অমুক জায়গায় সে উট জবাই করবে। সে আল্লাহর রাসুলের নিকট মাসআলা জানতে চাইলে আল্লাহর রাসুল জিজ্ঞেস করলেন,

هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟

সেখানে কি জাহেলি যুগের কোনো মূর্তি ছিল, যার পূজা করা হতো? লোকেরা বলল, না। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন,

هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟

সেখানে কি অমুসলিমদের কোনো উৎসব হতো? লোকেরা বলল, না। তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ...

তুমি তোমার মানত পুরা করো। (এরপর বললেন, এসব প্রশ্ন এজন্য করা হয়েছে) কারণ, আল্লাহর নাফরমানিতে কোনো মানত গ্রহণযোগ্য নয়, এ ধরনের মানত পূরণ করাও জায়েয নয়।[২৩৭]

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান

অমুসলিমদের ঈদ-উৎসব থেকে পূর্ণ বিরত থাকার যে নির্দেশ ও রীতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে গিয়েছেন তা পূর্ণ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন হজরত সাহাবায়ে কেরাম রা.। এইজন্য তাদের জীবনের দিকে লক্ষ করলেও দেখা যায় তারা অমুসলিমদের শিরকের এ সকল ঈদ-উৎসব থেকে শক্ত ভাষায় মুসলিম উম্মাহকে নিষেধ করেছেন। হজরত উমর রা. বলেন,

ولا تدخلوا علي المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم.

তোমরা মুশরিকদের উৎসবের দিন তাদের গির্জায় যেয়ো না, কেননা তাদের ওপর গজব নাজিল হয়।[২৩৮]

তিনি আরও বলেন,

---

২৩৭. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৩৩১৩

২৩৮. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, বর্ণনা ন. ১৬০৯; আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস ১৮৮৬১

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) লেখেন,

وروى البيهقي بإسناد صحيح.

বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ হাদিসটি সহিহ সনদে রেওয়ায়েত করেছেন।

ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকিম, ১/৫১১

اجتنبوا أعداء الله في عيدهم.

তোমরা আল্লাহর শত্রুদের উৎসবের দিন তাদের থেকে দূরে থাকো।[২৩৯]

বিষয়টি আরও স্পষ্ট ও শক্ত ভাষায় আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন,

من بنى في بلاد الأعاجم فصنع نوروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة.

যারা মুশরিকদের দেশে অবস্থান করে তাদের নববর্ষ এবং ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করে, তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, অবশেষে এভাবেই মারা যায়, কেয়ামতের দিন এদেরকে মুশরিকদের সাথে হাশর করানো হবে।[২৪০]

অমুসলিমদের উৎসব উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা, তাদের উৎসব পালন করা বা সে ব্যাপারে সমর্থন প্রকাশ করাও যে সাহাবায়ে কেরাম পছন্দ করতেন না, তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আলি রা.-এর সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর নাতি ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ বলেন,

أَنا إِسْمَاعِيل بن حَمَّاد بن النُّعْمَان بن ثَابت بن النُّعْمَان ابْن الْمَرْزُبَان من أَبنَاء فَارس الْأَحْرَار وَالله مَا وَقع علينا رق قطّ ولد جدي فِي سنة ثَمَانِينَ وَذهب ثَابت إِلَى عَليّ بن أَبِي طَالب رضي الله عنه وَهُوَ صَغِير ودعا لَهُ بِالْبركَةِ فِيهِ وَفِي ذُريَّته وَنحن نرجو من الله ان يكون قد اسْتَجَابَ الله ذَلِك لعَلي بن أَبِي طَالب رضي الله عنه فِينَا قَالَ والنعمان بن الْمَرْزُبَان أَبُو ثَابت هُوَ الَّذِي أهْدى إِلَى عَليّ بن أَبِي طَالب رضي الله عنه الفالوذج فِي يَوْم النيروز فَقَالَ نوروزنا كل يَوْم.

আমি ইসমাইল বিন হাম্মাদ বিন নুমান ইবনে সাবিত ইবনে নুমান ইবনে মারযুবান। আমরা হলাম পারস্যের স্বাধীন মানুষ। আল্লাহর কসম, আমাদের বংশে কখনো দাসত্বের দাগ লাগেনি। আমার দাদা (আবু হানিফা) জন্মগ্রহণ করেন ৮০ হিজরিতে। আমার দাদার বাবা সাবিত যখন ছোট, তখন একবার আলি ইবনে আবু তালিব রা.-এর কাছে যান। আলি রা. তার জন্য এবং তার বংশধরদের জন্য বরকতের দোয়া করে দেন। আল্লাহর কাছে আমাদের আশা, আমাদের বংশের ক্ষেত্রে আলি রা.-এর দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। ইসমাইল বলেন, সাবিতের বাবা নুমান ইবনুল মারযুবান হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি পারস্যের নববর্ষের দিন আলি রা.-কে ফালুদা হাদিয়া দিয়েছিলেন। আলি রা. তখন বলেন,

---

২৩৯. আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস ১৮৮৬২

২৪০. আস-সুনানুল কুবরা, বর্ণনা ন. ১৮৮৬৪। ইবনে রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৯০ হি.) একই বক্তব্য সনদ ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বরাতে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, আল-হিকামুল জাদিরাতু বিল ইযাআহ, পৃ. ৫১

نوروزنا كل يَوْم.

মুসলমানদের প্রতিটি দিনই তো নববর্ষ![২৪১]

এই ঘটনার আরেকটি বর্ণনা আছে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন রহিমাহুল্লাহ থেকে। ইবনে সিরিন রহিমাহুল্লাহ বলেন,

أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال : ما هذه؟ قالوا : يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز، قال : فاصنعوا كل يوم فيروز. قال أبو أسامة: كره أن يقول نيروز.

একবার নববর্ষের দিন আলি ইবনে আবু তালিব রা.-এর কাছে হাদিয়া নিয়ে আসা হয়। আলি রা. জিজ্ঞাসা করেন, এটা কী? হাদিয়াদাতা উত্তর দেয়, আমিরুল মুমিনিন, আজ নববর্ষ। উত্তরে আলি রা. বলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিটি দিনকে নববর্ষ বানিয়ে আমল করো। আবু উসামা বলেন, তিনি 'নাইরোজ' বলতে অপছন্দ করতেন, তাই 'ফাইরোজ' বলেছেন।

এর ব্যাখ্যায় ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৪৫৮ হি.) বলেন,

وفي هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به.

স্বাভাবিক দিনের পরিবর্তে নববর্ষ হিসাবে আলাদা দিবস উল্লেখ করাটাকে আলি রা. অপছন্দ করেছেন।[২৪২]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) লেখেন,

وأما علي رضي الله عنه، فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل.

আলি রা. তাদের উৎসবদিবসের নাম মুখে নিতেই অপছন্দ করছেন, সেখানে তাদের অনুরূপ কর্ম কীভাবে করা যায়?[২৪৩]

ফুকাহায়ে কেরামের সমাধান

অমুসলিমদের ঈদ মূলত তাদের কুফরি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা তাদের কুফর-শিরকের একটি শিয়ার বলেই গণ্য হয়। আর এটাই মূলত সেখানে অংশগ্রহণে এত কঠোরতার মূল কারণ। আর স্পষ্টতই, কুফরের কোনো শিয়ারের প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন, তা পছন্দ করা একজন মুমিনের ঈমানকে হুমকির মুখে ফেলে দেয় এবং

২৪১. আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবুহু, পৃ. ১৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৩৯৫; আল-খাইরাতুল হিসান ফি মানাকিবিল ইমামিল আজম আবি হানিফাতান নুমান, পৃ. ২২

২৪২. আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস ১৮৮৬৫; তাশাব্বুহুল খাসিস বি-আহলিল খামিস ফি রদ্দিত তাশাব্বুহি বিল মুশরিকিন, পৃ. ৪৯

২৪৩. ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকিম লি-মুখালাফাতি আসহাবিল জাহিম, ১/৫১৬

ক্ষেত্রবিশেষ ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। কুরআন, সিরাতে রাসুল ও এর আলোকে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এজন্যই ফুকাহায়ে কেরাম অমুসলিমদের ঈদে অংশগ্রহণ করাকে সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম বলেছেন। সেদিনের তাজিমকে স্পষ্ট কুফর বলেছেন। ইমাম যাইলায়ি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৪৩ হি.) লেখেন,

> قال رحمه الله (والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر، وقال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز، وأهدى لبعض المشركين بيضة يريد به تعظيم ذلك اليوم فقد كفر، وحبط عمله... وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه المشركون كفر، وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر. (تبيين الحقائق ٨٢٢/٦، كتاب الخنثى، باب مسائل شتى)

> নাসাফি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নাইরোজ এবং মেহেরজানের দিবস উপলক্ষে কোনোকিছু দেওয়া জায়েয নেই।' অর্থাৎ এই দুটি দিবস উপলক্ষে উপহার দেওয়া হারাম; বরং তা কুফর। আবু হাফস আল-কাবির বলেন, 'কেউ একজন ৫০ বছর আল্লাহ তাআলার ইবাদত করল, অতঃপর নাইরোজের দিবস এলে দিবসের প্রতি সম্মানবোধ করে কোনো মুশরিককে একটি ডিমই হাদিয়া দিলো, তাহলে সে কুফরি করল। তার সব আমল নষ্ট হয়ে গেল।...' যদি কোনো মুসলমান নাইরোজের দিন এমন কিছু ক্রয় করে যা সে অন্য সময় ক্রয় করে না, আর এই ক্রয়ের দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় উক্ত দিনকে সম্মান করা, তাহলে এই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। আর যদি সম্মান উদ্দেশ্য না হয়, শুধু খাবার বা অন্য উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কাফের হবে না।[২৪৪]

মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব দা. বা. বলেন, অমুসলিমদের ধর্মীয় আচার ও অনুষঙ্গগুলো (যেগুলোর ভিত্তি স্পষ্টত তাদের ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের ওপর) কোনো মুসলমান পালন করা অথবা আগে বেড়ে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া কিংবা তাদের ধর্মীয় নিদর্শনগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করে তাদের

---

২৪৪. তাবয়িনুল হাকায়েক, ৬/২২৮; আদ-দুররুল মুখতার, পৃ.৭৫৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ২/২৭৭; আল-বাহরুর রায়েক, ৫/১৩৩

খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৩৪৬ হি.) লেখেন,

> وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وبالإهداء التحاب جريًا على العادة لم يكن كفرًا، لكنه مكروه كراهة التشبه بالكفرة حينئذ فيحترز عنه.
>
> ওই দিনকে সম্মান করা ছাড়া যদি কিছু ক্রয় করে, তাহলে তো কুফর হবে না, তবে কাজটি কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণে মাকরুহ হবে। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা দরকার।

বাজলুল মাজহুদ, ৫/২০৩

সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা স্পষ্ট হারাম এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[২৪৫]

এব্যাপারে এত শক্ত অবস্থানের মূল কারণ এটাই যে, অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবগুলো তাদের ধর্মের একটি প্রতীক। আর কুফরের প্রতীককে সম্মান করা স্পষ্ট কুফর। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত। আল্লামা ইবনুল আলা আল-হিন্দি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৮৬ হি.) লেখেন,

واتفق مشايخنا أن من رآى أمر الكفار حسنا فهو كافر.

> আমাদের সকল আলেমের বক্তব্য হলো, কেউ যদি কাফেরের কোনো বিষয়কে ভালো বলে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।[২৪৬]

এইজন্যই সকল মাজহাবের ইমামগণই কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণকে নাজায়েয বলেছেন এবং সেখানে উপস্থিত হওয়াকে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হওয়ার কারণ বলেছেন। শাফেয়ি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম লালাকায়ি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৪১৮ হি.) বলেন,

> «ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم، لأنَّهم على منكرٍ وزُورٍ، وإذا خالط أهل المعروف أهلَ المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المُؤثِرين له، فيُخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعُمُّ الجميع، نعوذ بالله من سخطه» (أحكام أهل الذمة، فصل حكم حضور أعياد أهل الكتاب، دار عطاءات أهل العلم-رياض)
>
> মুসলমানদের জন্য কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবে উপস্থিত হওয়া জায়েয নেই। কেননা, তারা মিথ্যা আর ঘৃণিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে সেগুলো করে। আর যখন সৎলোকেরা কোনো ধরনের আপত্তি ছাড়াই অসৎ লোকদের সাথে মিশে, তখন স্বভাবতই তারা এ সকল কাজে সন্তুষ্ট রয়েছে এটাই প্রমাণ করে। এ ক্ষেত্রে আশঙ্কা রয়েছে যে, কাফেরসহ এদের সকলের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ নিপতিত হবে। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর ক্রোধ থেকে পানাহ চাই।[২৪৭]

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ তো হারাম, সে সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষে অমুসলিমরা যে আয়োজন করে, যেগুলো অন্যসময় মুসলমানদের জন্য বৈধ, সেগুলোকেও ফুকাহায়ে কেরাম এই উৎসব উপলক্ষে অপছন্দ করেছেন ও নাজায়েয বলেছেন। ইবনে আবি যায়েদ আল-মালেকি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩৮৬ হি.) লেখেন,

---

২৪৫. সূত্র, মাসিক আলকাউসার, নভেম্বর ২০১৯ খ্রি., প্রবন্ধ : উদারতা অর্থ আকীদা ও আদর্শের বিসর্জন নয়

২৪৬. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ৭/৩৪৮; শরহু হামওয়ি, ২/৮৮; আল-বাহরুর রায়েক, ৫/১৩৩

২৪৭. আহকামু আহলিজ জিম্মাহ, ২/৪৬

وكره مالك الركوب معهم في المراكب التي يركبون فيها لأعيادهم لما يخاف من نزول السخط عليهم. وكره ابن القاسم أن يهدي المسلم للنصراني في عيده مكافأة له، وقال هذا عون على تعظيم عيده وكفره. ولا يباع شيء منهم من مصلحة، عيدهم لحم ولا إدام ولا ثوب ولا عارية دابة، قال مالك وغيره : وينبغي للإمام الزجر عن ذلك. (النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ٤/ ٨٦٣، في ذبائح أهل الكتاب وأكل طعامهم وطعام المجوس وغيرهم، دار الغرب الإسلامي-بيروت-)

অমুসলিম তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন উপলক্ষ্যে যেসব বাহনে আরোহণ করে, ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ তাতে তাদের সাথে আরোহণ করতে অপছন্দ করেছেন। কেননা, এতে অমুসলিমদের ওপর আল্লাহর যে ক্রোধ অবতীর্ণ হয় তাতে মুসলিমদেরও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[২৪৮]

একটি প্রসিদ্ধ আপত্তি

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও তাদের ঈদসমূহে অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ আপত্তি তোলা হয়, আরে ভাই, আমরা তো সেখানে তাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে বা তাদের পূজা করতে যাই না, আমরা উৎসব হিসাবে একটু আনন্দ করতে যাই। এই খোঁড়া ও অন্তঃসারশূন্য আপত্তির জবাবে আমরা এতটুকু বলব, যা বহু শতাব্দী পূর্বে ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৪৮ হি.) বলে দিয়েছেন। তিনি লেখেন,

فإن قال قائل : إنا لا نقصد التشبه بهم؟ فيقال به : نفس الموافقة في أعيادهم و ومواسمهم حرام... إذ لو قصده كفر، لكن نفس الموافقة و المشاركة لهم في ذلك حرام. (تشبه الخسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين ص ٣٠، دار عمار، ط. ١٤٠٨ هـ)

কেউ যদি বলে, এর দ্বারা মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য করা তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়; তাহলে তাকে বলুন, মুশরিকদের সাথে উৎসব ও পার্বণে মিলে যাওয়া এবং খোদ অংশগ্রহণ করাটাই হারাম।... আর কাফেররা যে উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করে সে উদ্দেশ্যে একজন মুমিন অংশগ্রহণ করলে তো সে কাফেরই হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু তাদের সাথে অংশগ্রহণটাই হারাম।[২৪৯]

অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে তাদের অভিনন্দন জানানো

ঈদ যখন একটি ধর্মীয় শিয়ারের অন্তর্ভুক্ত, তখন ঈদ উপলক্ষে কোনো কাফেরকে

২৪৮. আন-নাওয়াদির ওয়ায-যিয়াদাত, ইবনে আবু যায়েদ আল-মালেকি, ৪/৩৬৮
২৪৯. তাশাববুহুল খাসিস বি-আহলিল খামিস, পৃ. ৩০

অভিনন্দন জানানোর অর্থ কুফরি শিয়ারকে সম্মান দেখানো। যা সম্পূর্ণ হারাম এবং ক্ষেত্রবিশেষ একজন মুমিনকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়।

অভিনন্দন তো অনেক দূরের বিষয়, কেউ যদি কাফেরদের এই ধর্মীয় উৎসবকে সুন্দর বলে বা কল্যাণকর মনে করে, তাহলেও ফুকাহায়ে কেরাম তার ব্যাপারে শক্ত শব্দ উচ্চারণ করেছেন। আল্লামা আবুল আলা আল-হিন্দি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৮৬ হি.) লেখেন,

اجتمع المجوس يوم النيروز فقال مسلم : خوب رسم نهاده اند أو قال : نيك آئي نهاده اند، خيف عليه الكفر.

নাইরোজের দিনে অগ্নিপূজকদের সমাগমকে যদি কোনো মুসলিম 'খুব ভালো অনুষ্ঠান এটি', অথবা 'এটি ভালো প্রভাব ফেলল' ইত্যাদি বলে, তাহলে তার ব্যাপারে কুফরির আশঙ্কা রয়েছে।[২৫০]

ইবনে আবদুল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ولا يبدأ أحد من أهل الذمة بالسلام ولا يقصدون بتهيئته

জিম্মিকে আগে সালাম দেবে না, এবং তাদেরকে অভিনন্দন জানাবে না।[২৫১]

হাম্বলি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম হাজাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وتحرم تهنئتهم.

কাফেরদেরকে শুভেচ্ছা জানানো হারাম।

এই কথার ব্যাখ্যায় বাহুতি রহিমাহুল্লাহ লেখেন,

لأنه تعظيم لهم.

শুভেচ্ছা জানানোর অর্থ হলো তাদেরকে সম্মান করা।[২৫২]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওযি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৫১ হি.) সুন্দর ভাষায় বলেছেন,

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يُهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول : عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلِمَ قائله من الكفر فهو من المحرّمات، وهو بمنزلة أن تُهنئة بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشدّ مَقتاً من التهنئة بشرب الخمر

---

২৫০. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ৭/৩৪; শরহু হামওয়ি, ২/৮৮; আল-বাহরুর রায়েক, ৫/১৩৩
২৫১. আল-কাফি ফি ফিকহি আহলিল মাদিনাহ, ২/১১৩৩
২৫২. কাশশাফুল কিনা, ৭/২৫৮

وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه . وكثير ممن لا قدر للدّين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنّأ عبد بمعصية أو بدعة أو كُفرٍ فقد تعرّض لِمقت الله وسخطه

কোনো কুফরি আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যেমন তাদের উৎসব ও উপবাস পালন উপলক্ষে বলা যে, 'তোমাদের উৎসব শুভ হোক' কিংবা 'তোমার উৎসব উপভোগ্য হোক' কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো কথা। যদি এ শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করা কুফরির পর্যায়ে নাও পৌঁছে, তবে এটি হারামের অন্তর্ভুক্ত। এ শুভেচ্ছা ক্রুশকে সেজদা দেওয়ার কারণে কাউকে অভিনন্দন জানানোর পর্যায়ভুক্ত। বরং আল্লাহর কাছে এটি আরও বেশি জঘন্য গোনাহ। এটি মদ্যপান, হত্যা ও জিনা ইত্যাদির মতো অপরাধের জন্য কাউকে অভিনন্দন জানানোর চেয়ে মারাত্মক। যাদের কাছে ইসলামের যথাযথ মর্যাদা নেই, তাদের অনেকে এ গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, অথচ তারা এ গোনাহের কদর্যতা উপলব্ধি করে না। যে ব্যক্তি কোনো গোনাহের কাজ কিংবা বিদআত কিংবা কুফরি কর্মের প্রেক্ষিতে কাউকে অভিনন্দন জানায়, সে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সম্মুখীন করে।[২৫৩]

মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানি সাহেব লেখেন,

غیر مسلموں کے تہوار ظاہر ہے کہ ان کے مشرکانہ اعتقادات پر مبني ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لئے شرک سے براءت اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے، اس لے ان تہواروں میں مسلمانوں کا شریک ہونا جائز نہیں، فقہاء نے بھی بہت سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔

فتاوي سے منع فرمایا ہے :

'الخروج إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم كفر' (الفتاوى البزازية على هامش الهندية : ٦/٣٣٣، النوع السادس في التشبيه، كتاب الفاظ تكون اسلاما أو كفرا أو خطأ.)

چونکہ یہ تہوار مشرکانہ فکر پر مبنی ہے، اس لئے ان پر مبارک باد دینا گویا ان کے نقطہ نظر کی تائید ہے، اس لئے اس سے بھی گریز کرنا چاہئے۔ چنانچہ فقہاء نے مجوسیوں کو نیروز کی مبارک باد دینے سے منع کیا ہے اور اس سلسلہ میں کہا ہے :

'قال مسلم خوب سيرت نهادند يكفر' (الفتاوى التاتارخانية : ٥/٢٢٥،

২৫৩. আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ১/২৯৩

(ملاحظه هو : الفتاوي البزازية : ٦/٣٣٣.)

বাহ্যিকভাবেই বোঝা যায়, অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবগুলো তাদের শিরকি আকিদার ওপর ভিত্তি করে হয়। আর মুসলিম হওয়ার কারণে আমাদের ওপর আবশ্যক হলো, শিরক থেকে মুক্ত এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়া। কাজেই তাদের ধর্মীয় উৎসবে মুসলিমদের অংশগ্রহণ জায়েয নয়। ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে খুব শক্তভাবে নিষেধ করেছেন।

মূর্তিপূজকদের নাইরোজ দিবস উপলক্ষে বের হওয়া এবং দিবস উপলক্ষে তারা যা করে, সেগুলো করা কুফর।[২৫৪]

যেহেতু এটি শিরকি আকিদার ওপর ভিত্তি করে হয়, তাই সে উপলক্ষে তাদের শুভেচ্ছা জানানোর কারণে কেমন জানি তাদের (শিরকি) আকিদার ব্যাপারে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অতএব তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানো থেকে বিরত থাকতে হবে। ফুকাহায়ে কেরাম মূর্তিপূজকদের নাইরোজের দিবস উপলক্ষে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে নিষেধ করেছেন। যেমন তারা বলেছেন,

যদি কোনো মুসলিম বলে, খুব সুন্দর অনুষ্ঠান। তাহলে সে কুফরি করল।[২৫৫], [২৫৬]

ভারতের প্রখ্যাত আলেম শাহিমুরাদাবাদের মুফতি শাব্বির আহমাদ কাসেমি হাফিজাহুল্লাহ লেখেন,

مسلمانوں کیلئے غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو کر مبارکباد دینا حرام اور کفر کے قریب پونچا دیتا ہے، اس سے دور رہنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔

মুসলমানদের জন্য কাফেরদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মুবারকবাদ দেওয়া ও শুভেচ্ছা জানানো হারাম। যা ব্যক্তিকে কুফরের পর্যায়ে নিয়ে যায়। এ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।[২৫৭]

জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া বানুরি টাউনের ফাতাওয়া,

غیرمسلموں کے مذہبی تہوار کے موقع پر انہیں مبارک باد دینا یا ان کی جانب سے ان کے نظریہ کے مطابق کسی مسلمان کو اس دن کی تعظیم کے

২৫৪. ফাতাওয়া বাযযাযিয়্যা, ৬/৩৩৩

২৫৫. ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যা, ৫/৫২২

২৫৬. কিতাবুল ফাতাওয়া, ১/৩০৫, ঈমানিয়্যাত অধ্যায়

২৫৭. ফাতাওয়ায়ে কাসেমিয়া, ২৪/২৫০, প্রশ্ন ন. ১০৮৭৭

متعلق کلمات کہنا اور مسلمان کا جواب میں مبارک باد دینا دونوں جائز نہیں- ابتداءً مبارک باد دینا یا مبارک بادی کا جواب دینا گویا ان کے نقطۂ نظر کی تائید ہے، جب کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار مشرکانہ اعتقادات پر مبنی ہوتے ہیں- مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرک سے بے زاری اور لاتعلقی کا اظہار ضروری ہے، اور مذہبی اعتقادات میں شرعی اَحکام کی تعمیل لازم ہے، اس سلسلہ میں کسی کی رضا یا ناراضی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مخلوق کی اطاعت اور ان کی رضا کی بجائے خالق کی اطاعت اور اس کی رضا کو مقدم رکھنا لازم ہے؛ لہذا دیوالی کی مبارک باد دینا یا مبارک بادی کے جواب میں مبارک باد کے کلمات کہنا جائز نہیں- اور اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم یا اس پر رضامندی مقصود ہو تو کفر کا اندیشہ ہے-

অমুসলিমদের কোনো ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে তাদেরকে অভিনন্দন জানানো বা কোনো মুসলমানকে তাদের ধর্মের মতো করে সেই দিনটির জন্য সম্মানসূচক কোনো বাক্য বলা ও বিনিময়ে অপর মুসলিম অভিনন্দন জানানো বৈধ নয়। প্রথমত, অভিনন্দন জানানো বা অভিনন্দনের জবাব দেওয়ায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করা হয়। অন্যদিকে অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবগুলো বহুশ্বরবাদী বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে হয়। একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের জন্য শিরক থেকে অনাগ্রহ ও বিচ্ছিন্নতা প্রদর্শন করা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে শরিয়তের বিধিবিধান মেনে চলা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে কারও সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করা যাবে না। সৃষ্টির আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পরিবর্তে স্রষ্টার আনুগত্য ও সন্তুষ্টিকেই অগ্রগামী রাখতে হবে। তাই দীপাবলির শুভেচ্ছা জানানো বা শুভেচ্ছার জবাবে অভিনন্দনজাতীয় শব্দ ব্যবহার জায়েয নেই। আর যদি এর অর্থ তাদের ধর্মকে সম্মান করা বা সম্মানের ব্যাপারে সমর্থন দেওয়া হয়, তাহলে কুফর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[২৫৮]

শরিয়তের এমন স্পষ্ট বিধান থাকার পরেও আজ দুনিয়ার সামান্যকিছু অর্জনের জন্য মুসলিম সন্তানদের দেখা যায় খুব আয়োজন করে অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা জানাতে! ফুকাহায়ে কেরাম মুখে একটু বলাকেই কতটা কঠিনভাবে দেখেছেন, সেখানে আজ তো পকেটের টাকা খরচ করে পোস্টার বানিয়ে কুফরি শব্দ দিয়ে তৈরি শুভেচ্ছাবার্তা দেওয়া হয়! আরও দুঃখজনক হলো, এই কাজগুলোতে

---

২৫৮. ফতোয়া নং : ১৪৪২০৩২০১৪৫০

লিংক : https://www.banuri.edu.pk/readquestion/dewali-ki-mubark-badi-ka-jawab-dena-144203201450/13-11-2020

সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ইসলামের নামে রাজনীতি করা ব্যক্তিবর্গ! গণতান্ত্রিক ভোটের রাজনীতির দোহাই দিয়ে এই হারাম কাজে এই শ্রেণিকেই সবচেয়ে বেশি লিপ্ত দেখা যায়। আমাদের ছোট মনে এই কথাটুকু বুঝে আসে না, আল্লাহর বেঁধে দেওয়া হারামের গণ্ডি মাড়িয়ে আল্লাহর জন্য মানুষ কীসের রাজনীতি করে! সাথে মনে আরেকটি প্রশ্ন উঁকি দেয়, যে ব্যক্তি ক্ষমতার জন্য আল্লাহর হারামের গণ্ডিকে পদদলিত করতে পারে, সে কাল ক্ষমতায় গিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে যে আরও অসংখ্য বিধানের গলায় ছুরি চালাবে না তার নিশ্চয়তা কি আছে? সে যে ক্ষমতার জন্য ইসলাম ছেড়ে দেবে না, তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে? আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে দামি বস্তু নিজের ঈমানকে রক্ষা করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পরিশিষ্ট : দুই

প্রসাদ খাওয়ার বিধান

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে উৎসর্গিত খাবার—প্রাণীজাতীয়, মিষ্টান্ন বা ফলমূল যাই হোক না কেন, এমনকি পানি হলেও; মুসলমানের জন্য তা খাওয়া বা ব্যবহার করা নাজায়েয ও হারাম। চাই এই উৎসর্গ মুশরিকরা দেব-দেবীর জন্য করুক বা কোনো মূর্খ মুসলিম অলি-আউলিয়ার নামে করুক।

বর্তমানে হিন্দুদের সাথে মুসলিমদের অবাধ ও অগাধ মেলামেশা এবং মুসলিমদের মাঝে 'ওয়ালা-বারা'-এর সঠিক চর্চা না থাকার কারণে এই স্পষ্ট মাসআলাটিও বহু মুসলিম জনসাধারণ ভুলে বসেছেন। সাথে বিভিন্ন অপপ্রচারেও অনেকে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। এখানে ধোঁকা দেওয়ার সুরত হরেকরকম হয়ে থাকে। কাউকে বলা হয়, প্রসাদ তো পবিত্র জিনিস, হারাম হবে কেন! কাউকে বলা হয়, প্রসাদ যেটা প্রাণীজাতীয় তা হারাম, তবে মিষ্টান্ন বা ফলমূল হারাম নয়। ইত্যাদি।

এই বিভ্রান্তি দূর করতে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা এখানে উল্লেখ করছি।

১. 'প্রসাদ' কাকে বলে

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ গীতায় প্রসাদের পরিচয়ে লেখা হয়েছে, 'যে শুদ্ধ দ্রবাদি ভক্তিসহকারে ভগবানকে উৎসর্গ করা হয়। তাহাই ভগবান উপহার হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাহাই প্রসাদ রূপে জগৎখ্যাত হয়। তুমি যাহা কিছুই করো, যাহা কিছু গ্রহণ করো, যাহা কিছু পরিত্যাগ করো, যাহা হোম করো। সমস্ত কিছুই আমাতে সমর্পণপূর্বক করো।'[২৫৯]

গীতার অন্য স্থানে বলা হয়, 'আর যারা ভগবানকে দেওয়া খাদ্য অর্থাৎ প্রসাদ গ্রহণ করে তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন।[২৬০]

প্রসাদের সংজ্ঞা থেকে দুটি বিষয় এখানে স্পষ্ট হচ্ছে। এক. প্রসাদ হলো অমুসলিমরা তাদের প্রভুদের সম্মানের জন্য যে-সমস্ত খাবার উৎসর্গ করে থাকে। দুই. প্রসাদের সাথে তাদের ধর্মীয় একটি বিধানও যুক্ত রয়েছে। এবং এই হিসাবে একে তাদের ধর্মের একটি প্রতীকও বলা যায়।

২. প্রসাদের বিধান

---

২৫৯. শ্রীমদ্ভগবত গীতা, ৯/২৬-২৭

২৬০. শ্রীমদ্ভগবত গীতা, ৩/১২-১৩

প্রথমত, প্রসাদ অমুসলিমদের একটি ধর্মীয় প্রতীকীর অন্তর্ভুক্ত এবং ধর্মীয় একটি বিশেষ মূল্যবোধকে সামনে রেখেই তারা খাবারটি গ্রহণ করে, কোনো সাধারণ খাবার মনে করে না। এটাকে ভগবানের উদ্দেশে একটি বস্তু মনে করে, যার মূল উদ্দেশ্যই হয় তাদের মিথ্যা ভগবানের সম্মান। সুতরাং এই খাবারকে খাওয়ার অর্থই হলো অমুসলিমদের এই প্রতীককে বিশেষ সম্মান করা ও নিজের মাঝে ধারণ করা। যা স্পষ্টই হারাম। আল্লামা আবুল আলা আল-হিন্দি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৮৬ হি.) লেখেন,

واتفق مشايخنا أن من رآى أمر الكفار حسنا فهو كافر.

> আমাদের সকল আলেমের বক্তব্য হলো, কেউ যদি কাফেরের কোনো বিষয়কে ভালো বলে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।[২৬১]

দ্বিতীয়ত, অমুসলিমরা এই প্রসাদকে তাদের ভগবানের নামে উৎসর্গ করে থাকে। শরিয়তের পরিভাষায় উৎসর্গকে বলা হয় 'নজর', যাকে আমরা মানত বলি। ইসলামের অকাট্য বিধান হলো গাইরুল্লাহর নামে মানত করা হারাম। আর প্রসাদ চাই তা প্রাণীজাতীয় খাদ্য হোক বা মিষ্টান্ন অথবা ফলমূল, তা গাইরুল্লাহর নামে মানতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ.

> আল্লাহ তো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং ওই বস্তু যার ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।[২৬২]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ.

> তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত ও সেই বস্তু যার ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।[২৬৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতি শফি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

> یہاں ایک چوتھی صورت اور ہے جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہے، مثلاً مٹھائی، کھانا وغیرہ جن کو غیراللہ کے نام پر نذر (منت) کے طور سے ہندو لوگ بتوں پر اور جاہل مسلمان بزرگوں کے

---

২৬১. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ৭/৩৪৮; শরহু হামওয়ি, ২/৮৮; আল-বাহরুর রায়েক, ৫/১৩৩
২৬২. সুরা বাকারা : ১৭৩
২৬৩. সুরা মায়েদা : ৩

مزارات پر چڑھاتے ہیں، حضرات فقہاء نے اس کو بھی اشتراکِ علت یعنی تقرب الی غیراللہ کی وجہ سے 'ما اہل لغیر اللہ' کے حکم میں قرار دے کر حرام کہا ہے، اور اس کے کھانے پینے دوسروں کو کھلانے اور بیچنے خریدنے سب کو حرام کہا ہے۔

এখানে একটি চতুর্থ সুরত হলো, যা প্রাণী ছাড়া অন্যান্য বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন মিষ্টান্ন, খাবারজাতীয় বস্তু ইত্যাদি, যেগুলো হিন্দুরা তাদের দেবতার সামনে এবং মূর্খ মানুষেরা বিভিন্ন বুজুর্গের মাজারে মানত করে দান করে, ফুকাহায়ে কেরাম এগুলোকেও ইল্লত এক হওয়ার কারণে হারাম বলেছেন। সুতরাং এমন বস্তু খাওয়া বা কাউকে খাওয়ানো, ক্রয়-বিক্রয় সব হারাম হবে।[২৬৪]

মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানি সাহেব লেখেন,

جو مٹھائی بتوں پر چڑہائی گئی ہو، اور ایسے ہی چڑھاوے کی مٹھائی کو یہ حضرات پرشاد کہتے ہیں، تو ان کا کھانا جائز نہیں، گو یہ ذبیحہ نہیں، لیکن قرآن مجید نے بتوں کے نام پر اور آستانوں پر ذبح کئے گئے جانورں کو جس سبب سے حرام قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے ذریعہ شرک کی تعظیم کی گئی ہے، اور یہ بات پرشاد اور چرھاوے میں بھی پائ جاتی ہے۔

মূর্তিকে উৎসর্গ করে যে মিষ্টান্ন পেশ করা হয়, তাকে প্রসাদ বলা হয়। তা খাওয়া নাজায়েজ। যদিও এটা উৎসর্গিত পশু নয়, কিন্তু কুরআন মূর্তির নামে উৎসর্গ করা পশুকে যে কারণে নিষিদ্ধ করেছে তা হলো, এর মাধ্যমে শিরককে সম্মান করা হয়। আর সেই একই কারণ প্রসাদ ও নিবেদন-উৎসর্গের মাঝেও পাওয়া যায়। (তাই প্রসাদ খাওয়াও হারাম হবে)।[২৬৫]

৩. প্রসাদ খাওয়া বিষয়ে উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া

হজরত থানবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৩৬২ হি.)

হজরত থানবি রহিমাহুল্লাহ এক ফাতাওয়ায় হিন্দুদের দেবীদের জন্য উৎসর্গকৃত পানি খাওয়াও নাজায়েয বলেছেন। পুরো ফাতাওয়াটি হলো,

سوال : موسمِ گرما میں اکثر اہل ہنود جگہ جگہ پانی پلایا کرتے ہیں، اس کے متعلق ایسا سنا ہے کہ وہ پانی دیوتاؤں کے نام پر پلاتے ہیں، تو اس پانی کا مسلمان کو پینا جائز ہے نہیں؟

الجواب : اگر محقق ہوجاوے کہ دیوتاؤں کے نام کا ہے تو 'ما اھل لغیر اللہ'

২৬৪. মাআরিফুল কুরআন, ১/৪২৪, যাকারিয়্যাহ বুক ডিপো

২৬৫. কিতাবুল ফাতাওয়া, ১/৩০৩, ঈমানিয়্যাত অধ্যায়, যমযম পাবলিশার্স, করাচি ২০০৭ খ্রি.

کے حکم میں ہے، لہذا ناجائز ہے-

প্রশ্ন : গরমের মৌসুমে হিন্দুদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়। বলা হয়, তারা এই পানি মানুষকে দেব-দেবীর নামে খাওয়ায়। মুসলমানদের জন্য কি এই পানি খাওয়া জায়েয হবে?

উত্তর : যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় পানি দেবতাদের নামে উৎসর্গ করা, তাহলে তা কুরআনে বর্ণিত 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে উচ্চারণ করা হয়েছে' বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই তা পান করা জায়েয হবে না।[২৬৬]

ইউসুফ লুধিয়ানবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৪২১ হি.) বলেন,

بتوں کے نام نذر کی ہوئی چیز شرعا حرام ہے، کسی مسلمان کو اس کا کھانا جائز نہیں.

মূর্তির নামে মানত করা বস্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কোনো মুসলমানের জন্য তা খাওয়া জায়েয নয়।[২৬৭]

দারুল উলুম বানুরি টাউনের এক ফাতাওয়ায় বলা হয়,

جب یقینی طور پر معلوم ہے کہ ہندو کی طرف سے دی گئی مٹھائی بت کے نام پر دی گئی ہے تو اس کا کھانا ہرگز جائز نہیں ہے.

যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে হিন্দুদের পক্ষ থেকে দেওয়া মিষ্টি মূর্তির নামে উৎসর্গ করা, তাহলে তা খাওয়া কোনোভাবেই জায়েয নেই।[২৬৮]

দারুল উলুম দেওবন্দের এক ফাতাওয়ায় বলা হয়,

غیر مسلم اپنی دیوی دیوتاؤں پر جو مٹھائیاں وغیرہ چڑھاتے ہیں جسے وہ پرشاد کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے اس کا کھانا ناجائز ہےاگر مٹھائی چڑھاوے کی نہ ہو تو اس کو لینے کی گنجائش ہے.

অমুসলিমরা দেব-দেবীর সামনে যে মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য রাখে, যাকে তারা প্রসাদ বলে, মুসলমানদের জন্য তা খাওয়া জায়েয নেই। তবে যদি সাধারণ মিষ্টি হিন্দুরা হাদিয়া দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করার সুযোগ আছে।[২৬৯]

---

২৬৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৮/৫৬৩, শাব্বির আহমাদ কাসেমি সাহেবের তাহকিককৃত নুসখা

২৬৭. আপকি মাসায়েল আওর উনকি হাল, পৃ. ২/১৪০, অধ্যায় : গাইরে মুসলিম সে তাআল্লুকাত, প্রকাশনী : মাকতাবায়ে লুধিয়ানবি ২০১১ খ্রি.

২৬৮. ফতোয়া নং : ১৪৪২০৪২০০০৮৭

লিংক: https://www.banuri.edu.pk/readquestion/buton-ke-naam-par-di-gai-mithai-khana-144204200087/18-11-2020

২৬৯. ফতোয়া নং : ১৪৬২৬৯

কিছু আপত্তি ও তার জবাব

কুরআনের যে আয়াত এখানে পেশ করা হচ্ছে, প্রসাদ খাওয়া হারামের বিষয়ে সেখানে أُهِلَّ শব্দের মধ্যে মিষ্টান্ন বা ফলমূলকে অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক নয়। কারণ আয়াতের উদ্দিষ্ট বিষয় হচ্ছে গাইরুল্লাহর নামে জবাই করা জানোয়ার। ফলমূল বা মিষ্টান্ন নয়। বিভিন্ন তাফসিরে জবাইয়ের বিষয়টি স্পষ্ট আছে।

জবাব : কুরআনে বর্ণিত أُهِلَّ শব্দকে শুধু গাইরুল্লাহর নামে জবাইকৃত বস্তুর মধ্যে বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে উৎসর্গিত জন্তুর মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া সঠিক নয়। তার কয়েকটি কারণ হলো—

প্রতমত : শব্দটির মূল অর্থ জবাই নয় ও পশুও নয়। মূল অর্থ হলো আওয়াজ করা, নাম নেওয়া। যেহেতু সে সময়ের আরবের কাফেররা পশু জবাই করার সময় দেব-দেবী আর মূর্তির নামে আওয়াজ করত, তাই শব্দটিকে এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ তাআলা শব্দটিকে যে ব্যাপক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে আয়াতের দাবি হলো প্রত্যেক ওই বস্তুই হারাম হবে, যেখানে গাইরুল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে। তা পশু হোক বা অন্যকিছু।

ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩৭০ হি.) বলেছেন,

> قوله تعالى : {وما أهل لغير الله به} فإن ظاهره يقتضي تحريم ما سمي عليه غير الله، لأن الإهلال هو إظهار الذكر والتسمية، وأصله استهلال الصبي إذا صاح حين يولد، ومنه إهلال المحرم؛ فينتظم ذلك تحريم ما سمي عليه الأوثان على ما كانت العرب تفعله، وينتظم أيضا تحريم ما سمي عليه اسم غير الله أي اسم كان.
>
> আয়াতের বাহ্যিকতার দাবি হলো প্রত্যেক ওই বস্তুই হারাম হবে যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেওয়া হয়েছে। أهل শব্দটির অর্থ হলো নাম নেওয়া ও আলোচনা করা। নবভূমিষ্ঠ বাচ্চা যখন চিৎকার করে আরবিতে তাকে استهلال الصبي বলা হয়; এ থেকেই 'উহিল্লা' শব্দটিকে আওয়াজ করা বা নাম নেওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবরা পশু জবাইতে মূর্তির নাম নিত, তাই তা হারাম করতে এই শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। তেমনই প্রত্যেক ওই জিনিস যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেওয়া হয়েছে, চাই তা যার নামেই হোক তা হারাম করতেও এখানে আয়াতে তা ব্যবহার হয়েছে।[২৭০]

তৃতীয়ত : গাইরুল্লাহর নামে মানতের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ হলো, বিভিন্ন পশু বা

লিংক : https://darulifta-deoband.com/home/ur/halal-haram/146269

২৭০. আহকামুল কুরআন, ২/৩৮২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

জীবজন্তু দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করা বা জবাই করা। আর আরবের মাঝে সে প্রচলন ছিল। তাই পশু ও জবাই অর্থটি অন্য অর্থ থেকে প্রসিদ্ধ হয়েছে। আর যে-সকল মুফাসসির জবাই অর্থ করেছেন, তারা প্রসিদ্ধ অর্থের দিকে লক্ষ রেখে তা করেছেন, অর্থের মাঝে নির্দিষ্ট করা বা সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়। কুরআনে বর্ণিত শব্দের এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের দিকে লক্ষ করেই সম্ভবত বহুসংখ্যক মুফাসসির আয়াতটিকে জবাই করা বা পশুর অর্থ না করে ব্যাপক অর্থে আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৫৯৭ হি.)-এর ইবারত দেখা যেতে পারে। তিনি وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ-এর ব্যাখ্যা করেন,

ومعنى وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ: ما رفع فيه الصوت بتسمية غير الله.

আয়াতে وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ—'সেই বস্তু যার ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারণ করা হয়েছে', এর অর্থ হলো গাইরুল্লাহর নামে আওয়াজ উঁচু করা।[২৭১]

শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি রহ.-এর দিকে সম্পৃক্ত 'ফাতাওয়ায়ে আজিজিয়া'-তে বলা হয়েছে,

بزمانہ نزول قرآن شریف جو لغت عرب کی تھی اور جو عرف وہاں کا تھا اس لغت اور عرف میں ہرگز 'اہلال' بمعنی ذبح نہیں آیا ہے نہ کسی شعر میں ایسا آیا ہے نہ کسی عبارت میں- بلکہ 'اہلال' کا معنی لغت عرب میں یہ ہے 'بلند کرنا آوازکا' اور 'شہرت دینا' چناچہ 'اہلال' اس معنی میں بھی آیا ہے 'لرکے کا بوقت پیدائیش اول مرتبہ آواز بلند کرنا' ... وغیرہ مستعمل ہے اور اگر کہا جائے 'اہللت للہ' تو ہرگز اس کا معنی 'ذبحت للہ' مفہوم نہ ہوگا- اور اگر 'اہلال' کا معنی ذبح کہا جائے تو یہ قباحت بھی ہے کہ اگر 'اہل' بمعنی ذبح کہا جائے تو ذبح لغیر اللہ معنی اس آیت کا ہوگا ارو ذبح باسم غیر اللہ اس آیت کا نہ ہوگا.

কুরআন নাজিলের সময় আরবি ভাষা বা তাদের প্রচলনে শব্দটির জবাইয়ের অর্থ আসেনি। এমনকি কোনো আরবি কবিতাতেও এই শব্দটি জবাইয়ের অর্থে ব্যবহার হয়নি। বরং শব্দটির মূল অর্থই হলো 'আওয়াজ উঁচু করা', 'প্রসিদ্ধ করা'। এমনইভাবে 'ইহলাল' শব্দটি শিশু বাচ্চা জন্মের পর প্রথম উঁচু আওয়াজে চিৎকার করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 'اہللت للہ' বাক্যের অনুবাদ 'আল্লাহর জন্য জবাই করেছি' অর্থে নেওয়া সঠিক হবে না। এ ক্ষেত্রে ইহলালের অর্থ জবাই করা অর্থে আনলে আরেকটি ত্রুটি এটাও হবে যে, জবাই অর্থ করার কারণে আয়াতের মর্ম হবে গাইরুল্লাহর জন্য জবাই

---

২৭১. যাদুল মাসির ফি ইলমিত তাফসির, ১/১৩৩, দারুল কিতাব আল-আরাবি, প্রথম প্রকাশ : ১৪২২ হি.

করা, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম না নিয়ে জবাই করা আয়াতের মর্ম বলে গণ্য হবে না।[২৭২]

চতুর্থত : সুরা মায়েদার আয়াতে মূর্তির নামে জবাই করা বস্তুকে স্বতন্ত্র হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ—'সেই বস্তু যার ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারণ করা হয়েছে'-এরও যদি একই অর্থ ধরা হয়, তাহলে এটার স্বতন্ত্রতা বাকি থাকে না। সুরা মায়েদার পুরো আলোচনা দেখুন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ.

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত ও সেই বস্তু যার ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারণ করা হয়েছে এবং (হারাম করা হয়েছে)... ওই পশু, যা পূজার বস্তুর কাছে জবাই করা হয়।[২৭৩]

দ্বিতীয় আপত্তি : সাহাবায়ে কেরাম থেকে ও ফিকহের বিভিন্ন নসে স্পষ্ট আছে, অমুসলিমদের উৎসবের দিনে তাদের জবাই করা পশু ব্যতীত অন্যান্য ফলমূল বা মিষ্টান্ন গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন, আয়েশা রা.–কে এক মহিলা জিজ্ঞেস করল যে, আমাদের কিছু অগ্নিপূজারি প্রতিবেশী আছে, তারা তাদের উৎসবের দিন আমাদেরকে হাদিয়া দেয় (এটার বিধান কী)। তিনি বলেন,

أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم.

ওই দিন যা জবাই করা হয় তা খেয়ো না, তবে তাদের দেওয়া ফলফলাদি খেতে পারবে।[২৭৪]

এ থেকে স্পষ্ট যে, প্রসাদ বা অন্যান্য ফলমূল বা মিষ্টান্ন খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

জবাব : অমুসলিমদের থেকে সাধারণ ফলমূল বা মিষ্টান্নদ্রব্য হাদিয়া গ্রহণ করা শরিয়তে নাজায়েয কিছু নয়। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম তা গ্রহণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের গ্রহণ করা ফলমূল কোনো দেব-দেবী বা গাইরুল্লাহর নামে উৎসর্গিত ছিল না। কারণ গাইরুল্লাহর নামে কোনো বস্তু উৎসর্গ যদি কোনো মুসলিমও করে, তাও তা হারাম হয়ে যায়। বহু ফকিহ এই বিষয়টি স্পষ্ট বলেছেন। ইবনে নুজাইম রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৯৭০ হি.) লেখেন,

وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض، أو له حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل سترة على

২৭২. ফাতাওয়া আজিজিয়া, ৫৩৭, অধ্যায় : মাসায়েলে হজ

২৭৩. সুরা মায়েদা : ৩

২৭৪. মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা, বর্ণনা ন. ২৪৮৫৬

رأسه فيقول يا سيدي فلان إن رد غائبي، أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع كذا، أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أنه نذر مخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر.... فإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين ما لم يقصدوا بصرفها للفقراء الأحياء قولا واحدا. (البحر الرائق ٢/١٢٥، كتاب الصوم، فصل ما يوجبه العبد على نفسه)

বহু সাধারণ মানুষ গাইরুল্লাহর নামে যে মানত করে, 'হে বাবা! আমার অমুক কাজ হলে আমি মাজারে এটা দেবো, সেটা দেবো', এটা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যদি এই মানত এই বিশ্বাস রেখে দেওয়া হয়, এই মৃত ব্যক্তি আল্লাহর বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার শক্তি রাখে, তাহলে তা কুফর হবে। এ থেকে জানা গেল, বিভিন্ন আউলিয়ার মাজারে যে টাকাপয়সা, মোমবাতি ইত্যাদি মানতের নামে দেওয়া হয়, তা সকল মুসলমানের ঐকমত্যে হারাম।[২৭৫]

ফকিহ ইবনে আবেদিন শামি রহ.-এর ছেলে আলাউদ্দিন ইবনে আবেদিন রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৩০৬ হি.) বলেন,

واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم ...فهو باطل وحرام، لأنه نذر للمخلوق وهو لا يجوز، لأنه عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله تعالى لا للمخلوق.

জেনে রাখা ভালো, অনেক সাধারণ মানুষ মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশে যে-সকল মানত করে থাকে, এবং আওলিয়ায়ে কেরামের কবরে দিরহাম, মোমবাতি, তেল ইত্যাদি নিয়ে যায় তাদের নৈকট্য অর্জনের জন্য, যেমন তারা বলে, হে অমুক বাবা/নেতা! আপনি যদি আমার হারিয়ে যাওয়া বস্তু ফিরিয়ে দেন, অথবা আমার অসুস্থতা দূর করে দেন, কিংবা আমার প্রয়োজন পূরণ করে দেন, তাহলে আপনাকে এই পরিমাণ স্বর্ণ, রুপা, মোমবাতি অথবা তেল দেবো। সুতরাং এগুলো বাতিল এবং হারাম, কেননা এগুলো গাইরুল্লাহর উদ্দেশে মানত করা হয়েছে, অথচ সেটা জায়েয নেই। কারণ, মানত ইবাদত, আর ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাখলুকের জন্য হতে পারে না।[২৭৬]

---

২৭৫. আল-বাহরুর রায়েক, ২/৫২১, যাকারিয়্যাহ বুক ডিপো

২৭৬. আল-হাদিয়্যাতুল আলাইয়া, পৃ. ১৪২

যেখানে মুসলমানদের গাইরুল্লাহর নামে মানত হারাম হয়ে যাচ্ছে, সেখানে অমুসলিমদের দেব-দেবীর নামে উৎসর্গিত বস্তু হালাল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর কোনো নসে এমন নেই যে, গাইরুল্লাহর নামে উৎসর্গিত বস্তু সাহাবায়ে কেরাম খেয়েছেন। তাই ফলমূল গ্রহণের নসগুলোকে এই অর্থেই গ্রহণ করতে হবে যে, সেগুলো গাইরুল্লাহর নামে উৎসর্গিত ছিল না, বরং সাধারণ ফলমূল ছিল।

তাই হিন্দুদের উৎসবের দিনে দেবতাদের জন্য উৎসর্গ ছাড়া ও তাদের জবাইকৃত পশু ব্যতীত অন্যান্য খাবার গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। তবে এসব উৎসবের দিনগুলোতে তাদের থেকে কোনো খাবার গ্রহণ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকাই উচিত ও এটা হারাম থেকে বাঁচতে বেশি নিরাপদ।

আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুক। আমিন। আল্লাহু আলাম।

● অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের ধরন কেমন হবে? এই বিষয়ে শরিয়তের দিকনির্দেশনা কী? এটি বর্তমান সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার মতো জরুরি একটি মাসআলা।

● কুফরের অনেক প্রকার রয়েছে। কেউ জন্মগত কাফের আর কেউ ইসলামের নেয়ামত পাওয়ার পর কুফর গ্রহণ করে নেয়। কুফরের আরেকটি প্রকার হলো, যে নিজেকে কাফের বলে, অথবা কাফের না বললেও নিজের অবস্থানকে ইসলাম বা মুসলিম বলে দাবি করে না। এর বিপরীত হলো নিজের কুফরকে ইসলাম বলে চালিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জোরাজুরি করা। এই দৃষ্টিতে কুফরের অসংখ্য প্রকার হয় এবং প্রতি প্রকারের কাফেরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রও একরকম নয়, বরং প্রতিটির বিশ্লেষণ রয়েছে যা এই কিতাবে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

● শরিয়ত ও সুস্থ বিবেকের দৃষ্টিতে কুফর নিজেই একটি অপরাধ আর কাফের একজন অপরাধী। বস্তুবাদের এই যুগে মানুষ এটাকে যে নামে ও শিরোনামেই ব্যক্ত করুক অথবা যে রং ও ঢঙেই উপস্থাপন করুক, শরিয়তের দৃষ্টিতে কুফর সাধারণ কোনো অপরাধ নয়, বরং সবচেয়ে জঘণ্য অপরাধ এবং অসংখ্য অপরাধের গোড়া। দুনিয়ার সকল আইনেই অপরাধী ও নিরপরাধ নির্ণয়ের নিজস্ব মাপকাঠি ও প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে। সে বিবেচনায় অপরাধী ও নিরপরাধীর সাথে আচরণে পার্থক্য করা হয়। সকলের সাথে সমান আচরণ করা হয় না। ইসলামেও কাফের ও মুসলমানের সাথে একরকম আচরণ রাখা হয়নি। বড় আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমানে মানুষ চুরি, ডাকাতি, জিনা ও গুম-খুনকে অপরাধ মনে করে কিন্তু এটাকে অপরাধই মনে করে না। অথচ কুফর হলো এই সকল অপরাধ থেকেও আরও বড় অন্যায় ও সকল অপরাধের মূল!